নবদ্বীপমহিমা।

অর্থাৎ

নবদ্বীপের প্রাচীন ও আধুনিক বিবরণ।

শ্রীকান্তিচন্দ্র রাঢ়ী কর্ত্তৃক সঙ্কলিত।

হুগলী

সাবিত্রী যন্ত্রে

শ্রীতুলসীদাস সাহা কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও

প্রকাশিত।

পূর্ব্বাভাষ।

নবদ্বীপ মহিমায় পরিপূর্ণ। তাহার সম্যক মহিমা বর্ণনা করা আমার ন্যায় সামান্য ব্যক্তিরপক্ষে একেবারেই অসম্ভব ব্যাপার। নবদ্বীপের পাণ্ডিত্য ও দেবত্ব সমস্ত ভারতবর্ষকে সময়ে সময়ে উদ্বেলিত করিয়া তুলিয়াছিল। সে সকলের বিস্তারিত বর্ণনা করিতে হইলে যে সকল উপাদান প্রয়োজন আমার তাহার কিছুই নাই। তথাপি এই দুষ্কর কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছি। তজ্জন্য পাঠকবর্গের নিকট একটী কৈফিয়ৎ দেওয়া বিবেচনা বোধে এই কএক ছত্র লিখিত হইল।

আমি নবদ্বীপ নিবাসী। বাল্যকাল হইতে সর্ব্বদাই নবদ্বীপের প্রাচীন লোকদিগের মুখে নবদ্বীপের মহিমার কথা শুনিয়া আমার হৃদয় ও মন পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। নবদ্বীপ সমন্ধে গ্রন্থ ও প্রবন্ধাদি যাহা দেখিতে পাই তাহাতে নবদ্বীপবাসীদের মুখে যে সকল কথা শুনা যায়, তাহার অনেক কথাই দেখিতে পাই না। এই জন্য বহুকাল হইতে নবদ্বীপের মহাজনদিগের সম্বন্ধে স্থানীয় প্রবাদ যতদূর সঙ্গত বোধহয় তাহা লিপিবদ্ধ করিবার ইচ্ছা হইয়াছে। ইতিহাস লেখা আমার উদ্দেশ্য নহে। ইতিহাস লিখিতে হইলে যে বুদ্ধি, বিদ্যা, জ্ঞান ও অবসর এবং ধনের আবশ্যকতা তাহার কিছুই আমার নাই। আমার এই ক্ষুদ্র পুস্তিকা যদি কোন ইতিহাস লেখকের কিছু মাত্র সহায়তা করে তাহা হইলেই ক্ষুদ্রজীবী আমি যে পরিশ্রম, অর্থ ও অবসর ব্যয় করিলাম তাহার সম্পূর্ণ সার্থকতা হইবে।

এই পুস্তক সঙ্কলনে নবদ্বীপ নিবাসী শ্রীযুক্ত অজিতনাথ ন্যায়রত্ন, মহাশয় অনেক শ্লোকাবলী ও উপদেশ দিয়া সবিশেষ সাহায্য করিয়াছেন। এবং মহামহোপাধ্যায় ভুবনমোহন বিদ্যারত্ন, ও যদুনাথ সার্ব্বভৌম এবং পূর্ব্বস্থলী নিবাসী সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত কৃষ্ণনাথ ন্যায়পঞ্চানন প্রভৃতি পণ্ডিত গণ ও অনেক উপদেশ দিয়া যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন। বালিনিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু হরিপদ ভট্টাচার্য্য বি, এ, অনেক ইংরেজী প্রবন্ধ হইতে বাঙ্গালা অনুবাদ করিয়া দিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত কএক জন প্রবন্ধ লেখক ও গ্রন্থ লেখকের রচনা আমার বিশেষ সহায়তা করিয়াছে। "বঙ্গে সংস্কৃত চর্চ্চা" প্রবন্ধ লেখক শ্রীযুক্ত বাবু ত্রৈলোক্যনাথ ভট্টাচার্য্য এম এ, বি, এল এবং চৈতন্যচরিত্র লেখক শ্রীযুক্ত বাবু জগদীশ্বর গুপ্ত, বিষ্ণুপ্রিয়াপত্রিকা, শুভকরী পত্রিকা ও বঙ্গ-দর্শনাদির রচনা হইতে বিশেষ সাহায্য পাইয়াছি। তদ্ভিন্ন অনেক বৈষ্ণব গ্রন্থের সাহায্য লইয়াছি। আমি কৃতজ্ঞতার সহিত তাঁহাদিগের নিকট ঋণ স্বীকার করিলাম।

কবিবর শ্রীযুক্ত বাবু ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত বাবু কুমুদনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বিএ, বিএল, ও শিবনারায়ণ শিরোমণি এই পুস্তকের অধিকাংশ দেখিয়া সংশোধন করিয়া দিয়াছেন। সুতরাং তাঁহাদের নিকট ও আমি ঋণী রহিলাম।

হুগলী।
১২৯১। ২১ আশ্বিন।

শ্রীকান্তিচন্দ্র রাঢ়ী।

সূচীপত্র।

বিষয়।	পত্রাঙ্ক।
নবদ্বীপ	১
নবদ্বীপ রাজধানী	৮
বল্লাল সেন	১০
লক্ষ্মণ সেন	১৩
নবদ্বীপ সংস্কৃত বিদ্যালয়	১৯
বাঙ্গালীর গৌরব	২৫
মিথিলা বিদ্যালয়	৩০
বাসুদেব সার্ব্বভৌম ও নবদ্বীপ ন্যায়বিদ্যালয়	৩৪
দুর্গাদাস বিদ্যাবাগীশ	৩৯
রঘুনাথ শিরোমণি ও নবদ্বীপ ন্যায়ের প্রাধান্য স্থাপন	৪১
হরিদাস ন্যায়ালঙ্কার	৬০
রামভদ্র সার্ব্বভৌম	৬২
মথুরানাথ তর্কবাগীশ	৬৫
ভবানন্দ সিদ্ধান্তবাগীশ	৬৯
হরিরাম তর্কবাগীশ	৭০
জগদীশ তর্কালঙ্কার	৭২
রামভদ্র সিদ্ধান্তবাগীশ	৭৯
রঘুদেব ন্যায়ালঙ্কার	৮০
গদাধর ভট্টাচার্য্য	৮২
গোবিন্দ ন্যায়বাগীশ	৮৮
শ্রীকৃষ্ণ ন্যায়ালঙ্কার	৯০
জয়রাম ন্যায়পঞ্চানন	ঐ
জয়রাম তর্কালঙ্কার	৯২
বিশ্বনাথ ন্যায়পঞ্চানন	৯২
রুদ্রনাথ ন্যায়বাচস্পতি	৯৩
শিবরাম বাচস্পতি	৯৪
বুনোরামনাথ	৯৪

নমো ভগবতে বাসুদেবায়।

নবদ্বীপমহিমা।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

নবদ্বীপ।

বঙ্গদেশের মধ্যে নবদ্বীপ একটী প্রসিদ্ধ নগর। ইহার অপর নাম নদীয়া। এই নগর এখন নদীয়া জেলার অন্তর্গত ভাগীরথীর পশ্চিম তীরে অবস্থিত। হিন্দুদিগের অধিকার কালে নবদ্বীপ বঙ্গদেশের রাজধানী ছিল। প্রায় আট শত বৎসর গত হইল ইহার সেই সৌভাগ্য বিলুপ্ত হইয়াছে। এখন যদিও এই নগরে আর রাজধানী নাই তথাপি হিন্দু সমাজের উপর অদ্যাপি নবদ্বীপের আধিপত্য অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। এই স্থানের শাস্ত্র ও সাহিত্য সম্বন্ধীয় মতামত সমস্ত বঙ্গভূমি অবনত মস্তকে গ্রহণ করিয়া থাকে এবং রাজ পুরুষেরাও বিচার কার্য্যে নবদ্বীপের মত অনুসরণ করিয়া থাকেন। এই স্থানের ব্যবস্থা লইয়া হিন্দু সমাজে বহুবিধ সামাজিক ক্রিয়া সম্পন্ন হইয়া থাকে; সুতরাং নবদ্বীপ এখনো হিন্দু সমাজ শাসন করিতেছে।

উৎপত্তিকাল—নবদ্বীপ কোন সময়ে স্থাপিত হইয়াছে যদিও তাহা অবধারণ করা সুকঠিন, তথাপি কিয়ৎ পরিমাণে তাহা অনুমান করিতে পারা যায়। প্রাচীন বঙ্গের বিবরণে যাহা কিছু পাওয়া যায় তাহাতে নবদ্বীপের কোন

উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না। কিন্তু সেন বংশীয় রাজাগণের আধিপত্যকালে এই নগর বাঙ্গালার একটী প্রধান নগর বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে।

প্রাচীন গ্রীক বা রোমকদিগের ভারতবর্ষীয় বৃত্তান্তে নবদ্বীপের কোন প্রকার উল্লেখ নাই। কিম্বা যখন অশোকনন্দন মহেন্দ্র বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারার্থ সিংহল দ্বীপে যাত্রা করেন, তাঁহার ভ্রমণ বৃত্তান্তে নবদ্বীপের নাম দেখিতে পাওয়া যায় না। কিম্বা যখন সুপ্রসিদ্ধ চীন পরিব্রাজক ফাহিয়ান ভাগীরথী প্রবাহিত হইয়া বঙ্গের তদানীন্তন প্রধান বন্দর তাম্রলিপ্তী (তমলুক) নগরে অবস্থান পূর্ব্বক বঙ্গের তৎকালীন অবস্থা লিপিবদ্ধ করেন তাহাতে নবদ্বীপের নাম উল্লেখ নাই। অথবা যখন দ্বিতীয় চীন পরিব্রাজক হুয়েন্থসাং বঙ্গদেশে আগমন করেন তাঁহারও ভ্রমণ বৃত্তান্তে নবদ্বীপের নাম উল্লিখিত হয় নাই। সেই সময়ে বঙ্গদেশ কতিপয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত ছিল বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে, কিন্তু তাহার মধ্যে নবদ্বীপের নাম নাই। হুয়েন্থসাং খৃষ্টীয় শাকের সপ্তম শতাব্দীতে বঙ্গভূমিতে আগমন করেন অতএব ঐ সময়ে নবদ্বীপের অস্তিত্ব অনুমিত হয় না।

গৌড় নগর বঙ্গের প্রাচীন রাজধানী। নবদ্বীপ উহার বহু দূরে অবস্থিত। খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর প্রথম ভাগে বৌদ্ধমতাবলম্বী পালবংশীয় নৃপতিগণ গৌড়ের সিংহাসনে উপবিষ্ট ছিলেন। কিম্বদন্তী আছে পাল বংশীয় নৃপতিগণ কোনও সময়ে নবদ্বীপে রাজধানী করিয়াছিলেন। তাঁহারা যখন বঙ্গের দক্ষিণ ভাগ পরিদর্শনে আগমন করিতেন তখন

পবিত্রসলিলা ভাগীরথী ও নির্ম্মলতোয়া জলঙ্গী পরিবেষ্টিত অতি রমণীয়, এই নবদ্বীপই তাঁহাদের বাসস্থান জন্য মনোনীত হইয়াছিল।

বর্ত্তমান নবদ্বীপের প্রায় ২ ক্রোশ পূর্ব্বে সুবর্ণ-বিহার নামে এক ক্ষুদ্রপল্লী আছে। বৌদ্ধগণের মঠ বা আরাধনার স্থানকে "বিহার" কহে। তৎকালে ভাগীরথীর এক শাখা মায়াপুরের উত্তর দিয়া ঐ সুবর্ণ-বিহারের নিকট পর্য্যন্ত প্রবাহিতা ছিল। ঐ শাখাতেই খড়িয়া নদী পতিত ও মন্দাকিনী নামে খ্যাত হইয়া গোয়ালপাড়ার উত্তরাংশে ভাগীরথীর সহিত মিলিত হইয়াছিল। অনেকে বলেন ঐ সুবর্ণ-বিহারে পালরাজাদিগের বাসস্থান ছিল। ঐ স্থানে এখনও প্রাচীন অট্টালিকার ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হইয়া থাকে। ঐ সকল ভগ্ন স্তম্ভ ও প্রস্তর এবং ইষ্টকাদির কারু কার্য্য দেখিলে উহা বৌদ্ধদিগের সাময়িক বলিয়া অনুমিত হয়। কথিত আছে মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের পূর্ব্ব পুরুষেরা ঐ স্থান হইতে অনেক প্রস্তরাবলী লইয়া গিয়া স্বীয় অট্টালিকায় স্থাপিত করিয়াছেন। যাহা হউক "নবদ্বীপ পাল রাজাদিগের রাজধানী ছিল" এই প্রবাদ হইতেই সেই সময়ে অর্থাৎ খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে নবদ্বীপের অস্তিত্ব অনুমিত হয়।

নদীয়া বা নবদ্বীপ আখ্যা—নদীয়া বা নবদীপ ও নবদ্বীপ নামের নানা প্রকার কিম্বদন্তী আছে। কেহ বলেন নদীয়া বা নবদীপ, কেহ কেহ বা নূতন দ্বীপ হইতে নবদ্বীপ, বা নয়টী দ্বীপ হইতে নবদ্বীপ নামের ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন।

(১ম) নদীয়া বা নবদীপ—নবদ্বীপ, গঙ্গার মধ্যস্থ চর-

ভূমির উপর সংস্থিত। ঐ চরের পশ্চিমদিকের গঙ্গা প্রবলা ছিল, সুতরাং পূর্ব্বাংশ ক্রমশঃ স্রোতোহীন হইয়া চরে পরিণত হয়। প্রাকৃতিক পরিবর্ত্তন বশতঃ ভূ-ভাগের এইরূপ অবস্থান্তর চিরদিন চলিতেছে। রামের বনগমন ও সীতা নির্ব্বাসন এই স্বল্প কালের মধ্যেই জনস্থানের কিরূপ পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল তাহা ভবভূতি উত্তর চরিতে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেনঃ—

"পুরা যত্র স্রোতঃ পুলিন মধুনা তত্র সরিতাং
বিপার্য্যাসং যাতো ঘনবিরলভাবঃ ক্ষিতিরুহান্"

এই উচ্চ চর ভূমির উপর, পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামের লোকেরা কৃষি কার্য্যের জন্য অনেক ভূমি গ্রহণ করেন, ক্রমে ঐ স্থানে তাহাদিগের বাস হইয়া যায়। এই সময়ে একজন সন্ন্যাসী ঐ চরের কোন নিভৃত প্রদেশে যোগ সাধনায় প্রবৃত্ত হয়েন। তিনি নয়টী প্রদীপ জ্বালিয়া রাত্রিতে যজ্ঞ বিশেষের (আরাত্রিক) অনুষ্ঠান করিতেন। কৃষিবর্গ ও ভাগীরথীতে নৌকারোহী যাত্রিগণ ঐ নয়টা প্রদীপ* দেখিয়া তৎকাল প্রচলিত ভাষানুসারে উহাকে নদীয়ার চর বলিয়া অভিহিত করিত। তদনুসারে ঐ স্থানের "নদীয়া" বা "নবদীপ" আখ্যা হয়।

(২য়) নব-দ্বীপ—প্রাচীন নবদ্বীপ ভাগীরথীর পূর্ব্ব উত্তরতীরে এবং পদ্মার শাখা "খড়ীয়া"বা"জলঙ্গী" নদীয়ার পূর্ব্ব দিক

* তৎকালে প্রদীপকে "দিয়া" বলিত। অদ্যাপিও অস্মদেশে "দিয়া কাটী" "দিয়া সলাই" প্রভৃতি শব্দে ঐ অর্থে "দিয়া" শব্দ ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

দিয়া প্রবাহিত হইয়া দক্ষিণে ভাগীরথীর সহিত মিলিত ছিল; নবদ্বীপের দক্ষিণ পশ্চিম দিকে সমুদ্র গড় নামক গ্রামের নিকট মিলিত ছিল, এই জন্য ঐ স্থানকে "ত্রিমোহনী" বলিত।

তৎকালে নদী ব্যতীত বাণিজ্যের ও গমনাগমনের আর কোন উপায় ছিলনা, এই ভাগীরথী নদীর দ্বারায় উত্তর পশ্চিম প্রদেশের সহিত দক্ষিণ দেশীয় সপ্তগ্রামের, এবং জলঙ্গী নদীর দ্বারা পূর্ব্ব বঙ্গের সহিত বাণিজ্য কার্য্য সম্পন্ন হইত। নদীয়া উক্ত উভয় নদীর সঙ্গম স্থলে অবস্থিত; সুতরাং উক্ত উভয় নদী প্রবাহিত বাণিজ্যতরী নবদ্বীপের নিম্ন দিয়া গমনাগমন করিত ও কখন বা নঙ্গর করিয়া থাকিত। এইরূপ যেখানে নৌকা সকল একত্রে নঙ্গর করিয়া থাকে তথায় সহজেই দোকান পশারী বসিতে দেখা যায়। বিশেষতঃ হিন্দুধর্ম্মমতে ভাগীরথী স্নান একটী বিশেষ পুণ্যজনক কার্য্য। সুতরাং দূরদেশ হইতে সময়ে সময়ে অনেক যাত্রী গঙ্গাস্নানার্থ এইস্থানে সমাগত হইতেন। অদ্যাপিও নবদ্বীপে "বারুণী" "দশহরা" ও যোগাদি উপলক্ষে সহস্র সহস্র লোকের সমাগম দেখিতে পাওয়া যায়। পূর্ব্ববঙ্গবাসীদিগের হিন্দু ধর্ম্মের প্রতি যেরূপ অনুরাগ ও গঙ্গার প্রতি তাঁহাদের যেরূপ ভক্তি দেখিতে পাওয়া যায়, তাহারা যে জলঙ্গী প্রবাহিত হইয়া উহার সম্মিলিত স্থান নবদ্বীপে ভাগীরথীতে স্নান করিতে আগমন করিতেন তাহাতে সন্দেহ নাই। সুতরাং উক্ত সময়ে ঐ স্থানে অনেক যাত্রীর সমাগম হইত এবং অনেক দোকান পশারীও বসিত;

যাত্রীরা প্রত্যাবৃত্ত হইলে আবার দোকানীরা উঠিয়া যাইত, কেহবা স্থায়ী হইত। ক্রমে ঐ স্থানের জল বায়ু স্বাস্থ্যকর দেখিয়া পার্শ্ববর্ত্তী পল্লী হইতে জন সাধারণ আসিয়া বাস করিতে লাগিল, এইরূপে ঐ স্থান সামান্য পল্লীরূপ ধারণ করিল। "দ্বীপের" উপর নূতন বসতি বলিয়া উহার নাম নবদ্বীপ হইল।

(৩য়) নবদ্বীপ—কেহ কেহ বলেন নয়টী দ্বীপ হইতে নবদ্বীপ নামের উৎপত্তি হইয়াছে। বৈষ্ণব গ্রন্থকার নরহরি দাস তাঁহার "নবদ্বীপ পরিক্রমা পদ্ধতি" নামক গ্রন্থে নয়টী দ্বীপের পরিচয় দিয়া, নবদ্বীপ নামের ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

"নদীয়া পৃথক গ্রাম নয়
নব-দ্বীপে, নবঁদ্বীপ বেষ্টিত যে হয়।"

নরহরি দাস, গৌরাঙ্গ দেবের সম সাময়িক লোক ছিলেন। তিনি যে নয়টী দ্বীপের উল্লেখ করিয়াছেন তাহার মধ্যে ৪টী গঙ্গার পূর্ব্ব পারে এবং ৫টী গঙ্গার পশ্চিম পারে এখনও স্থাপিত আছে। গঙ্গার পূর্ব্ব পারে ৪টীর নাম এই—

(১) অন্তর্দ্বীপ—— মায়াপুর বা মেয়াপুর, ভারুই ডাঙ্গা ইহার অন্তর্বর্ত্তী। এইখানে চৈতন্য দেবের জন্ম হয়।

(২) সীমন্ত দ্বীপ বা সিমলা—সরডাঙ্গা আদি ইহার অন্তর্গত।

(৩) গোদ্রুম দ্বীপ—— গাদিগাছা, স্থবর্ণ বিহার আদি ইহার অন্তর্ভুক্ত।

(৪) মধ্যদ্বীপ—— মাজীদা ভালুকা আদি ইহার অন্তর্গত।

গঙ্গার পশ্চিম পারে ৫টী দ্বীপঃ—

(৫) কোলদ্বীপ—— তেঘরীর দক্ষিণ ও সমুদ্রগড় ইহার অন্তর্ভুক্ত।

(৬) ঋতুদ্বীপ—— রাহুতপুর ও বিদ্যানগর ইহার অন্তর্গত।

(৭) মোদদ্রুম দ্বীপ—— মামগাছী ও মহতপুর ইহার অন্তর্গত।

(৮) জহ্নুদ্বীপ—— জাননগর।

(৯) রুদ্রদ্বীপ—— রুদ্রডাঙ্গা শঙ্করপুর ও পূর্ব্বস্থলী আদি ইহার অন্তর্ভুক্ত।

নরহরি দাস উক্ত নয়টী দ্বীপের পরিচয় দিয়া যেরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহাতে ইহার চতুর্দ্দিকে ২ ক্রোশ স্থান নবদ্বীপের অন্তর্ভুক্ত ছিল ও নবদ্বীপ বলিয়া পরিচিত হইত। যেরূপ রাজধানীর নিকটবর্ত্তী সমস্ত পল্লীই রাজধানীর নামে বিখ্যাত হয়, তেমনি যৎকালে নবদ্বীপ রাজধানী ছিল তৎকালে ঐ সকল গ্রাম নবদ্বীপ নামে অভিহিত হইত। এখন ঐ সকল গ্রাম নবদ্বীপ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া বহুদূরবর্ত্তী হইয়াছে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

নবদ্বীপ রাজধানী।

বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী পাল রাজাদিগের অধিকার কালে বঙ্গে হিন্দু ধর্ম্মের প্রভাব বিলক্ষণ হ্রাস হইয়াছিল। পাল রাজাদিগের পরে, বঙ্গে কাম্বোজবংশীয় ক্ষত্রিয় রাজাগণ রাজত্ব করিতেন। ইহাঁদের সময়েও শৈব ধর্ম্মের কিছু উন্নতি হইয়াছিল। বঙ্গীয় অনার্য্যগণের মধ্যে এই ধর্ম্ম অতিশয় প্রবল ছিল। এই কাম্বোজবংশীয় নৃপতিগণ গৌড়েই বাস করিতেন। তাঁহাদের নবদ্বীপ বাসের কোন প্রমাণ বা কিম্বদন্তী নাই। কিন্তু এই নগর যে ইহার পরবর্ত্তী সেনরাজাদিগের রাজধানী ছিল তদ্বিষয়ে আর সন্দেহ নাই।

সেন বংশীয় প্রথম রাজার নাম বীরসেন বা শূরসেন। সেন বংশের প্রথম রাজা বলিয়া ইহাঁকে আদিশূরও বলে। পূর্ব্ব বঙ্গের অন্তর্গত বিক্রমপুর ইহাঁর রাজধানী ছিল। অদ্যাপিও তথায় তাঁহার প্রাসাদের ভগ্নাবশেষ দর্শিত হইয়া থাকে। তিনি কখন গৌড়ে কখন বিক্রমপুরে বাস করিতেন। তাঁহার নবদ্বীপ বাসের কোন কিম্বদন্তী নাই; কিন্তু যখন তাঁহার পরবর্ত্তী উত্তরাধিকারী বল্লাল সেন নবদ্বীপে স্থায়ী বাসস্থান নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন তখন যে আদিশূর কখন কখন নবদ্বীপে আগমন করিতেন তাহা সহজেই অনুভূত হইতে পারে।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে পালরাজাদিগের সময়ে বঙ্গে হিন্দু ধর্ম্মের প্রভাব প্রায় অস্তমিত হইয়াছিল। এক্ষণে আদি-

শূর হিন্দুরাজা, যাহাতে হিন্দু ধর্ম্মে লোকের বিলক্ষণ আস্থা জন্মে তাহার জন্য তাঁহাকে বিশেষ সচেষ্ট হইতে হইয়াছিল। হিন্দু শাস্ত্রানুসারে ভাগীরথী স্নান একটী বিশেষ পুণ্যজনক কার্য্য। মহারাজ আদিশূর এই গঙ্গা স্নানে আসিতেন। পূর্ব্ব বঙ্গ হইতে গঙ্গা স্নানে আসিতে হইলে, জলঙ্গী নদী বাহিয়া আসাই অতি সুগম ও নিরাপদ পথ ছিল। নবদ্বীপ ঐ জলঙ্গী ও ভাগীরথীর সঙ্গম স্থলে অবস্থিত ও অতি স্বাস্থ্যকর স্থান, সুতরাং আদিশূরের অন্ততঃ গঙ্গাস্নানার্থ ঐ স্থানটী মনোনীত হইয়াছিল, সন্দেহ নাই।

আদিশূরের ধর্ম্মানুরাগ হইতে আর এক মহৎ ফল ফলিয়াছে। মানবধর্ম্মশাস্ত্র মতে যে বঙ্গরাজ্য চণ্ডাল প্রভৃতি অস্পৃশ্য অনার্য্যদিগের নিবাস ভূমি, সুতরাং অপবিত্র বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে, আদিশূর হইতে সেই বঙ্গভূমি আর্য্যদিগের নিবাস স্থলরূপে পরিণত হইয়া পবিত্রীকৃত হইয়াছে বলিলে অত্যুক্তি হয় না।

বাঙ্গালায় কোন সময়ে আর্য্যগণ আগমন করেন তাহা নিরাকরণ করা অতীব দুরূহ। কিন্তু তাঁহারা যে সময়েই আসুন না কেন, আদিশূরের পূর্ব্বে তাঁহাদের সংখ্যা অতি অল্পই ছিল; আবার সেই সময়ে বঙ্গে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব ইহাতে জাতি ভেদ নাই, সুতরাং সেই সময়ে আর্য্য ও অনার্য্য মিশাইয়া সকলেই অনার্য্যভাবাপন্ন হইয়াছিল। অতি অল্পসংখ্যক আর্য্য ব্রাহ্মণগণের স্বতন্ত্র ভাব ছিল। বঙ্গীয় ব্রাহ্মণদিগের এইরূপ অবনতি দেখিয়া মহারাজ আদিশূর পুত্রেষ্টি যজ্ঞ করিবার মানসে কান্যকুব্জাধিপতি মহারাজা বীর সিংহের

নিকট হইতে ৯৯৯ সংবতে বেদপরায়ণ পণ্ডিত ভট্টনারায়ণ দক্ষ, শ্রীহর্ষ, ছান্দড় ও বেদগর্ভ নামক পঞ্চজন ব্রাহ্মণ আনয়ন করেন। কিম্বদন্তী এই যে আদিশূর বিক্রমপুরের রাজধানীতে বসিয়া যজ্ঞ সম্পন্নকরেন—নবদ্বীপের সহিত কোন সম্বন্ধ দেখা যায় না। যাহা হউক আদিশূর হইতে বঙ্গভূমি আর্য্য নিবাস ভূমিরূপে পরিগণিত হইল এবং বঙ্গে সংস্কৃত চর্চ্চার উন্নতি হইতে লাগিল। ভট্টনারায়ণ একজন প্রসিদ্ধ কবি ছিলেন তৎপ্রণীত বেণী সংহার নাটক, এবং শ্রীহর্ষ বিরচিত নৈষধ চরিত অতি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ বলিয়া সংস্কৃত সাহিত্য সংসারে আদৃত হইয়া থাকে।

বল্লাল সেন।

মহারাজ আদিশূর নবদ্বীপে বাস করিতেন না। কিন্তু তাঁহার পরবর্ত্তী উত্তরাধিকারী বল্লাল সেন যে নবদ্বীপে বাস করিতেন তাহার অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। বর্ত্তমান নব-দ্বীপের প্রায় দুই ক্রোশ উত্তরে একটী প্রকাণ্ড উচ্চস্থান দৃষ্ট হয়, ঐ স্থানকে বল্লালঢিবি কহে ঐ স্থলে বল্লান সেনের প্রাসাদ ছিল। ঐ প্রাসাদের ভগ্নাবশেষ এক্ষণেও দৃষ্ট হইয়া থাকে। নিকটে একটী দীঘি, ও বল্লাল দীঘী নামে একটী ক্ষুদ্র পল্লী আছে, ইহাতে ঐ স্থানে বল্লান সেনের প্রাসাদ ছিল তদবিষয়ে সন্দেহ নাই।

কথিত আছে মহারাজ বল্লাল সেন শেষাবস্থায় অজ্ঞাত কুলশীলা শীলাবতী নাম্নী একরমনীর সৌন্দর্য্যে বিমোহিত

হইয়া তাহার পাণিগ্রহণ করেন। এই বিবাহে তাঁহার পুত্র লক্ষ্মণ সেনের সহিত বিশেষ মনোমালিন্য ঘটে; তজ্জন্য বল্লাল সেন নবদ্বীপে ও লক্ষ্মণ সেন বিক্রমপুরে বাস করিতে থাকেন। কিছু দিন পরে ঐ নব বিবাহিতা মহিষী অতি নীচ জাতীয় ডোমের কন্যা প্রকাশিত হওয়ায় মহারাজ বল্লাল সেন ভূগর্ভে এক গৃহ নির্ম্মাণ ও তাহাতে প্রচুর পরিমাণে খাদ্যাদির সংস্থান করিয়া তন্মধ্যে শীলাবতীকে প্রোথিত করেন। আজ প্রায় ৩০ বৎসর হইল বল্লাল দিঘীর নিম্ন দিয়া গঙ্গা প্রবাহিত ছিল। তৎকালে নদীর কূলভঙ্গ হেতু উক্ত অট্টালিকা বহির্ভূত ও নদীগর্ভে নিপতিত হইতে অনেকেই দেখিয়াছেন। তাঁহারা ঐ গৃহাদিকে "শীলা ডোমনীর গৃহ" বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া ছিলেন।

এইরূপে উভয় নদীর মধ্যে অবস্থিতি হেতু জল এবং বায়ুরগুণে নবদ্বীপ সামান্য একটী পল্লী হইতে রাজবাসস্থান বলিয়া মনোনীত হইয়াছিল এবং খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীতে বঙ্গদেশের রাজধানীরূপে পরিগণিত হইয়াছিল।

বল্লাল সেনই নবদ্বীপে প্রথম রাজধানী স্থাপন করেন কিন্তু তিনিও সকল সময়ে নবদ্বীপে অবস্থান করিতেন না। সকলেই অবগত আছেন যে তিনি একজন প্রবল পরাক্রান্ত নরপতি ছিলেন। শূদ্র বংশীয় দাসগোষ্ঠীপতি নরোত্তম দাস তাঁহার প্রধান সেনাপতি। বল্লাল সেন তাঁহারই সাহায্যে প্রায় সমস্ত বঙ্গভূমি করতলস্থ করিয়াছিলেন। উত্তরে রঙ্গপুরের ও কামরূপের অধিপতিগণ তাহার বশ্যতা স্বীকার করেন। পশ্চিমে বিষ্ণুপুরও ও পঞ্চ কোটীর

রাজারা তাঁহার অধীন ছিলেন। পূর্ব্বে ত্রিপুরা রাজ্যেও তাঁহার ক্ষমতা বিস্তার হইয়াছিল ; এমন কি মিথিলা করতস্থ করিয়া বারাণসী পর্য্যন্ত তিনি আধিপত্য স্থাপন করিয়াছিলেন।

মহারাজ বল্লাল যেমন রাজ্য বিস্তার করিয়া অসাধারণ বল ও বীর্য্য দেখাইয়া গিয়াছেন হিন্দু সমাজেরও উপর তাঁহার তেমনি ক্ষমতা পরিলক্ষিত হয়। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে মহারাজ আদিশূর ৯২৪ খৃষ্টাব্দে বঙ্গদেশে ৫ জন ব্রাহ্মণ আনয়ন করেন বল্লাল সেন ১০৬৬ অব্দে বঙ্গের সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। তাহা হইলে আদিশূরের সময় হইতে বল্লাল সেনের সময় পর্য্যন্ত প্রায় দুই শত বৎসর ব্যবধান দেখা যায়। এই দুই শত বৎসর মধ্যে সেন বংশীয় সাত জন রাজা রাজত্ব করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহাদিগের কোন বিশেষ বিবরণ পাওয়া যায় না। এই সময়ের মধ্যে ব্রাহ্মণ ও কায়স্থের সংখ্যা অনেক পরিবর্দ্ধিত হইয়াছিল। পাঁচ ঘর ব্রাহ্মণ হইতে ইতিমধ্যে এগার শত ঘরে পরিণত হইয়াছিল। আচার ব্যবহার ও অনেক পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল। সেই এক ব্রাহ্মণ আবার রাঢ়ী ও বারেন্দ্র দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায় হইয়াছিল। রাঢ় দেশবাসী ৬৫০ ঘর রাঢ়ী এবং বারেন্দ্রভূম নিবাসী ৪৫০ ঘর বারেন্দ্র বলিয়া খ্যাত হইয়াছেন ; আচার ব্যবহারেও ব্রাহ্মণেরা বিশিষ্টরূপে ভ্রষ্ট হইয়াছিলেন। মহারাজ বল্লাল এই অবনতি দর্শনে ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে যাহাতে সদাচার রক্ষিত হয় তজ্জন্য কৌলীন্য স্থাপন করেন। বল্লাল সেন

কোন্ রাজধানীতে বসিয়া কৌলীন্য স্থাপন করেন, তাহা জানিবার উপায় নাই। তবে বিক্রমপুর প্রদেশেই, অনেক কুলীনের বাস, ইহাতে বোধ হয় বিক্রমপুরের রাজধানীতে বসিয়াই কৌলীন্য স্থাপিত হয়। কিন্তু বল্লাল সেন, শেষাবস্থায় নবদ্বীপেই বাস করিতেন।

বল্লাল সেন ৩৫ বৎসর রাজত্ব করিয়া গতাসু হইলে, তদীয় পুত্র লক্ষ্মণ সেন বাঙ্গালার সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি পিতার উপযুক্ত পুত্র ছিলেন। লক্ষ্মণ সেন ২০ বৎসর কাল প্রবলপ্রতাপে রাজ্য শাসন করিয়া পিতৃ গৌরব রক্ষা করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। কিন্তু তৎপরবর্ত্তী কোন রাজাই তাদৃশ প্রবল পরাক্রান্ত ছিলেন না।

লক্ষ্মণ সেন।

এই বংশের শেষ রাজা লক্ষ্মণ সেন যৎকালে মাতৃগর্ভে ছিলেন তৎকালে তাঁহার পিতা কেশব সেন অকালে কাল কবলে পতিত হন। তাঁহার মৃত্যুর কএক মাস পরেই ১২২৩ খৃষ্টীয় অব্দে লক্ষ্মণ সেন জন্ম গ্রহণ করেন। নবদ্বীপই ইঁহার জন্মভূমি। ইঁহার জন্ম সম্বন্ধে এক প্রবাদ প্রচলিত আছে। কথিত আছে, যে সময়ে লক্ষণসেনের জননীর প্রসব বেদনা উপস্থিত হয়, সেই সময়ে জ্যোতির্ব্বিদ পণ্ডিতগণ গণনা করিয়া বলেন যে কোন নির্দ্দিষ্ট সময়ে ভূমিষ্ঠ হইলে, সন্তান দীর্ঘজীবী এবং সর্ব্ব সুলক্ষণসম্পন্ন হইবেন। অবোধ জননী সেই ব্রাহ্মণদিগের কথায় বিশ্বাস করিয়া উর্দ্ধ পদে সেই সময় অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। নির্দ্দিষ্ট

সময়ে সন্তান ভূমিষ্ঠ হইল। কিন্তু যন্ত্রণায় মহারাণী তৎক্ষণাৎ প্রাণ ত্যাগ করিলেন।

তিনি ভূমিষ্ঠ হইলেই তাঁহাকে সিংহাসনে স্থাপন করিয়া, ব্রাহ্মণ মন্ত্রিগণ তাঁহার রক্ষাবেক্ষণ ও রাজকার্য্য পর্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন। রাজা বয়োবৃদ্ধি সহকারে বিদ্যাভ্যাস করিতে লাগিলেন। সংস্কৃত ভাষায় তাঁহার বুৎপত্তি লাভ হইল। তিনি উত্তমরূপ পূর্ব্বপুরুষদিগের ন্যায় কবিতা রচনা করিতে পারিতেন।

রাজ কার্য্যের ভার একরূপ ব্রাহ্মণদিগের হস্তেই ন্যস্ত ছিল। সুপ্রসিদ্ধ হলায়ুধ রাজার বাল্যাবস্থায় রাজপণ্ডিতের পদে, তাঁহার যৌবনাবস্থায় মন্ত্রীপদে এবং পৌঢ়াবস্থায় প্রাড়বিবাকের কার্য্য নিযুক্ত ছিলেন। হলায়ুধের ভ্রাতা পশুপতি লক্ষণসেনের শেষাবস্থার মন্ত্রী। মহারাজ লক্ষণসেন এই ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদিগের নিকট আজীবন শিক্ষিত হন। সুতরাং যুদ্ধ বিগ্রহাদি কার্য্যে তিনি সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ ও হীনসাহস ছিলেন। তাঁহার সময় হইতেই কামরূপ, রঙ্গপুর, ত্রিপুরা ও পঞ্চকোটী; প্রভৃতি রাজ্যগুলি গৌড়রাজ্য হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে। ঐ সকল রাজ্যের রাজারা পরস্পর স্বাধীন ভাবে রাজত্ব করিতে লাগিলেন। কিন্তু পূর্ব্ব গৌরব নিবন্ধন সকলেই লক্ষণ সেনকে মান্য করিতেন ও প্রধান বলিয়া স্বীকার করিতেন। সুতরাং লক্ষণ সেন তৎকালে সার্ব্বভৌম রাজা বলিয়া উল্লিখিত হইতেন। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে এখন যাহা মালদহ, মুরশিদাবাদ, রাজসাহী; নদীয়া, বর্দ্ধমান এবং বীরভূম জেলার অন্তর্গত,

লক্ষ্মণসেন তাহারই অধিপতি ছিলেন। ইঁহার সময়ে যেমন রাজ্যগুলি পৃথক হইয়া পড়িয়াছিল হিন্দু সমাজেও সে সময়ে কিছুমাত্র ঐক্য ছিল না। মহারাজ লক্ষ্মণসেন ব্রাহ্মণ মন্ত্রীর পরামর্শে সমস্ত রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করিতেন সুতরাং ব্রাহ্মণেরাই এক প্রকার শাসন কর্ত্তা ছিলেন। কিন্তু তাঁহাদিগের ক্ষত্রিয়োচিত পরাক্রাম ছিল না। রাজ্য রক্ষা করা ক্ষত্রিয়দিগের কার্য্য। বঙ্গদেশে ক্ষত্রিয়দিগের আগমন দেখা যায় না। বঙ্গে কোন যুদ্ধ ব্যবসায়ী লোকও ছিল না। রাজা শূদ্রদিগের মধ্য হইতেই সৈন্য সংগ্রহ করিয়া রাজ্য রক্ষা করিতেন। এদিকে লক্ষ্মণসেন বড় শান্তিপ্রিয় রাজা ছিলেন। যুদ্ধ বিগ্রহাদি বড় ভাল বাসিতেন না। সুতরাং বহুদিবসাবধি কোন যুদ্ধাদি না ঘটায় যে সকল সৈন্য ছিল, তাহারাও বিলক্ষণ অলস ও বিলাসী হইয়া উঠিয়াছিল। যে দেশের প্রজাগণ দুর্ব্বল ও ভীরু তথাকার রাজাও দুর্ব্বলও ভীরু হইয়া থাকেন। আবার যেখানে প্রজারা স্ববল ও সাহসী তথাকার রাজাও বিলক্ষণ সাহসী হইয়া থাকেন। বিরোধের ভয়ে রাজপুরুষদিগকে সর্ব্বদা সতর্ক থাকিতে হয়। বিরোধের ভয়ে উভয়ের মানসিক শক্তি বলবান ও উন্নত হয়। কিন্তু বঙ্গ দেশের প্রজাগণ নিতান্ত দুর্ব্বল ও নিস্তেজ ছিলেন এই কারণে বাঙ্গালী রাজপুরুষগণও নিস্তেজ হইয়া পড়িয়াছিলেন।

যেমন প্রজার অবনতিতে রাজার অবনতি, তেমনি রাজার অবনতিতে এদেশীয় ব্রাহ্মণগণেরও অবনতি হইয়া-

ছিল। যে ব্রাহ্মণগণ মহাভারত, বেদ, পুরাণ, দর্শন ইত্যাদি গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া, মানসিক শক্তির অসাধারণ পরিচয় দিয়া গিয়াছেন, তাঁহারাই এক্ষণে, মুসলমানেরা এই দেশের রাজা হইবে—এই শাস্ত্রীয় বচন রচনা করিয়া, গৌরব বোধ করিতে লাগিলেন। ঠিক এই সময়ে মুসলমানেরা বঙ্গ ভূমি অধিকার করেন।

খৃঃ ১২০২ অব্দে মুসলমান সেনাপতি বকথিয়ার খিলিজি বেহার জয় করিয়া বঙ্গভূমির দিকে অগ্রসর হইলেন। এই সময়ে মহারাজ লক্ষণ সেনের বয়স অশীতি বৎসর হইয়াছিল। তিনি এই নবদ্বীপেই অবস্থিতি করিতেছিলেন। মুসলমানেরা আসিতেছে শুনিয়া তদীয় প্রধান মন্ত্রী পশুপতি ও অন্যান্য ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ রাজাকে নবদ্বীপ পরিত্যাগ করিবার উপদেশ দিলেন। কিন্তু রাজা অতিশয় বৃদ্ধ হইয়াছিলেন, নবদ্বীপ পরিত্যাগ করা তাঁহার ইচ্ছা ছিল না। অথচ বিপদ হইতে উদ্ধারেরও কোন উপায় করিলেন না।

বকথিয়ার খিলিজি বাঙ্গালার এইরূপ অরক্ষিত অবস্থা জানিতে পারিয়া, সৈন্য সংগ্রহ করিয়া গোপনে নবদ্বীপের নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, ও নগরের নিকটস্থ বনে সমস্ত সৈন্য লুক্কাইত রাখিয়া, ১৭ জন মাত্র সৈন্য সঙ্গে লইয়া দূত বেশে, ছল করিয়া, নবদ্বীপ রাজপুরী প্রবেশ করিলেন। দূতের সর্ব্বত্রই অবারিত দ্বার। সুতরাং রক্ষিগণ পুরী প্রবেশে বাধা দিল না। এইরূপে মুসলমানেরা প্রবঞ্চনা করিয়া পুরী প্রবেশ করত অসি নিষ্কোষিত করিয়া পুরী রক্ষীদিগকে হত্যা করিতে লাগিল। তখন রক্ষিগণ প্রবলবেগে তাহাদিগকে

আক্রমণ করিল। কিন্তু তাহাদের সংখ্যা অতি অল্প। এদিকে বনমধ্য হইতে পঙ্গপালের ন্যায় মুসলমান সেনা আসিয়া পুরী ও নগর আক্রমণ করিল। বৃদ্ধ রাজা, পুরী-রক্ষাকরা অসাধ্য বিবেচনা করিয়া, মন্ত্রীদিগের পরামর্শে নবদ্বীপ ত্যাগ করিয়া বঙ্গের ইতিহাসে চিরকালের জন্য দুরপনেয় কলঙ্ক রাখিয়া গেলেন। এইরূপে ১২০৩ খৃঃ অব্দে নবদ্বীপ রাজপুরী মুসলমানদিগের হস্তগত হইল।

নবদ্বীপ রাজপুরী মুসলমানদিগের হস্তগত হইল বটে কিন্তু সমস্ত বঙ্গভূমি অধিকার করিতে তাহাদিগের প্রায় শত বৎসর লাগিয়াছিল। সেন বংশীয় রাজারা সুবর্ণগ্রাম, ও সপ্তগ্রামে প্রায় শত বৎসর স্বাধীন ভাবে রাজত্ব করিয়াছিলেন। সপ্তদশ অশ্বারোহী কর্ত্তৃক বঙ্গদেশ জয়ের কথা যাহা ইতিহাসে লিখিত আছে তাহা অপ্রকৃত। সপ্তদশ অশ্বারোহী নবদ্বীপ রাজপুরীও অধিকার করিতে সমর্থ হয় নাই।

একটু ধীর চিত্তে বিবেচনা করিলে সহজেই উপলব্ধী হইবে যে মুসলমানদিগের দ্বারা নবদ্বীপ অধিকার সম্বন্ধে গূঢ় কথা সাধারণে অবগত নহেন। যাঁহার কিঞ্চিৎ বিবেচনা শক্তি আছে—তিনি অবশ্যই বিবেচনা করিবেন যে, মহারাজ লক্ষণ সেনের প্রধান প্রধান কর্ম্মচারীদিগের শঠতা ব্যতীত মুসলমানদিগের দ্বারা নবদ্বীপ অধিকৃত হয় নাই। আমার বিবেচনা হয় অবিশ্বাসী কৃতঘ্ন রাজ কর্ম্মচারিগণ, মুসলমান সেনাপতি বকথিয়ার খিলিজির নিকট পুরস্কার লোভের বশবর্ত্তী হইয়া আপন প্রভুকেও প্রতারণা

করিয়াছিল এবং আপন জন্মভূমিকে বিজাতীয় হস্তে অর্পণ করিয়াছিল এবং আপন জীবনের সাররত্ন স্বাধীনতাকে অবহেলে বিসর্জ্জন দিয়াছিল। এ সম্বন্ধে অধিক বলিবার আমার অধিকার নাই। বঙ্গের সুপ্রসিদ্ধ লেখকদিগের অধিকাংশ গ্রন্থেই এইরূপ অনুমান দৃষ্ট হইয়া থাকে। বঙ্গের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপন্যাস লেখক শ্রীযুক্ত বাবু বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়, তাঁহার মৃণালিনী নামক ঐতিহাসিক উপন্যাস গ্রন্থে ঐ সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন তাহা কোন্ সহৃদয় পাঠকের হৃদয়ে ঐরূপ বিশ্বাসের উদ্দীপনা না করে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

নবদ্বীপ সংস্কৃত বিদ্যালয়।

বকথিয়ার খিলিজির আক্রমণ হইতে; নবদ্বীপ সিংহাসন চ্যুত হইল বটে, কিন্তু বিদ্যা বিষয়ে নবদ্বীপ আপন গৌরব রক্ষা করিতে লাগিল। হিন্দু নৃপতিগণ যে বংশ সমুদ্ভূত হউন না কেন, ব্রাহ্মণগণ তাহাদিগের মন্ত্রীত্ব করিতেন। হলায়ুধ ও উদয়নাচার্য্য যে রাজমন্ত্রী ছিলেন তাহা পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। অদ্যাপিও জমীদারদিগের বাটীতে এক এক জন ব্রাহ্মণ পণ্ডিতকে সভা পণ্ডিতের কার্য্যে নিযুক্ত দেখা যায়। যাহা হউক, যখন সেন রাজারা সর্ব্বদা যাতায়াত করিতে লাগিলেন, এবং অধিকাংশ সময় বাস করিতে লাগিলেন, তখন তাঁহাদিগের সহিত বহুসংখ্যক ব্রাহ্মণ পণ্ডিত যাতায়াত করিতে লাগিলেন এবং অনেকেই এই পবিত্র নদী গঙ্গা তীর পরিত্যাগ করিয়া বিক্রমপুর বা গৌড়ে যাইতে অস্বীকৃত হইলেন। অন্যান্য ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণও রাজানুগ্রহ পাইবার আশয়ে নবদ্বীপে আসিয়া উপনিবিষ্ট হইলেন। এইরূপে নবদ্বীপ একটী বিদ্বজ্জনপরিপূর্ণ প্রসিদ্ধ নগরী হইয়া উঠিল। ইহার প্রত্যেক পল্লীতেই ব্যাকরণ, কাব্য, স্মৃতি, ইত্যাদির অনেক সংস্কৃত চতুষ্পাঠী স্থাপিত হইতে লাগিল। এবং জ্যোতিষিগণ কর্ত্তৃক সুপ্রসিদ্ধ নবদ্বীপের পঞ্জিকার সৃষ্টি হইতে আরম্ভ হইল। ইহার স্বাধীনতা সূর্য্য অস্তমিত হইবার অনেক পূর্ব্বে, খৃষ্ট একাদশ শতাব্দীতে, মহারাজ বল্লাল

সেনের সময় হইতে নবদ্বীপ বঙ্গ দেশের মধ্যে সংস্কৃত বিদ্যা চর্চ্চার প্রধান স্থান হইয়া উঠিয়াছিল। বঙ্গ দেশের নানা স্থানের বিদ্যার্থিগণ নবদ্বীপে আসিয়া অধ্যাপনা করিতে লাগিলেন। ইঁহার বহু শতাব্দীর পরবর্ত্তী সময়ে রচিত চৈতন্য ভাগবত গ্রন্থের আদি খণ্ডে দ্বিতীয় অধ্যায়ে লিখিত আছে যথা—

"নবদ্বীপ সম্পত্তি কে বর্ণিবারে পারে।
এক গঙ্গাঘাটে লক্ষ লোক স্নান করে॥
ত্রিবিধ বৈসে এক জাতি লক্ষ লক্ষ।
সরস্বতী প্রসাদে সবেই মহাদক্ষ॥
সবে মহা অধ্যাপক করি গর্ব্ব ধরে।
বালকেও ভট্টাচার্য্য সনে কক্ষা করে॥
নানা দেশ হইতে লোক নবদ্বীপে যায়।
নবদ্বীপে পড়িলে সে বিদ্যারস পায়॥"

মহারাজ লক্ষন সেনের সময়ে নবদ্বীপে যে সকল প্রধান পণ্ডিত ছিলেন তন্মধ্যে হলায়ুধ, পশুপতি ও শূলপানি প্রধান স্মার্ত্ত। এবং জয় দেব, উমাপতিধর, প্রধান কবি ছিলেন। উদয়নাচার্য্যের কোন গ্রন্থ পাওয়া যায় না। ক্ষিতীশ বংশাবলী প্রণেতা এই উদয়নাচার্য্যকে কুসুমাঞ্জলিরচয়িতা উল্লেখ করিয়া ভ্রমে পতিত হইয়াছেন, কারণ উদয়নাচার্য্য খৃঃ ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথম সময়ে বর্ত্তমান ছিলেন, কিন্তু বর্দ্ধমান উপাধ্যায় কুসুমাঞ্জলীর 'প্রকাশ' নামে একখানি টীকা রচনা করেন। প্রমাণ পাওয়া যায় যে উক্ত বর্দ্ধমান উপাধ্যায় একাদশ শতাব্দীর শেষে বর্ত্তমান ছিলেন। অতএব ত্রয়ো-

দশ শতাব্দীর রচিত গ্রন্থের টীকা, একাদশ শতাব্দীতে প্রণীত হওয়া একেবারেই অসম্ভব।

হলায়ুধের সংগৃহীত গ্রন্থ অনেক আছে। তৎসমুদয়ের শেষে "সর্ব্বস্ব" এই নাম সংযোজিত দেখিতে পাওয়া যায়। তৎকর্তৃক বিরচিত ব্রাহ্মণসর্ব্বস্ব, স্মৃতিসর্ব্বস্ব এবং মীমাংসা সর্ব্বস্ব এবং ন্যায়সর্ব্বস্ব ইত্যাদি অনেকগুলি গ্রন্থ দেখিতে পাওয়া যায়। হলায়ুধ রাঢ়ী শ্রেণীর ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনি বাৎস্য গোত্রীয় ধনাঞ্জয়ের পুত্র বলিয়া স্বীয় সংগৃহীত ব্রাহ্মণ সর্ব্বস্ব গ্রন্থে আত্ম পরিচয় দিয়া গিয়াছেন।

পশুপতি হলায়ুধের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ইনি শ্রাদ্ধাধিকৃত্য (পশুপতি পদ্ধতি) নামে এক পুস্তক প্রণয়ন করেন।

শূলপাধি ভট্টাচার্য্য স্মার্ত্ত ছিলেন। তদীয় সংগৃহীত গ্রন্থ সকল সাধারণত, 'স্মৃতিবিবেক' বলিয়া প্রসিদ্ধ। তৎসংগৃহীত প্রায়শ্চিত্তবিবেক, ব্রতমালাবিবেক, এবং দুর্গোৎসববিবেক প্রভৃতি অনেক স্মৃতি গ্রন্থ আছে। ইহাঁর বহুপরবর্ত্তী প্রধান স্মার্ত্ত রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য, শূলপাণির মত প্রামাণিক বলিয়া অনেক স্থলে গ্রহণ করিয়াছেন।

উদয়নাচার্য্য বারেন্দ্র শ্রেণীয় এক জন প্রধান পণ্ডিত ছিলেন। ইনি লক্ষণ সেনের শেষ সময়ে ধর্ম্মাধিকারের কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন।

লক্ষণ সেনের সেনাপতি, বটু দাসের পুত্র, শ্রীধর দাস সদুক্তিকর্ণামৃত নামে এক গ্রন্থ সংগ্রহ করেন। ইহাতে গোবর্দ্ধন হলায়ুধ, জয় দেব, উমাপতিধর, বিদ্যাপতি, প্রভৃতি বঙ্গ দেশীয় অনেকানেক গ্রন্থকারগণের নাম ও বিরচিত শ্লোক

উদ্ধৃত হইয়াছে। এই গ্রন্থ লক্ষ্মণসেনের রাজ্যচ্যুতির দুই বৎসর পরে অর্থাৎ ১১২৭ শকে বা ১২০৫ খৃষ্টাব্দে সংগৃহীত হয় যথা—

ইতি পঞ্চভিঃ প্রবাহৈঃ সদুক্তি কর্ণামৃতং ক্রিয়তে
শাকে সপ্তবিংশত্যধিক শতোপেত দশশতে শরদাং।

নবদ্বীপে নানা জাতি লোকের বাস ছিল। তন্মধ্যে ব্রাহ্মণের ভাগই অধিক। ব্রাহ্মণেরা তিনটী প্রধান শ্রেণীতে বিভক্ত ছিলেন। রাঢ়ী, বারেন্দ্র ও বৈদিক। বৈদিকের সংখ্যা অপেক্ষাকৃত অল্প ছিল, বৈদিকেরা কান্যকুব্জাগত ব্রাহ্মণদিগের বংশধর নহেন। ইহাঁরা পরে আসিয়াছেন ও বেদবিহিত কার্য্য করিয়া বৈদিক সংজ্ঞাপ্রাপ্ত হন। অন্যান্য জাতির বাস প্রচুর পরিমাণে ছিল।

ব্রাহ্মণ ও বৈদ্য ব্যতীত অপর কোন বর্ণের সংস্কৃত শিক্ষা করিবার অধিকার ছিল না। ব্রাহ্মণেরাও বৈদ্য ব্যতীত অপর কোন বর্ণকে সংস্কৃত শিক্ষা দেওয়া পাতক মনে করিতেন। সুতরাং বৈদ্য ব্যতীত অপর সকল বর্ণই সংস্কৃত ভাষায় সম্পুর্ণ অনভিজ্ঞ ছিল। বৈদ্যের সংখ্যাও অতি অল্প ছিল। অন্যান্য জাতিরা প্রায় সকলেই নিরক্ষর ছিলেন বলিলে অত্যুক্তি হয় না।

সে সময়ে বাঙ্গালা ভাষা কিরূপ অস্থায় ছিল জানা যায় না। বিদ্যাপতি প্রভৃতি কবিদিগের কাব্য পাঠে জানা যায় যে সে সময়ে হিন্দি মিশ্রিত এক প্রকার ভাষা প্রচলিত ছিল। মহাত্মা চৈতন্যের সময় হইতেই বাঙ্গালা ভাষার গঠন বলিতে হইবে। গুরু মহাশয়গণই তৎকালে বাঙ্গালা ভাষার এক মাত্র শিক্ষক ছিলেন।

তৎকালে শংখ্যকারের ও তন্তুবায়ের ব্যবসায় বিশেষ লাভবান ছিল। নবদ্বীপের প্রায় সমস্ত লোকেরাই ইহার অন্যতর ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেন। তৎকালে বিলাতী সূতার আমদানী হয় নাই। এদেশেই তাকু বা চরকাতে সূতা কাটা হইত। এই সূতাকাটা ব্যবসা প্রায়ই স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে ছিল। এই ব্যবসায় দ্বারা অনেক নিঃস্ব পরিবারের সংসার যাত্রা নির্ব্বাহের আনুকূল্য হইত। পাঠকগণ যে "কাটনা কাটা" ধনের কথা শুনিয়াছেন এই সূতাকাটা ব্যবসাকেই কাটনা কাটা কহিত।

নবদ্বীপের লোকেরা প্রায় সকলেই নিস্ব ছিলেন। রাজ প্রাসাদ ব্যতীত আর কাহারই প্রায় ইষ্টক নির্ম্মিত গৃহ ছিল না। মেটে ঘরেই সকলে অতি আনন্দে বাস করিতেন।

লক্ষণ সেনের রাজ্যচ্যুতির কিঞ্চিৎ পরেই বঙ্গে তান্ত্রিক মত প্রবলরূপে প্রচারিত হয়। এই নবদ্বীপ হইতেই উক্ত মত সমুদ্ভূত হইয়াছিল। যাহা হউক, মারণ, উচাটন, বশীকরণ প্রভৃতি কার্য্যগুলির তন্ত্রে বিশেষ প্রশংসা থাকায়, অনেকেই তন্ত্র মতাবলম্বী হইয়াছিলেন। বর্ত্তমান সময়ের ন্যায় তখন শ্যামা, জগদ্ধাত্রী, ইত্যাদি তান্ত্রিক দেবমূর্ত্তি সকল প্রকাশিত ছিল না। তান্ত্রিক সন্ন্যাসিগণ স্থানে স্থানে ঘটস্থাপন করিয়া স্বীয় স্বীয় ইষ্টমন্ত্র সাধন করিতেন, কেহ কেহ বা মন্ত্রসিদ্ধ ও সিদ্ধ পুরুষরূপে সম্মানিত হইয়া, অলৌকিক কার্য্য দ্বারা সাধারণের নিকট দেবসম্মানে সম্মানিত হইতেন। তাহাদিগের আরাধনার স্থান "পীঠস্থান" বলিয়া উল্লিখিত হইত।

নবদ্বীপে যে "পোড়া মাতা" দেবীরপীঠস্থান দৃষ্ট হয়, উহা লক্ষ্মণসেনের রাজ্যচ্যুতির প্রায় শত বৎসর পরে এক জন তান্ত্রিক সন্ন্যাসীর দ্বারা এইরূপে স্থাপিত হইয়াছিল। ঐ সন্ন্যাসী দক্ষিণা কালিকা মন্ত্রে সিদ্ধ বলিয়া বিখ্যাত ছিলেন। তজ্জন্যনানাস্থানের লোকেরা আসিয়া ঐ সন্ন্যাসীর ও দেবীর অর্চ্চনা করিতেন।

নবদ্বীপের অধিবাসীগণ অনেকেই উহার মানসিক পূজা দিতে আরম্ভ করিলেন। কিছু দিন পরে উক্ত সন্ন্যাসী নবদ্বীপের কোন ব্রাহ্মণ কুমারের পরিচর্য্যায় সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে বর দিতে চাহিলেন। বরদানকালে ভ্রমবশত সন্ন্যাসী স্বীয় সিদ্ধ মন্ত্র উপদেশ দিয়াছিলেন। সিদ্ধমন্ত্র বহিস্ফুট হওয়ায় সন্ন্যাসী অতিশয় দুঃখিত হন এবং ঐ ব্রাহ্মণ কুমারকে ঐ ঘটে দক্ষিণাকালিকা দেবীর পূজা করিতে উপদেশ দিয়া নবদ্বীপ হইতে প্রস্থান করেন। তাঁহার প্রতিষ্ঠিতঘট সেই স্থানেই রহিল। পরে ঐ ব্রাহ্মণ কুমার ও নবদ্বীপের অধিবাসী অনেকেই ঐ ঘটে পূর্ব্ববৎ পূজা করিতে লাগিলেন। এই রূপে ঐ দেবী "গ্রাম্য দেবী" রূপে পরিণত হইলেন।

খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীতে যখন বাসুদেব সার্ব্বভৌম নবদ্বীপে ন্যায় দর্শনের প্রথম চতুষ্পাঠি করেন, তৎকালে তিনি ঐ দেবীর ঘট গ্রামের প্রান্ত হইতে আনয়ন পূর্ব্বক গ্রামের মধ্যস্থানে এক বট বৃক্ষ মূলে স্থাপিত করেন। তদবধি ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ ও ছাত্রবর্গ ঐ দেবীর পূজায় বিশেষ মনোযোগী হইলেন। কিছু দিন পরে গৃহ দাহে উক্ত

বট বৃক্ষ দগ্ধ হইলে ঐ স্থান "পোড়াবটতলা" বলিয়া, এবং ঐ দেবী 'পোড়ামা' অথবা 'বিদগ্ধজননী' বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

বাঙ্গালীর গৌরব।

নবদ্বীপ বঙ্গ দেশের রাজধানী ছিল বলিয়া ইহার গৌরব নহে। কারণ এইস্থান হইতেই বঙ্গের স্বাধীনতা রত্ন অপহৃত হওয়ায় নবদ্বীপ কলঙ্কিত হইয়াছে। কিন্তু পক্ষান্তরে এই নবদ্বীপ হইতেই বাঙ্গালী জাতির জাতীয় গৌরব সমুদ্ভূত হইয়াছে।

ভারতভূমির পুরাতত্বের যতই অনুসন্ধান হইতেছে, ততই দেখা যাইতেছে যে, কি গণিতও জ্যোতিষ, কি সাহিত্য ও দর্শন, কি ধর্ম্ম ও নীতি, কি শিল্প ও বাণিজ্য, কি শৌর্য্য ও বীর্য্য, সকল বিষয়েই ভারতভূমি ভূমণ্ডলের রাজ্ঞী স্বরূপা ছিলেন। যে বিজ্ঞানের বলে বর্ত্তমান সভ্য জাতির এত উন্নতি, সেই বিজ্ঞানেরমূল-গণিত, এই ভারতবর্ষেই উদ্ভূত হইয়াছে। আর্য্যভট্ট, পরাশর, ভাস্করাচার্য্য প্রভৃতি জ্যোতিষীগণ এই ভারতবর্ষেই জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। মানবাদি ধর্ম্মশাস্ত্র ও নীতিশাস্ত্রে এই

ভারতবর্ষ সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ। খৃষ্ট জন্মিবার প্রায় ছয় শত বৎসর পূর্ব্বে বুদ্ধদেব জন্ম গ্রহণ করিয়া জগতে প্রেমপূর্ণ সার্ব্বভৌম ধর্ম্মের প্রথম প্রচার করেন। কিন্তু এই সকলের সহিত বঙ্গদেশের কোন সম্বন্ধ নাই বলিলেই হয়। এক ন্যায় দর্শনে বঙ্গদেশ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও জগৎ বিখ্যাত হইয়াছে। এই নবদ্বীপই সেই ন্যায় দর্শনের জন্মভূমি। এই স্থানে ন্যায় শাস্ত্র যেরূপ পরিমার্জ্জিত ও পরিপুষ্ট হইয়াছিল, ভারতের কুত্রাপি তাহা পরিলক্ষিত হয় না। এই স্থানে অনেকানেক প্রসিদ্ধ পণ্ডিত উৎপন্ন ও প্রাদুর্ভূত হইয়া ন্যায়ের সূক্ষ্মতম তত্ত্ব আলোচনা পূর্ব্বক, গভীরভাব পরিপূর্ণ গ্রন্থ সমূহ রচনা করিয়া বাঙ্গালীর নাম গৌরবান্বিত করিয়া গিয়াছেন। এই স্থানে অসাধারণধীশক্তিসম্পন্ন বাসুদেব সার্ব্বভৌম, জন্ম পরিগ্রহ করিয়া, তৎকালে নিবদ্ধ-প্রায় গৌতম শাস্ত্রকে কণ্ঠস্থ করিয়া আনিয়া নবদ্বীপ ভূমিকে অলঙ্কৃত করেন। এইস্থানে কুশাগ্র-বুদ্ধি-তার্কিক-চূড়ামণি রঘুনাথ জন্ম পরিগ্রহ করিয়া মিথিলার গর্ব্ব খর্ব্ব করত, নবদ্বীপের প্রাধান্য স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। ন্যায় তত্ত্বে, কয় জন মনুষ্য পৃথিবীতে তাঁহার ন্যায় অবিনশ্বর কীর্ত্তি স্থাপন করিতে সমর্থ হইয়াছেন? এবং এই স্থানেই মথুরানাথ, ভবানন্দ-সিদ্ধান্তবাগীশ, রামভদ্র সার্ব্বভৌম, জগদীশতর্কালঙ্কার, গদাধরভট্টাচার্য্য, এবং বিশ্বনাথন্যায়পঞ্চানন প্রভৃতি পণ্ডিতগণ উৎপন্ন হইয়া ন্যায়ের বহুবিধ পুস্তক রত্নে, নবদ্বীপ-ন্যায়ভাণ্ডার পরিপূর্ণ করিয়া রাখিয়াছেন। এবং এই স্থানেই স্মার্ত্ত-চূড়ামণি রঘুনন্দন জন্ম গ্রহণপূর্ব্বক স্মৃতিশাস্ত্রের নূতন ব্যাখ্যা আবিষ্কার

করিয়া, বঙ্গদেশকে উজ্জ্বল ও এই নবদ্বীপভূমিকে সরস্বতীর "পীঠরূপে" পরিণত করিয়া রাখিয়াছেন। এবং এই স্থানেই মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য দেব শরীর পরিগ্রহ করিয়া পরমার্থ-ধর্ম্ম-তত্ত্বের চরম উন্নতি ও বঙ্গভূমিকে পবিত্র করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার ন্যায় সর্ব্বজনীন উদার ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক এবং অসাধারণ চরিত্রের কয়জন মনুষ্য পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছেন? অতএব এই নবদ্বীপ হইতে আবার বাঙ্গালীর নাম সমুজ্জ্বল প্রভায় প্রদীপ্ত হইয়া বঙ্গ ভূমিকে জগৎ বিখ্যাত করিয়া রাখিয়াছে—এই নিমিত্ত নবদ্বীপ ভূমি বাঙ্গালী মাত্রেরই তীর্থ স্থান বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে এবং এই নিমিত্তই নবদ্বীপ "শ্রীধাম" আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে।

লক্ষণ সেনের রাজ্যচ্যুতির সময় হইতে, চৈতন্য দেবের আবির্ভাব কাল পর্য্যন্ত, প্রায় তিন শত বৎসর ব্যবধান দেখা যায়। এই তিন শত বৎসর বঙ্গভূমি মুসলমানদিগের শাসনাধীন ছিল। কিন্তু সে শাসন নামে মাত্র। মুসলমানেরা রাজা ছিলেন বটে, কিন্তু বঙ্গের ভূস্বামীগণই প্রকৃতরূপে রাজ্য শাসন করিতেন। তাঁহারা কখন কর দিতেন কখন কর দিতেনও না। দেওয়ানী ও ফৌজদারী বিচার কার্য্য, তাঁহারা এক প্রকার স্বাধীন ভাবেই করিতেন। হিন্দু-শাস্ত্র ও রীত্যনুসারে বিষয় কর্ম্ম সম্পন্ন হইত। রাজধানী বা তৎসন্নিহিত স্থান ব্যতীত মুসলমান রাজপুরুষদিগের সাক্ষাৎ সম্বন্ধে হস্তক্ষেপ ছিল না। নবদ্বীপ বা তৎসন্নিহিত কোন স্থানে হিন্দু-ভূস্বামী বা রাজার বাস ছিল না। কিন্তু

তৎকালে সপ্তগ্রাম, বঙ্গের প্রধান বন্দর ও বাণিজ্য স্থান ছিল। এই নগর, নবদ্বীপের প্রায় পনর ক্রোশ দক্ষিণ, বর্ত্তমান হুগলীর কিঞ্চিৎ উত্তর-পশ্চিমে, সরস্বতী নদী তীরে অবস্থিত ছিল। বঙ্গদেশে যে সকল প্রাচীন নগর ছিল, সপ্তগ্রাম তৎসমুদয়ের মধ্যে একটী প্রধান। সেনবংশীয় রাজারা পরাজিত হইয়া, কেহ কেহ এই সপ্তগ্রামে কিছু দিন স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিয়াছিলেন। পরে খৃষ্টীয় শাকের চতুর্দ্দশ শতাব্দীর প্রথমেই এই নগর মুসলমানদিগের হস্তগত হয়। এবং ফৌজদার নামধেয় একজন শাসনকর্ত্তা তথায় শাসন কর্তৃত্বে নিযুক্ত হন। এই নগরে অনেকানেক হিন্দু ধনী ও ভূম্যধিকারীগণের বাস ছিল। তাঁহারা নবদ্বীপের ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণকে বিশেষ উৎসাহ দিতেন এবং সংসার নির্ব্বাহের যথেষ্ট আনুকূল্য করিতেন। চৈতন্য চরিতামৃতে লিখিত আছে——

"হিরণ্য গোবর্দ্ধন দুই সহোদর।
সপ্তগ্রাম বার লক্ষ মুদ্রার ঈশ্বর॥
মহৈশ্বর্য্য যুক্ত দুঁহে বদান্য ব্রাহ্মণ্য।
সদাচার সৎকুল ধার্ম্মিক অগ্রগণ্য॥
নদীয়াবাসী ব্রাহ্মণের উপজীব্য প্রায়।
অর্থ ভূমি গ্রাম দিয়া করেন সহায়॥"

যে দিন সরস্বতী নদীর স্রোত মন্দীভূত হইতে আরম্ভ হইয়াছিল, সেই দিন হইতেই সপ্তগ্রামের দুর্দ্দিনের সূত্রপাত হয়। পাঠকগণ এখন আর সে সপ্তগ্রাম নাই। এক দিন যে সপ্তগ্রাম বাণিজ্যে ও গৌরবে বঙ্গভূমির শীর্ষ স্থান ছিল, এবং ইউরোপীয় বণিকগণের বাণিজ্য তরী সকল তাহার

পদশোভিত করিত, এখন সেই সপ্তগ্রাম সামান্য পল্লীরূপ ধারণ করিয়া জন শূন্য হইয়াছে। খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে সরস্বতী নদীর মোহানা বন্ধ হইয়া যায় এবং সপ্তগ্রামের বণিকগণ কেহ হুগলী, কেহ বা কলিকাতায় গিয়া বাণিজ্য আরম্ভ করিলেন। এই সময় হইতেই কলিকাতার উন্নতির সূত্রপাত হইল।

নবদ্বীপে একজন কাজীর বাস ছিল কিন্তু শাসন সম্বন্ধে তাঁহার কোন বিশেষ ক্ষমতা ছিল না। সুতরাং পাঠান শাসনকালে বঙ্গভূমি এক প্রকার স্বাধীন ছিল বলিতে পারা যায়। সেই স্বাধীনতায় বঙ্গবাসীগণ আবার স্বাধীন চিন্তায় মনোনিবেশ করিলেন। এই সময়ে বিদ্যাপতি, চণ্ডিদাস প্রভৃতি কবিগণ প্রাদুর্ভূত হইয়া বাঙ্গালা ভাষার সাদরে অমৃতময়ী কবিতা সকল রচনা করিতে লাগিলেন। সেই উদ্দীপনার ফল স্বরূপ বঙ্গে রঘুনাথ, রঘুনন্দন ও চৈতন্য দেব আবির্ভূত হইলেন। চৈতন্যের সময় হইতে নবদ্বীপ প্রকৃত প্রাধান্য লাভ করিল। খৃষ্ট পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে, চৈতন্য চন্দ্রের উদয় হয়। এই সময় হইতেই বঙ্গ ভূমির প্রকৃত উন্নতি দেখা যায়। বঙ্গভাষা সমধিক উন্নতি লাভ করে এবং এই নবদ্বীপ হইতে ন্যায়, স্মৃতি, ও ধর্ম্ম তিন বিষয়ের তিনটী অভিনব স্রোত ত্রিধারায় নিঃসৃত হইয়া, সমস্ত ভারত ভূমি প্লাবিত করে। ক্রমান্বয়ে উক্ত তিন বিষয়ের বিবরণ লিখিত হইতেছে।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

মিথিলা বিদ্যালয়।

নবদ্বীপে ন্যায় চর্চ্চার পূর্ব্বে মিথিলা (ত্রিহুত্) বিদ্যা চর্চ্চার প্রধান স্থান ছিল। কি দর্শন, কি স্মৃতি, কি সাহিত্য সকল বিষয়েই মিথিলা প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল। এই স্থানেই মহামুনি গৌতম প্রাদুর্ভূত হইয়া স্বীয় অসাধারণ বুদ্ধিবলে ন্যায় বিদ্যার সূত্রপাত করিয়া গিয়াছেন। প্রায় আট শত বৎসর গত হইল, এই স্থানে মহামহোপাধ্যায় গঙ্গেশোপাধ্যায় জন্ম গ্রহণ করিয়া গৌতমের মতকে প্রবল ও দৃঢ়ীভূত ও চারিখণ্ড গৌতম শাস্ত্রের টীকা করিয়া পৃথিবী আলোকিত ও ভারতে ন্যায় বিদ্যা প্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছেন। এবং এই স্থানেই তদীয় পুত্র বর্দ্ধমান উপাধ্যায় দর্শন শাস্ত্রের অনেকানেক টীকা করিয়া বিখ্যাত হইয়া গিয়াছেন। এবং এই স্থানেই বাচস্পতি মিশ্র, মুরারি মিশ্র, এবং পক্ষধর মিশ্র প্রভৃতি উপাধ্যায়গণ শরীর পরিগ্রহ করিয়া ন্যায়ের উত্তম উত্তম গ্রন্থ রচনা করিয়া, মিথিলা ভূমিকে অলঙ্কৃত করিয়া গিয়াছেন। বঙ্গ দেশে ন্যায় বিদ্যার উন্নতির পূর্ব্বে মিথিলায় যে সকল পণ্ডিত জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন তাঁহাদিগের যত্নে প্রায় তিন শত বৎসর ন্যায় শাস্ত্রের বিশেষ উন্নতি হইয়াছিল। খৃষ্ট চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে এই শেষোক্ত ব্যক্তি অর্থাৎ পক্ষধর মিশ্র জীবিত ছিলেন। ইঁহার প্রকৃত নাম জয়ধর মিশ্র

তর্কালঙ্কার। ইহাঁকে জয়দেবও বলে। ইনি প্রসিদ্ধ যজ্ঞপতি উপাধ্যায়ের ছাত্র এবং হরি মিশ্রের ভ্রাতুষ্পুত্র বলিয়া স্বরচিত গ্রন্থে আত্মপরিচয় দিয়াছেন। বিভিন্ন পণ্ডিতগণ পক্ষধর নামের বিভিন্ন অর্থ করিয়া থাকেন। কেহ বলেন তিনি এক পক্ষ মধ্যে কেবল মাত্র এক দিন অধ্যয়ন করিতেন। কেহ বলেন, তিনি এক দিন পঞ্জিকা দেখিয়া এক পক্ষের বিবরণ বলিতে পারিতেন এবং কেহ বলেন তিনি এক দিন পড়িয়া এক পক্ষ মনে রাখিতে পারিতেন। কিন্তু ইহা অসম্ভব কেননা যিনি পনর দিন কোন বিষয় স্মরণ রাখিতে পারিতেন, তিনি যে ষোল দিন হইলে তাহা ভুলিয়া যাইবেন ইহা অস্বাভাবিক। এবং কেহ কেহ বলেন যে তিনি তর্ককালে দুর্ব্বল পক্ষ অবলম্বন করিয় স্বীয় অসাধারণ তর্কশক্তিবলে স্বমত সমর্থন করিতে পারিতেন বলিয়া, স্বীয় নাম ও চতুষ্পাঠীর নাম অপেক্ষা, "পক্ষধর" নামে বিশেষ বিখ্যাত হন।

মিথিলার ঐ সকল ও অন্যান্য অধ্যাপকদিগের দ্বারা ন্যায়ের অনেক গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল। ঐ গ্রন্থাদি মিথিলা ব্যতীত কুত্রাপি পওয়া যাইত না। তৎকালে মুদ্রাযন্ত্র ছিল না। কেহ একখানি পুস্তক রচনা করিলে তৎকালে হস্তে লিখিয়া লইতে হইত। ইহাতে শিক্ষার বিশেষ ব্যাঘাত ঘটিত। পুস্তক অভাবে অনেকেরই অধ্যয়ন হইত না। তৎকালে কেহ কোন পুস্তক রচনা করিলে, তিনি তাহা গোপনে রাখিবার চেষ্টা করিতেন। অদ্যাপিও

জ্যোতিষাদি কোন কোন বিদ্যাকে গোপনে রাখিতে দেখা যায়। ন্যায় বা তর্ক শাস্ত্রের গ্রন্থাদি গোপনে রাখা রীতি ছিল। এই কারনে ন্যায় বা তর্ক শাস্ত্রের গ্রন্থ মিথিলা ব্যতীত আর কুত্রাপি পাওয়া যাইত না। মৈথিলী অধ্যাপকগণ ঐ সকল গ্রন্থ অতি যত্ন সহকারে গোপনে রাখিতেন। তখন ভারতে মিথিলার অধ্যাপক ব্যতীত আর কাহারও উপাধি দিবার ক্ষমতা ছিলনা। সুতরাং ন্যায় শিক্ষার্থী ছাত্রগণ মিথিলায় গিয়া মৈথিলী উপাধ্যায়গণের নিকট শিক্ষা লাভ করিতেন। ও উপাধি প্রাপ্ত হইতেন।

যখন কোন ছাত্র-শিক্ষার্থী হইয়া মিথিলায় গমন করিতেন, তখন অধ্যাপকগণ ছাত্রদিগকে অধ্যয়নার্থ ন্যায়ের গ্রন্থাদি প্রদান করিতেন, এবং পাঠ শেষ হইলেই ঐ সকল গ্রন্থ পুনর্গ্রহণ করিয়া আপন অধিকারে রাখিতেন। যখন কোন ছাত্র স্থানান্তরে বা পাঠ সমাপনান্তে স্বদেশে যাইতে উদ্যত হইতেন তখন পাছে কোন গ্রন্থ বা টীকা বা গ্রন্থের কোন অংশ তৎকর্তৃক অপহৃত হয়, এবং তদ্দারা স্বদেশীয় পণ্ডিতগণের প্রাধান্য বিলুপ্ত হয়, এই ভয়ে তাহাকে উত্তম রূপে পরীক্ষা করা হইত। মিথিলা, এই রূপে প্রায় তিন শত বৎসর আপন অনন্যসাধারণতা রক্ষা করিয়া আসিয়াছিল।

এই ঘটনা দ্বারা স্পষ্টই উপলব্ধ হইতেছে যে তৎকালে ব্রাহ্মণগণ স্বীয় স্বীয় বিদ্যাবিশেষকে গোপনে রাখিতেন। এখনও তাঁহাদিগকে বিদ্যাবিশেষের শিক্ষা দিতে সঙ্কুচিত দেখা

যায়। শুদ্ধ যে ব্রাহ্মণেরাই স্বীয় বিদ্যাবিশেষকে গোপন করিতেন তাহা নহে, ইউরোপীয় কোন কোন পণ্ডিতগণের মধ্যে এরূপে আপন আপন বিদ্যাকে গোপনে রাখিতে দেখা যায়।

পাঠকগণ দেখুন তৎকালে বিদ্যা শিক্ষা করা কতই আয়াস ও কষ্ট সাধ্য ছিল। এইরূপ বিষম-অসুবিধা সত্তেও, তৎকালের অধ্যাপকগণ যাহা করিয়া গিয়াছেন বর্ত্তমান সময়ে পাঠোপযোগী গ্রন্থাদি বহুতর হইলেও এবং পাঠের যৎপরোনাস্তি সুবিধা থাকিলেও, তাহার শতাংশের একাংশ শিক্ষা হইতেছে না বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তি হইবে না।

যে সকল ছাত্র মিথিলা হইতে উপাধি পাইয়া মহোৎসাহে স্বদেশে প্রত্যাবৃত্ত হইতেন, তাঁহারা প্রায়ই কোন জমীদার বা রাজার আশ্রয়ে থাকিয়া, চতুষ্পাঠী স্থাপন করত শিক্ষা দিতে প্রবৃত্ত হইতেন। কিন্তু ন্যায়শাস্ত্র যেরূপ দুরূহশাস্ত্র, তাহাতে গ্রন্থ অভাবে সুচারু শিক্ষা দেওয়া অসম্ভব ব্যাপার ছিল; এবং বুদ্ধিমান ছাত্রগণও সেই শিক্ষায় সন্তুষ্ট হইতেন না। বহু দিবসাবধি ন্যায় শিক্ষা সম্বন্ধে এই রূপ গুরুতর অসুবিধা ছিল। পরিশেষে একজন বঙ্গবাসীর অসাধারণ মেধা ও স্মারকতা শক্তি, সেই অন্তরায়ের মূলে কুঠারাঘাত করিল। এই নবদ্বীপই তাঁহার জন্মভূমি, সেই স্বদেশহিতৈষী মহাত্মার নাম বাসুদেব সার্ব্বভৌম।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

বাসুদেব সার্ব্বভৌম।

নবদ্বীপ-ন্যায়-বিদ্যালয়।

খৃষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে বাসুদেব নবদ্বীপে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি রাঢ়ীশ্রেণীয় ব্রাহ্মণ ছিলেন। প্রায় পঁচিশ বৎসর গত হইল ইঁহার শেষ বংশধর হরিনাথ ভট্টাচার্য্যের পরলোক হওয়ায় নবদ্বীপ হইতে তদবংশের বিলোপ হইয়াছে। নদীয়া জেলার অন্তর্গত আড়বান্দী গ্রামের কেহ কেহ এই বাসুদেবের বংশ সম্ভূত বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন।

বাসুদেবের পিতার নাম মহেশ্বর বিশারদ ভট্টাচার্য্য। মহেশ্বর এক জন স্মার্ত্ত পণ্ডিত ছিলেন। তিনি বাসুদেবকে তৎকাল প্রচলিত প্রথানুসারে ব্যাকরণ ও কাব্যাদি পাঠ সমাপনান্তে স্মৃতি অধ্যয়নে প্রবৃত্ত করান। বাসুদেব স্বীয় পরিশ্রম গুণে অল্প দিনের মধ্যে স্মৃতি শাস্ত্রে বিশেষ জ্ঞান লাভ করিলেন। স্মৃতি শাস্ত্র অধ্যয়নে তাঁহার তৃপ্তি হইল না। তিনি ন্যায় শিক্ষার জন্য উৎসুক হইয়া মিথিলা যাত্রা করিলেন।

বাসুদেব যখন মিথিলা যাত্রা করেন তখন তাঁহার বয়স আনুমানিক পঁচিশ বা ত্রিশ বৎসর। মিথিলায় তৎকালে পক্ষধর মিশ্রই প্রধান নৈয়ায়িক ছিলেন।

বাসুদেব তাঁহারই চতুষ্পাঠীতে প্রবিষ্ট হইয়া ন্যায় শাস্ত্র অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হইলেন। ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়নে তিনি নিত্য নব নব আনন্দ অনুভব করিতেন লাগিলেন। এবং মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলেন যে ন্যায় শাস্ত্রকে—যে, ন্যায়ের গ্রন্থাদি মিথিলা ব্যতীত কুত্রাপি পাওয়া যায় না; যে ন্যায়ের নিমিত্ত ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ-বাসী বিদ্যার্থীদিগকে মিথিলার মুখাপেক্ষা করিতে হয়—সেই ন্যায় শাস্ত্রকে মিথিলা হইতে কোন প্রকারে সংগ্রহ করিয়া জন্ম-ভূমি অলঙ্কৃত করিবেন। কিন্তু মৈথিলী আচার্য্যদিগের যত্ন রক্ষিত ন্যায় শাস্ত্র আত্মসাৎ করা একেবারেই দুঃসাধ্য বিবেচনা করিলেন। তখন তিনি মনে মনে স্থির করিলেন যে, ন্যায় শাস্ত্রকে কণ্ঠস্থ করিয়া স্বদেশে লইয়া যাওয়া ব্যতীত আর কোন উপায় নাই। তদনন্তর তিনি প্রগাঢ় পরিশ্রম ও যত্ন সহকারে ন্যায় অধ্যয়নে মনোনিবেশ করিলেন এবং কএক বৎসর দিবা রাত্রি পরিশ্রম করিয়া ন্যায় শাস্ত্রকে বিশেষত গাঙ্গেশোপাধ্যায় কৃত চারি খণ্ড চিন্তামণি শাস্ত্রের আদ্যোপান্ত একেবারে কণ্ঠস্থ করিলেন। তিনি যখন দেখিলেন যে উক্ত শাস্ত্র সম্যক কণ্ঠস্থ হইয়াছে - তখন তিনি কুসুমাঞ্জলি অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হইলেন এবং পূর্ব্ববৎ মনোযোগের সহিত কুসুমাঞ্জলি কণ্ঠস্থ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। অচিরে তাঁহার উদ্দেশ্য ছাত্রমণ্ডলির মধ্যে প্রচার হইয়া অবিলম্বে ঐ কথা পক্ষধরের কর্ণগোচর হইল। সুতরাং আর তাঁহার কুসুমাঞ্জলি কণ্ঠস্থ করা হইল না। তখন তিনি স্বদেশ প্রত্যাগমনের বাসনা

করিলেন। তদনন্তর তাঁহার আচার্য্য পক্ষাধরমিশ্র কর্তৃক তাঁহার পরীক্ষা গৃহীত হইল। তিনি যে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন তাহার নাম শলাকা পরীক্ষা।

শলাকা পরীক্ষা এইরূপ। একটী শূচ্যগ্র লৌহ শলাকা পুঁথির পত্রের উপর নিঃক্ষেপ করিলে শেষে যে পত্রখানি বিদ্ধ হয় সেই পত্রখানি ব্যাখ্যা করিতে দেওয়া হয়। এবং তাহার ব্যাখ্যা শেষ হইলে পুনরায় উক্ত শলাকা কখন সহজে কখন বা সবলে পুনঃ পুন নিক্ষিপ্ত হয় ও প্রত্যেক বারেই নূতন পত্র ব্যাখ্যা করিতে দেওয়া হয়। বাসুদেবকে এইরূপে শতবারে শতখানি পত্রের ব্যাখ্যা করিতে হয়। তিনি তৎ-সমুদয় অতি সুচারুরূপে ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। তাঁহার গুরু তাঁহার পরীক্ষায় সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে "সার্ব্বভৌম" এই উপাধি প্রদান করিলেন।

অনন্তর বাসুদেব স্বদেশ প্রত্যাগমনের উদ্যোগ করিলেন। কিন্তু তিনি পাছে, গ্রন্থ বা গ্রন্থের কোন অংশ, সঙ্গে করিয়া লইয়া যান, সেই আশঙ্কায় মৈথিলী অধ্যাপকগণ কর্তৃক তাঁহার অঙ্গবস্ত্র বিশেষরূপে পরীক্ষা করা হইয়াছিল। তখন বাসুদেব বলিয়াছিলেন যে 'আমার স্মৃতিপটে সমুদয় গ্রন্থ অঙ্কিত রহিয়াছে আমার কোন গ্রন্থ লইয়া যাইবার প্রয়োজন নাই।' তাঁহার এই কথায় মৈথিলী অধ্যাপকগণ বিশেষ ঈর্ষ্যান্বিত হইলেন। বাসুদেবও তাহা বুঝিতে পারিলেন। তিনি মনে মনে চিন্তা করিলেন "যদি নবদ্বীপের পথে যাই তাহা হইলে পথি মধ্যে তাঁহার জীবনের উপর কোন অত্যাচার ঘটিবার

সম্ভাবনা। এই ভয়ে তিনি নবদ্বীপ যাত্রাচ্ছলে কাশী-ধামযাত্রা করিলেন। কাশী যাইবার তাঁহার উদ্দেশ্যও ছিল। মিথিলায় তিনি কেবল ন্যায় শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া ছিলেন। বেদান্ত শাস্ত্রেও তাঁহার জ্ঞানলাভ করা অভিপ্রায় ছিল। তিনি কাশীধামে উত্তীর্ণ হইয়া কিছু দিন তথায় বেদাধ্যয়ন করত ঐ শাস্ত্রেও বিশেষ জ্ঞান লাভ করিয়া খৃষ্ট পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্য ভাগেই নবদ্বীপ আসিয়া উপস্থিত হন।

তিনি নবদ্বীপ আসিয়াই সর্ব্বাগ্রে সমস্ত ন্যায়শাস্ত্র লিপিবদ্ধ করিলেন। কুসুমাঞ্জলির কেবল মাত্র শ্লোকাংশই কণ্ঠস্থ হইয়াছিল। সুতরাং নবদ্বীপে কেবল মাত্র কুসুমা-ঞ্জলির শ্লোকাংশ দেখা যায়।

তিনি পুস্তক লিপিবদ্ধ করিয়া সর্ব্ব প্রথম ন্যায়শাস্ত্রের চতুষ্পাঠী স্থাপন করিলেন। এবং উৎসাহ সহকারে ন্যায় শিক্ষা দিতে লাগিলেন। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে তাঁহার পিতা নবদ্বীপের একজন প্রসিদ্ধ-স্মার্ত্ত-পণ্ডিত বলিয়া বিখ্যাত ছিলেন। এক্ষণে সেই স্মার্ত্ত পণ্ডিতের পুত্র মিথিলা হইতে বিপুল ন্যায়শাস্ত্র কণ্ঠস্থ করিয়া আনিয়া নবদ্বীপে ন্যায়শাস্ত্রের চতুষ্পাঠী স্থাপন করিয়া শিক্ষা দিতেছেন ; এই নূতন সংবাদে চারি দিক হইতে তাঁহার টোলে ছাত্রগণ প্রবিষ্ট হইতে লাগিল এবং দিন দিন তাঁহার ছাত্রসংখ্যা বৃদ্ধি হইতে লাগিল।

বাসুদেব কেবল মাত্র গঙ্গেশোপাধ্যায় কৃত চিন্তামণি ও কুসুমাঞ্জলির শ্লোকাংশ কণ্ঠস্থ করিয়া আনিয়াছিলেন।

এবং তাহারই অধ্যাপনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। দর্শন শাস্ত্রের অন্যান্য অংশ তৎকালে নবদ্বীপে অধীত হইত না। সুতরাং দূরদেশীয় ছাত্রগণ তখনও মিথিলায় গিয়া দর্শন শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন। তাহারা জানিতেন যে মৈথিল-পণ্ডিতগণ ব্যতীত উপাধি দিবার আর কাহারও অধিকার নাই। পরিশেষে বাসুদেবের জনৈক ছাত্রের বুদ্ধি কৌশলে নবদ্বীপ বিদ্যালয় উপাধিদানের ক্ষমতা পাইয়া ভারতের বিশ্ববিদ্যালয়রূপে পরিগণিত হইল। সেই অসাধারণ-ধীশক্তি-সম্পন্ন ব্যক্তির নাম রঘুনাথ-শিরোমণি। পর পরিচ্ছেদে তদীয় বিবরণ লিখিত হইল।

বাসুদেব দীর্ঘজীবী ছিলেন। রঘুনাথ ও চৈতন্য তাঁহার প্রধান ছাত্র ছিলেন। কথিত আছে রঘুনন্দন, ও কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ তাঁহার নিকট অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। বাসুদেব, কি স্মৃতি, কি দর্শন, কি বেদান্ত সকল বিষয়েই সমান পারদর্শী ছিলেন। তিনি "সার্ব্বভৌমনিরুক্ত" নামে ন্যায়ের এক গ্রন্থ প্রনয়ণ করেন। তাঁহার আর কোন গ্রন্থের পরিচয় পাওয়া যায় না।

চৈতন্য চরিতামৃত গ্রন্থ পাঠে জানা যায়, বাসুদেব জীবনের শেষ দশায় শ্রীক্ষেত্রে বাস করিয়াছিলেন। কি কারণে শ্রীক্ষেত্রে বাস করেন, তাহা জানিবার উপায় নাই। বোধ হয় এক্ষণে যেমন অনেকে ৺কাশীধামে বা বৃন্দাবনধামে গমন করিয়া জীবনের শেষাবস্থা অতিবাহিত করেন। তৎকালে বৃন্দাবনধাম প্রকাশিত না থাকায় অনেকে

বোধ হয় শ্রীক্ষেত্রে থাকিয়া শেষ জীবন যাপন করিতেন। অথবা তৎকালে সমস্ত বঙ্গ-ভূমি মুসলমানদিগের শাসনাধীন ছিল। পরন্তু উড়িষ্যা তৎকালে স্বাধীন ছিল। তথায় গঙ্গাবংশীয় প্রতাপরুদ্রদেব স্বাধীন ভাবে রাজত্ব করিতেছিলেন। প্রতাপরুদ্র একজন প্রবল পরাক্রান্ত রাজা ও বিদ্যা বিষয়ে নিরতিশয় উৎসাহ-বর্দ্ধক ছিলেন। এই প্রতাপরুদ্র বাসুদেবকে, যারপর নাই ভক্তি ও শ্রদ্ধা করিতেন। হয়ত তাঁহারই যত্নে ও আগ্রহে বাসুদেব তাঁহার সভাপণ্ডিত নিযুক্ত হইয়া জীবনের শেষভাগ শ্রীক্ষেত্রে অবস্থিতি করেন। এই স্থানে তাঁহার সহিত মহাত্মা চৈতন্যদেবের বিচার হয়। বিচারে পরাস্ত হইয়া বাসুদেব চৈতন্যের মতাবলম্বী হন।

দুর্গাদাস-বিদ্যাবাগীশ—দুর্গাদাস বাসুদেবের পুত্র ছিলেন। তিনি বোপদেব কৃত মুগ্ধবোধব্যাকরণের ও কবিকল্পদ্রুমের টীকা প্রণয়ন করেন। ঐ কবিকল্পদ্রুমের টীকার নাম ধাতু-দীপিকা। ঐ টীকায় তিনি আপনাকে বাসুদেব সার্ব্বভৌমের পুত্র বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। যথা—

"শাকে সোমরসেষুভূমি গণিতে শ্রীসার্ব্বভৌমাত্মজো দুর্গাদাস ইমাঞ্চকার বিযদাং টীকাং স্ববোধাবধি।"

পরে বলিয়াছেন—

"ইতি বাসুদেব সার্ব্বভৌমভট্টাচার্য্যাত্মজ শ্রীদুর্গাদাস শর্ম্মঃ বিরচিত ধাতুদীপিকা নাম কবিকল্পদ্রুম টীকা সমাপ্তা।"

ইহাতে প্রকাশ আছে দুর্গাদাস-বিদ্যাবাগীশ বাসুদেব সার্ব্বভৌমের পুত্র এবং ধাতু দীপিকার টীকা ১৫১১ বা

১৫৬১ শকে সমাপ্ত হইয়াছে। কারণ শাকে "সোম রসেষু" 'রসা-ইষু' ও 'রস-ইষু' রসেষু, হয়। রসা শব্দে ১ এবং রস শব্দে ৬ বুঝায়। এক্ষণে যদি আমরা রসা-ইষু গ্রহণ করি তাহা হইলে ঐ টীকা ১৫১১ শকে রচিত বলিতে পারি। ১৫১১ শক ধরিলে দুর্গাদাসকে এই বাসুদেবের পুত্র বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে পারা যায়। ১৪৫৫ শাকে চৈতন্যের অন্তর্দ্ধান হয় তৎকালে সার্ব্বভৌম জীবিত ছিলেন। এবং ১৫১১ শকে ধাতু দীপিকা রচিত হয়। তাহা হইলে উভয়ের ব্যবধান কাল ৫৬ বৎসর মাত্র দেখা যায়। যদি দুর্গাদাসকে কিছু দীর্ঘজীবী ধরা যায় এবং সার্ব্বভৌমের শেষ দশায় যদি তাঁহার জন্ম অনুমান করা যায়; তাহা হইলে অনায়াসেই ইহাকে এই বাসুদেবের পুত্র বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে পারা যায়। পক্ষান্তরে পিতা বড় লোক না হইলেই প্রায়ই কেহ পুস্তকে পিতার পরিচয় দেন না। বাসুদেব একজন অদ্বিতীয় পণ্ডিত ছিলেন; তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই সুতরাং দুর্গাদাসকে এই বাসুদেবের পুত্র বলিয়াই নির্দ্দেশ করা গেল। দুর্গাদাসের পর তাঁহার বংশের আর কোন পরিচয় পাওয়া যায় না।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

রঘুনাথ-শিরোমণি।

নবদ্বীপ-ন্যায়ের-প্রাধান্য-স্থাপন।

খৃষ্টীয় শাকের পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে রঘুনাথ নবদ্বীপে প্রাদুর্ভূত হন। কি দুঃখের বিষয় উক্ত মহোদয়ের কোন জীবনী নাই। তিনি স্বীয় গ্রন্থেও নিজের কোন পরিচয় দেন নাই। তৎ সম্বন্ধে যে কিছু কিম্বদন্তী প্রচলিত আছে তাহাই অবলম্বনে উক্ত মহামহোপাধ্যায়ের কথঞ্চিৎ সুতরাং অসম্পূর্ণ জীবন চরিত লিখিত হইল।

রঘুনাথ তৃতীয় কি চতুর্থ বৎসর বয়সে পিতৃহীন হন। সুতরাং তাঁহার ভরণ পোষণের ভার, তদীয় দুঃখিনী জননীর হস্তে বর্ত্তে। রঘুনাথের পিতা অতিশয় দুঃখী ছিলেন। সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ হয় তাঁহার এমন কোন সঙ্গতি ছিলনা সুতরাং স্বামী বিয়োগে রঘুনাথের মাতা বড়ই দুঃখে পড়িলেন। অবশেষে তিনি ভিক্ষাবৃত্তি দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে লাগলেন। কিন্তু প্রত্যহ ভিক্ষা করাও সহজ ব্যাপার নহে সুতরাং তিনি বাসুদেব সার্ব্বভৌমের টোলের কোন কোন ছাত্রের গৃহ কার্য্য করিয়া স্বীয় ও পুত্রের গ্রাসাচ্ছাদন চালাইতে লাগিলেন।

জন্মাবধি রঘুনাথ এক চক্ষু-হীন ছিলেন। তজ্জন্য তিনি পরে কাণাভট্ট-শিরোমণি বলিয়া বিখ্যাত হন।

বাল্যকাল হইতেই তাঁহার যে সকল ধীশক্তির কথা শুনা যায়, বর্ণনা দ্বারা তাহার সহস্রাংশের একাংশ হৃদয়ঙ্গম করিয়া দেওয়া সহজ ব্যাপার নহে।

যখন রঘুনাথের বয়স চারি পাঁচ বৎসর সেই সময়ে তিনি এক দিন, মাতার নির্দেশানুসারে বাসুদেবের টোলের কোন ছাত্রের নিকট হইতে অগ্নি আনিতে গিয়াছিলেন। আগুনের জন্য উক্ত ছাত্রকে বারম্বার বিরক্ত করায় ছাত্র উত্যক্ত হইয়া, শাগ্র হস্তে এক হাতা জলন্ত অঙ্গার লইয়া, রঘুনাথকে লইতে কহিলেন। রঘুনাথ আগুন আনয়ন জন্য কোন পাত্র লইয়া যান নাই। তিনি নিতান্ত নিরূপায় হইয়া স্বীয় প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব গুণে লঘু হস্ততা সহকারে তৎ ক্ষনাৎ এক আঞ্জলি বালি লইয়া অগ্নি লইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। এই সময়ে বাসুদেব স্বীয় চতুষ্পাঠীতে উপস্থিত ছিলেন। তিনি পঞ্চমবর্ষীয় বালকের এতাদৃশ উপস্থিত বুদ্ধি দেখিয়া বিস্মিত ও চমৎকৃত হইলেন। এবং রঘুনাথের মাতাকে ডাকিয়া কহিলেন ‘তোমার পুত্রটী আমাকে দাও আমি ইহার ন্যায় বুদ্ধিমান বালক আর দেখি নাই; বোধ হয় ইহার দ্বারা কোন অসাধারণ কার্য্য সম্পন্ন হইবে।” তখন রঘুনাথের দুঃখিনী জননী কহিলেন “প্রভু এটীত আপনারই সন্তান তবে আবার আমার অনুমতির অপেক্ষা কি! আপনি উহার পঠনের ভার লইলেন ইহা অপেক্ষা আমার সৌভাগ্য কি আছে।”

অনন্তর বাসুদেব শুভদিনে শুভক্ষণে পঞ্চম বৎসর বয়সে রঘুনাথের হাতে খড়ি দিলেন। কথিত আছে

যখন রঘুনাথকে ক, খ, শিখাইতে আরম্ভ করা হয় তখনই রঘুনাথ জিজ্ঞাসা করেন 'ক' অগ্রে না বলিয়া 'খ' আগে বলিলে কি দোষ হয়। বাসুদেব মহা বিপদে পড়িলেন তাঁহাকে বর্ণের উচ্চারণ বিধি শিখাইতে হইল। ভারতবর্ষীয় বর্ণমালা স্বাভাবিক স্বর-সম্ভূত বলিয়া অর্থাৎ কণ্ঠ, তালু, মূর্দ্ধা দন্ত, ও ওষ্ঠ এই বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে গঠিত বলিয়া বাসুদেব রঘুনাথকে বুঝাইতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

তদনন্তর রঘুনাথ ব্যঞ্জন-বর্ণের মধ্যে দুইটী 'জ' দুইটী, 'ন' দুইটী 'ব' এবং তিনটী 'স' এর প্রয়োজনীয়তা কি বলিয়া আপত্তি উত্থাপন করত একাধিক বর্ণের প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করেন। বাসুদেব দেখিলেন যে, এ সামান্য বালক নহে। তখন তিনি উচ্চারণ বিধি, ণত্ব ও ষত্ব বিধি প্রভৃতি ব্যাকরণ পড়াইয়া 'জ' আদি বর্ণের প্রয়োজনীয়তা স্পষ্ট করিয়া বুঝাইয়া দিলেন। সুতরাং রঘুনাথকে বর্ণ-মালা শিখাইতে গিয়াই সমস্ত ব্যাকরণ পড়াইতে হইয়াছিল। ফলত এরূপ অল্প বয়সে এরূপ অসাধারণ তর্ক ও বিচার শক্তি আর কুত্রাপি দেখা যায় না।

রঘুনাথ অতি অল্প বয়সেই ব্যাকরণ ও কাব্য ও অভিধানাদি পাঠ শেষ করিলেন এবং কিছুদিন স্মৃতিশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া বাসুদেবের নিকট ন্যায় অধ্যয়নেপ্রবৃত্ত হইলেন।

বাসুদেব অতি যত্ন সহকারে রঘুনাথকে শিখাইতে লাগিলেন। রঘুনাথও সর্ব্বদা অতিশয় মনোযোগের সহিত

পাঠাভ্যাস করিতে লাগিলেন। বাসুদেব যাহা শিক্ষা দিতেন ; রঘুনাথ রাত্রিতে তৎসমুদয় লিপিবদ্ধ করিতেন এবং তাঁহার মতের মধ্যে কোনমতের বিসম্বাদিতা দেখিলে তাহা খণ্ডন করিয়া পর দিন বাসুদেবকে স্বীয় মত শুনাইতেন এইরূপে তর্কশাস্ত্রে তাঁহার অসাধারণ ক্ষমতা জন্মিল। বাসুদেব শীঘ্রই বুঝিতে পারিলেন যে, এই বালককে শিক্ষা দেওয়া অতীব দুরূহ ব্যাপার এবং প্রমাণাদি দ্বারা সন্তুষ্ট করাও নিতান্ত সহজ ব্যাপার নহে। রঘুনাথও অল্প সময়ে তাহার অধ্যাপকের সমস্ত ক্ষমতা বুঝিতে পারিয়াছিলেন তিনি ন্যায়শাস্ত্রের ব্যাখ্যায় ও তর্কের উৎকর্ষতায় গুরুকে অতিক্রম করিতে লাগিলেন।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, বাসুদেব, "সার্ব্বভৌমনিরুক্ত" নামে এক খানি টীকা গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। রঘুনাথ স্বীয় অচিন্তিতপূর্ব্ব তর্কশক্তি প্রভাবে ঐ পুস্তকের নানা দোষ বাহির করিয়া উক্ত পুস্তকের অসারতা প্রতিপন্ন করিলেন। এমন কি তাহার পাঠ্যগ্রন্থ চিন্তামণিও যে ভ্রমমূলক পঠদ্দশাতেই তদবিষয়ে নানা প্রকার প্রবন্ধ লিখিয়া স্বমত-সমর্থন-পূর্ব্বক তৎসমুদয় প্রচার করিতে লাগিলেন। এখন নবদ্বীপের টোলে কি মহান কোলাহল উপস্থিত হইল। এখন তাহার মস্তকোপরি কি ভয়ানক ঝড় প্রবাহিত হইতে লাগিল।

এস্থলে ইহাও উল্লেখ করা কর্ত্তব্য যে মহাত্মা চৈতন্য দেবের দ্বারা রঘুনাথের মত অনেক স্থলে সুপরিস্কৃত হইয়াছিল। রঘুনাথ চৈতন্যের সমাধ্যায়ী ছিলেন। রঘুনাথ অনেক

চিন্তার পর যে তর্কের মীমাংসা করিতেন ; চৈতন্য দেবকে জিজ্ঞাসা মাত্রেই তিনি তৎক্ষণাৎ তাহার সমাধান করিয়া দিতেন। এক দিন রঘুনাথ কোন কঠিনতর তর্কের মীমাংসার জন্য নবদ্বীপের পার্শ্বস্থ পর্ণক্ষেত্রে ঔড়ম্বর বৃক্ষতলে নিভৃতে, একাগ্র মনে, গভীর ন্যায়-চিন্তায় নিমগ্ন ছিলেন। চিন্তায় এরূপ গাঢ় মনঃসংযোগ হইয়াছিল যে পক্ষীগণ তাঁহার গাত্রে মলত্যাগ করাতেও তাঁহার সংজ্ঞা লাভ হয় নাই। ঐ দিবস দিবারজনী এই রূপে অতিবাহিত হয়। তথাপি তাহার চিন্তা ভঙ্গ হয় নাই। পর দিবস প্রাতঃকালে চৈতন্য দেব প্রাতঃস্নানান্তে নানা স্থান অনুসন্ধান করিয়া কোথাও তাঁহার দর্শন না পাইয়া অবশেষে ঐ স্থানে উপস্থিত হইলেন। এবং রঘুনাথকে তথাবিধ চিন্তারত ও তদবস্থ দেখিয়া হস্তস্থিত কমণ্ডলুর জল তদীয় মস্তকোপরি নিক্ষেপ করিয়া কহিলেন "বনে বসিয়া মাথামুণ্ড কি ভাবিতেছ ? রঘুনাথ ধ্যানভঙ্গে উত্তর করিলেন 'তুমি তাহার কি বুঝিবে। ইহাতে চৈতন্য অতিশয় আগ্রহ সহকারে কহিলেন ভাই তুমি কি ভাবিতেছিলে তাহা আমাকে বলিতেই হইবে। তখন রঘুনাথ অগত্যা তাহার চিন্তিত বিষয় প্রকাশ করিলেন। তীক্ষ্নধী চৈতন্য দেব যেন চিরাভ্যস্তের ন্যায় তৎক্ষণাৎ তাহার মীমাংসা করিয়া দিলেন। এই মীমাংসা রঘুনাথের মনের সহিত ঐক্য হইল। তখন রঘুনাথ কহিলেন ভাই আমি যাহা ৩। ৪ দিন চিন্তা করিয়া স্থির করিতে পারিতেছি না তাহা তুমি অনায়াসেই সিদ্ধান্ত করিলে। অতএব ভাই তুমি মানুষ নও। কিন্তু সেই মহাপুরুষ অবিলম্বে অন্য পথের পথিক হইলেন।

পরে তাঁহার জীবনবৃত্ত লিখিত হইল। তাঁহার পবিত্র জীবন চরিত পাঠে নানাবিধ মহোপকার লাভ করা যায়। আর বঙ্গভূমিতে যে প্রকৃত মহাপুরুষের জন্মগ্রহণ অসম্ভব ব্যাপার নহে তাহা অনায়াসেই বুঝিতে পারা যায়।

যাহা হউক রঘুনাথের মতের সহিত চৈতন্যের মতের মিলন হইলেই রঘুনাথ তৎসমুদয় স্থিরসিদ্ধান্ত মনে করিয়া লিপিবদ্ধ করিতেন। কিন্তু বাসুদেব সরল মনে ঐ সকল মত গ্রহণ করিতেন না। তাহাতে রঘুনাথ সর্ব্বদাই চিন্তাযুক্ত ও বিমনা থাকিতেন। এক দিবস বাসুদেব রঘুনাথকে নিতান্ত বিমনা দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন যে, তোমাকে এখন সর্ব্বদাই ম্লান দেখি, বোধ হয় আমার শিক্ষায় তোমার মনতুষ্টি হয় না। রঘুনাথ কহিলেন, প্রভু! সত্যই অনুভব করিয়াছেন। আপনি যে কি কারণে আমার মীমাংসায় অনুমোদন করেন না, তাহা আমি বুঝিতে পারিতেছিনা। তজ্জন্য মনে মনে বাসনা করিয়াছি যে একবার মিথিলা যাত্রা করিব। বাসুদেব শুনিয়া কহিলেন উত্তম প্রস্তাব করিয়াছ। আমারও ইচ্ছা তুমি মিথিলা যাত্রা কর। কিন্তু তথায় আমা অপেক্ষা অধিক উত্তর পাইবে এমন ভরসা নাই।

এইরূপে তিনি গুরুর নিকট অনুমতি পাইয়া মিথিলা যাত্রা করিলেন। মিথিলা যাইবার তাঁহার আরও কারণ ছিল। তৎকালে মিথিলা ব্যতীত উপাধি দিবার আর কাহারও ক্ষমতা ছিল না। সুতরাং মিথিলার গর্ব্ব খর্ব্ব করিতে না পারিলে নবদ্বীপ চতুষ্পাঠী হইতে উপাধি দানের

সম্ভাবনা নাই। নবদ্বীপ চতুষ্পাঠী হইতে উপাধি দানের ক্ষমতা স্থাপিত হয় ইহাও তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল। তিনি খৃষ্টীয় ষোড়ষ শতাব্দীর প্রথম অংশেই মিথিলায় পৌছিলেন। তখন তাহার বয়স বিংশ বৎসর মাত্র হইবে।

এই সময়ে সুপ্রসিদ্ধ প্রাচীন অধ্যাপক পক্ষধরমিশ্র জীবিত ও তিনিই তৎকালে মিথিলায় প্রধান অধ্যাপক ছিলেন। নানা দিগ্‌দেশীয় ছাত্রমণ্ডলীতে তাঁহার চতুষ্পাঠী পরিপূর্ণ ছিল। রঘুনাথ তাঁহারই চতুষ্পাঠীতে প্রবিষ্ট হইলেন।

তখন ছাত্রগণ রঘুনাথকে এক চক্ষুহীন দেখিয়া ব্যঙ্গ স্বরে কহিলেন——

"আখণ্ডলঃ সহস্রাক্ষো বিরূপাক্ষস্ত্রিলোচনঃ।
অন্যে দ্বিলোচনাঃ সর্ব্বে কো ভবানেকলোচনঃ॥"

রঘুনাথ এই ব্যাঙ্গোক্তি শ্রবণে সদর্পে উত্তর করিলেন—

"নলদ্বীপ, কুশদ্বীপ, নবদ্বীপ নিবাসিনঃ।
তর্কসিদ্ধান্ত সিদ্ধান্ত, শিরোমণি মনীষিণঃ॥"

রঘুনাথের এই উত্তর প্রাসঙ্গিক হয় নাই। কারণ কেবল মাত্র রঘুনাথের কথা জিজ্ঞাসা করায় তিনি তিন জনের পরিচয় দিয়াছেন। ফলে ঐ বিষয় যেমন শ্রুত হইয়াছি তাহাই লিখিত হইল। তাঁহার সহিত তর্কসিদ্ধান্ত ও সিদ্ধান্ত, উপাধিকারী যে দুই ব্যক্তি গিয়াছিলেন, তাঁহারা কে, তাহা জানিবার উপায় নাই।

সেই সময়ে উক্ত চতুষ্পাঠীতে ছাত্র শিক্ষাপ্রণালী প্রচলিত ছিল। উচ্চ শ্রেণীর ছাত্রেরা নিম্ন শ্রেণীর ছাত্র-

দিগকে শিক্ষা দিতেন। অদ্যাপি নবদ্বীপে ঐ প্রথা প্রচলিত আছে। রঘুনাথ নিম্নতর শ্রেণীতে প্রবিষ্ট হইলেন। নিম্ন শ্রেণীতে প্রবিষ্ট হইলেন বটে, কিন্তু তাঁহাকে অধিক দিন ঐ শ্রেণীতে থাকিতে হয় নাই। তিনি স্বীয় অলোক-সামান্য-প্রতিভাগুণে অল্পকালের মধ্যেই পক্ষধরের টোলে শ্রেষ্ঠ আসন গ্রহণ করিলেন। রঘুনাথ নবদ্বীপ হইতে বাসুদেবের নিকট উত্তমরূপে চিন্তামণি অধ্যয়ন করিয়া গিয়াছিলেন। এক্ষণে তৎসম্বন্ধীয় নানা প্রকার তর্ক ও প্রতিবাদ উপস্থিত করিতে লাগিলেন এইরূপ করাতে তিনি শীঘ্রই উচ্চ শ্রেণীতে উঠিলেন। পক্ষধরের কএক জন সুতার্কিক ছাত্র ছিলেন। এ পর্য্যন্ত তাহাদের সকলকেই পরাজিত করা, কাহারও ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে নাই। কিন্তু রঘুনাথ অনায়াসেই একে একে তাঁহাদিগের সকলকেই পরাজিত করিলেন।

ছাত্রগণকে পরাজিত করিয়া রঘুনাথ পক্ষধরের পশ্চৎ-ভাগে উপনীত হইলেন। কারণ পক্ষধরের নিয়ম ছিল যে, তিনি চতুষ্পাঠীর উচ্চ স্থানে বিমুখ হইয়া ছাত্রদিগকে শিক্ষা দিতেন ও পুস্তক লিপিবদ্ধ করিতেন। যে ছাত্র তাঁহাকে তর্কে সন্তুষ্ট বা লেখনী বন্ধ করিতে পারিতেন তিনি তাহারই প্রতি সম্মুখ হইয়া বিচার করিতেন। কিন্তু এখন পর্য্যন্ত তাহার ভাগ্যে এরূপ ছাত্র ঘটিয়া উঠে নাই। কিন্তু রঘুনাথের তর্কে তাহাকে মুখ ফিরাইতে হইল।

এই সময়ে পক্ষধর মিশ্র সামান্য লক্ষণা নামক পুস্তক লিখিতে ছিলেন। রঘুনাথ তাহারই দোষ ধরিতে লাগিলেন

তিনি সামান্য লক্ষণা, একেবারেই অস্বীকার করিলেন। তখন পক্ষধর কহিলেন——

বক্ষোজপানকৃৎ কাণ সংশয়ে জাগ্রতি স্ফুটং।
সামান্য লক্ষণা কস্মাদকস্মাদবলুপ্যতে॥

রঘুনাথ কহিলেন——

যোঽন্ধং করোত্যক্ষিমন্তং যশ্চ বালং প্রবোধয়েৎ।
তমেবাধ্যাপকং মন্যে তদন্যে নামধারিণঃ॥

এইরূপে পক্ষধরের সহিত ঘোরতর তর্ক আরম্ভ হইল। রঘুনাথ, চিন্তামণি সম্বন্ধে নানা বিধ তর্ক উপস্থিত করিলেন। পক্ষধর রঘুনাথের এই অসাধারণ তর্কশক্তি ও স্থিরবুদ্ধি দেখিয়া বুঝিতে পারিলেন; এই বালককে শুদ্ধ কথায়, বা সহজে বুঝাইয়া রাখা নিতান্ত কঠিন। তখন তিনি অধ্যাপকদিগের চিরপ্রচলিত প্রথানুসারে চাতুর্য্য ও বাগ্‌জাল বিস্তার করিয়া তাঁহাকে দমন করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু রঘুনাথ সে ধাতুর বাঙ্গালী ছিলেন না, তিনি যতক্ষণ বুঝিতে না পারিলেন, ততক্ষণ নিরস্ত না হইয়া, পুনঃপুন তাঁহার সহিত তর্কে প্রবৃত্ত হইলেন। এইরূপ করাতে তাঁহাকে শীঘ্রই অপদস্থ হইতে হইল।

অল্প দিনের মধ্যেই মিথিলার সর্ব্বত্র রঘুনাথের কথা প্রচারিত হইল। দিন দিন পক্ষধরের চতুষ্পাঠীতে অধ্যাপক ও ছাত্রগণের সমারোহ হইতে লাগিল। এইরূপে এক দিবস বহুতর অধ্যাপক ও ছাত্রগণ সমবেত হইয়াছেন; এমন সময়ে পক্ষধরের সহিত রঘুনাথের তর্কারম্ভ হইল। অনেক-

ক্ষণ বিচারের পর, রঘুনাথ পক্ষধরের মতকে খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। পক্ষধর নিজমত রক্ষণে অসমর্থ ও শিরোমণির মত অকাট্য, মনে মনে বুঝিতে পারিয়াও লোক লজ্জা ভয়ে প্রকাশ্যরূপে স্বীকার করিলেন না ; প্রত্যুত নির্ব্বোধ ব্যল্লিক ইত্যাদি কটুকাব্য প্রয়োগ করিয়া রঘুনাথের বিলক্ষণ অবমাননা করিলেন। অন্যান্য ছাত্রগণ ও অধ্যাপকেরা নানা প্রকার বিদ্রূপ ও ঠাট্টা করিতে লাগিলেন। তিনি যার পর নাই দুঃখিত হইয়া পক্ষধরের চতুষ্পাঠী হইতে বাসায় প্রত্যাগমন করিলেন।

তিনি বাসায় আসিয়া নির্জ্জনে ভাবিয়া দেখিলেন, যে তর্ক কালে এমন কোন কুতর্ক করেন নাই যাহাতে ঐরূপে ব্যবহৃত বা অবমানিত হইতে পারেন। তিনি মনে করিয়াছিলেন যে তাঁহার ন্যায়—বিষয়ক মত অবশ্যই মিথিলার দিগন্তব্যাপী কীর্ত্তিশালী দার্শনিকগণ কর্ত্তৃক অনুমোদিত হইবে, কিন্তু এক্ষণে তিনি নিরাশ হইলেন। ভাবিলেন নিজ মত লইয়া স্বদেশে ফিরিলেও কেহই তাঁহার মতে বিশ্বাস করিবে না। অতএব স্বদেশের ও নিজের নিমিত্ত যে গৌরব উপার্জ্জন করিবেন বলিয়া আশা করিয়াছিলেন, তাহাতে নিরাশ হইলেন। মিথিলায় তাঁহার মুখ দেখান ভার হইল। তাঁহাকে একেবারে নবদ্বীপও ত্যাগ করিতে হইল। অবশেষে এক আশ্চর্য্য ঘটনা দ্বারা তাঁহার উভয় কামনাই সিদ্ধ হয়।

রঘুনাথ পক্ষধরের এরূপ ব্যবহারে যার পর নাই দুঃখিত ও ক্রোধান্ধ হইয়াছিলেন। তিনি মনে মনে

প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, যেরূপে পারি পক্ষধরকে হয় আমার মত গ্রহণ করাইব, নতুবা তাঁহার প্রাণ সংহার করিব। তদনুসারে রাত্রিযোগে একখানি তরবারী হস্তে করিয়া, গুপ্তভাবে পক্ষধরের বাটীতে প্রবেশ করিলেন। এবং এ দিক ও দিক অনুসন্ধান করিয়া দেখিলেন যে, পক্ষধর সুস্ত্রীক ছাদের উপর উপবিষ্ট আছেন ও স্ত্রীর সহিত কথা বার্ত্তা কহিতেছেন। রঘুনাথ অন্তরালে দাঁড়াইয়া তাঁহাদিগের কথা বার্ত্তা শুনিতে লাগিলেন। এই দিন শরৎকালের অন্যতর পুর্ণিমা তিথি। রাত্রি প্রায় দ্বিপ্রহর, আকাশ পরিষ্কার ও নির্ম্মল, পৃথিবী নিস্তব্ধ। ঐ সময়ে পূর্ণ চন্দ্রের নির্ম্মল রশ্মিজালে চতুর্দ্দিক ধবলিত ও লোক মাত্রেরই অন্তকরণ পুলকিত হইয়াছিল। কিন্তু হায়! এই দুই দার্শনিকই অসুখী, একজন অকারণ অপমান-জনিত ভীষণ মনের ক্লেশে ক্লিষ্ট ও প্রতিবিধান জন্য হিতাহিত জ্ঞান শূন্য হইয়া খড়্গ হস্তে দণ্ডায়মান। দ্বিতীয়, নিজ মত রক্ষণে অসমর্থ হেতু বিষম অনুতাপে অনুতপ্ত। এই সময়ে পক্ষধরগেহিনী জ্যোৎস্নায় নির্ম্মলতায় প্রফুল্ল হইয়া কৌতূহলক্রমে স্বামীকে জিজ্ঞাসা করিলেন "নাথ! এই শরচ্চন্দ্র মরিচি অপেক্ষা নির্ম্মল বস্তু পৃথিবীতে আর কিছু আছে কি না? পক্ষধর তখন গাঢ় চিন্তায় মগ্ন ছিলেন, ব্রাহ্মণীর কথা কএকবার তাঁহার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল না। অবশেষে তিনি উত্তর করিলেন "নবদ্বীপ হইতে একটী নবীন নৈয়ায়িক আসিয়াছে, তাঁহার বুদ্ধি ইহা অপেক্ষা নির্ম্মল।" রঘুনাথ অন্তরালে দাঁড়াইয়া শ্রবণ মাত্র

তরবারী দূরে নিক্ষেপ করিয়া তাঁহার চরণে প্রণিপাত করিলেন। পক্ষধরও তাঁহাকে গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া স্বীয় মনের তৃপ্তি সাধন করিলেন। এবং পর দিন প্রাতঃকালেই এক মহতী সভা করিয়া সর্ব্ব সমক্ষে রঘুনাথের মত অভ্রান্ত বলিয়া পরাজয় স্বীকার করিলেন। পাঠকগণ! এখন দেখুন, অতি প্রাচীন কাল হইতে ভারতবর্ষীয়, মহামান্য যে সকল উপাধ্যায়গণ, তার্কিক-প্রধান বলিয়া খ্যাতিলাভ করিয়া আসিয়াছিলেন এবং যাঁহাদের সিদ্ধান্ত অভ্রান্ত ও অখণ্ডনীয় বলিয়া স্বীকৃত হইয়া আসিয়াছিল, আমাদের বঙ্গভূমির কল্পনাধিনাথ রঘুনাথের অসাধারণ তর্কবলে সে সকল সিদ্ধান্ত অপসিদ্ধান্ত হইয়া পড়িল। রঘুনাথশিরোমণি এখন যথার্থতই ভারতবর্ষের শিরোমণি হইয়া উঠিলেন।

পক্ষধর রঘুনাথের তর্কে বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার কাব্য ও ব্যাকরণ সম্বন্ধীয় শিক্ষার পরিচয় জিজ্ঞাসা করায়, রঘুনাথ উত্তর করিলেন——

তর্কেষু কর্কশ ধিয়ো বয়মেব নান্যে
কাব্যেষু কোমল ধিয়ো বয়মেবনান্যে। ইত্যাদি।

কিন্তু———

কবিত্বং কিয়দৌন্নত্যং চিন্তামণিমনীষিণঃ।
নিপীত কালকূটস্য হরস্যেবাহিখেলনং॥

তদনন্তর তৎক্ষণাৎ এই শ্লোক রচনা করিয়া পাঠ করিলেন——

সাহিত্যে সুকুমারবস্তুনি দৃঢ়ন্যায়-গ্রহ-গ্রন্থিলে
তর্কে বা ভৃশকর্কশে, মম সমংলীলায়তে ভারতী।

শয্যা বাস্প মৃদুত্তরচ্ছদবতী দর্ভাঙ্কুরৈরাবৃতা
ভূমি র্বা হৃদয়ঙ্গমো যদি পতিস্তুল্যারতির্যৌষিতাং॥

শ্লোকের অর্থ——

কি সুকুমার বস্তু সাহিত্য, কি প্রস্তর সদৃশ কঠিন অতি কর্কশ জটিল তর্কশাস্ত্র, এই পরস্পর বিরোধী উভয় শাস্ত্রে আমার বাক্য সমভাবে স্ফূর্ত্তি পায়। অথবা ইহা আর বিচিত্র কি? নারীগণ মনোনীত প্রিয়তমের সমাগমে সুকোমল আস্তরণবতী শয্যা বা কুশাঙ্কুর সমাকীর্ণ ভূমি, এ উভয় স্থানেই তুল্য রতি অনুভব করে।

পঠন্তি কতিচিদ্ধঠাৎ খ, ফ, ছ ঠে তি বাচং শঠাঃ
ঘটঃ পট ইতীতরে পটু রটন্তি নৈয়ায়িকাঃ।
বয়ং বকুল মঞ্জরী গলদপার মাধ্বীকধু
-ধূ্রীণপদরীতিভি র্যুবতিভি র্বিনোদামহে॥

শ্লোকের অর্থ——

কোন কোন শঠ পণ্ডিতগণ খ, ফ ছ ঠ ইত্যাদি বাক্য লইয়াই আড়ম্বর করিয়া থাকেন। আবার কোন কোন নৈয়ায়িক ঘট পট আবৃত্তি করিয়াই আপনাকে নৈয়ায়িকম্মন্য বলিয়া অভিমান করিয়া থাকেন। কিন্তু আমরা তদনুরূপ নহি; আমরা বকুল মঞ্জরি গলিত মধুবর্ষী পদ, ও রীতি স্বরূপ যে যুবতী, তদ্দ্বারা মনোরঞ্জন করিয়া থাকি।

রঘুনাথের উপরোক্ত দুই শ্লোকে তাঁহার কবিত্বের বিশেষ পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। যদি তিনি কবি বলিয়া পরিচিত হইবার বাসনা করিতেন, তাহা হইলে বঙ্গের একজন শ্রেষ্ঠ কবির আসন গ্রহণ করিতে পারিতেন

সন্দেহ নাই। পক্ষধর তাঁহার এই কবিতা শ্রবণ করিয়া রঘুনাথের ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

এইরূপে রঘুনাথ মিথিলার গর্ব্ব খর্ব্ব করিয়া সগৌরবে খৃষ্ট ষোড়ষ শতাব্দীর প্রথমেই স্বীয় জন্মভূমি নবদ্বীপে আগমন করিলেন। তদবধি মিথিলার গৌরবলক্ষ্মী অন্তর্হিত হইয়া, নবদ্বীপে আসিয়া বাস করিতে লাগিলেন।

রঘুনাথ নবদ্বীপে উপস্থিত হইয়াই সর্ব্ব প্রথমে গুরু বাসুদেবের নিকট সমুপস্থিত হইয়া ভক্তিসহকারে প্রণত হইলেন। বাসুদেব পূর্ব্বেই তাঁহার মিথিলা জয়ের কথা শুনিয়াছিলেন তথাপি জিজ্ঞাসা করিলেন——

অয়ি দিবসমনৈষীঃ পদ্মিনীসদ্মনি ত্বং
রজনিষু নিরতোঽভূঃ কৈরবিণ্যাং রমণ্যাং।
কথয় কথয় ভৃঙ্গ স্বচ্ছভাবেন তাবৎ
কিমধিকসুখমাপ্সীরত্রবা তত্রবেতি॥

অর্থ——

হে ভৃঙ্গ! তুমি দিবসে পদ্মিনীর নিকেতনে এবং রাত্রিতে কুমুদিনীরূপ রমণীতে আসক্ত ছিলে। এখন সরল ভাবে বল দেখি কোথায় অধিক সুখ লাভ করিয়াছ।

তদুত্তরে রঘুনাথ কহিলেন———

ত্বং পীযূষ দিবোপি ভূষণমসি দ্রাক্ষে পরীক্ষেত কো
মাধুর্য্যং তব বিশ্বতোপি বিদিতং সাধ্বীচ মাধ্বীকস্তা॥
কিন্ত্বেকস্তপরস্তরস্তদ মহো ক্রমো নচেৎ কুপ্যসে
যঃ কান্তাধরপল্লবে মধুরিমা নাম্যত্র কুত্রাপি সঃ॥

হে পীযষ! তুমি স্বর্গেরও ভূষণ। হে দ্রাক্ষে!

তোমায় কে পরীক্ষা করিতে পারে ? তোমার মাধুর্য্য সকল-জন বিদিত এবং অপরিচ্ছিন্ন। কিন্তু যদি আমার অরুন্তুদ বাক্যে ভবদীয় অন্তঃকরণ সন্তাপিত না হয়, তবে একান্ত সরলান্তঃকরণে বলিতে পারি যে, কান্তাধরপল্লবে যে মধুরিমা আছে, তাহা অন্যত্র কুত্রাপি নাই।

এই উত্তরে রঘুনাথ পক্ষধরের গৌরব প্রকাশ করায় বাসুদেব অতিশয় দুঃখিত হইয়া আক্ষেপ সহকারে বলিলেন। যথা——

যস্যা জন্মান্যবংশে, বসতিরপি সদাদূরদেশে পুরাসীৎ,
সৈষা ভূত্বা বধূটী প্রকটিতবিনয়া বেশ্মমধ্যে প্রবিশ্য।
আজন্মপ্রাণ তুল্যান্ গুরুজনজননী-সোদরানন্তরঙ্গান্,
দূরং কৃত্বা স্বগেহাৎ পতিমভিরমতে ধিক্ গৃহস্থাশ্রমস্থান্ ॥

অর্থ——

যিনি ভিন্ন বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া নিরন্তর দূরদেশে বাস করিতেন, তিনিই এখন নববধূ হইয়া বিনীত বেশে পতিগৃহে প্রবেশপূর্ব্বক আজন্ম প্রাণসম গুরুজন, জননী, সহোদর, এবং অন্তরঙ্গ মণ্ডলীকে গৃহ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া কেবল আপনিই পতির অনুরাগের অদ্বিতীয় আস্পদ হইতেছেন। হায়! এতাদৃশী পত্নীসম্পন্ন গৃহাশ্রমীকে ধিক্।

গুরুর সহিত আলাপের পর রঘুনাথ চতুষ্পাঠী করিতে বাসনা করিলেন। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে রঘুনাথ অতি দুঃখীর সন্তান ছিলেন। অর্থাভাবে চতুষ্পাঠী স্থাপন করিতে পারিলেন না। এই সময়ে নবদ্বীপ বা তৎসন্নিহিত কোন স্থানে রাজা বা জমীদারের বাস ছিল না। নবদ্বীপে হরি ঘোষ

নামে গোপজাতীয় এক জন ধনাঢ্য ব্যক্তি ছিল। বহুসংখ্যক গোধনই তাহার সম্পত্তি ছিল। ঐ সকল গাভীগণ থাকিবার জন্য তাহার বিস্তীর্ণ গোশালা ছিল। প্রায় সকল লোকের গাভীগণ ঐ হরি ঘোষের গোশালায় আশ্রয় লইত। এনিমিত্ত সচরাচর যে স্থানে অনেক লোক জমা হইয়া সর্ব্বদা আমোদ আহ্লাদ করে সেই স্থানকে হরি ঘোষের গোয়াল বলা প্রসিদ্ধি আছে। এই হরি ঘোষ রঘুনাথের বিদ্যা বুদ্ধির কথা জানিতে পারিয়া, দয়াপরবশ হইয়া স্বীয় অর্থ সাহায্যে তাঁহার চতুষ্পাঠী করিয়া দিলেন। রঘুনাথ চতুষ্পাঠী করিয়া অধ্যাপনায় প্রবৃত্ত হইলেন। পক্ষধরের পরাজয়ের পর হইতেই মিথিলাপ্রবাসী নানা দিগ্‌দেশীয় ছাত্রগণের দ্বারা তাঁহার খ্যাতি ও প্রতিপত্তি সমস্ত ভারতে ব্যাপ্ত হইয়াছিল। এক্ষণে তিনি টোল করিয়াছেন শুনিয়া নানা দেশীয় ছাত্রে তাঁহার চতুষ্পাঠী পরিপূর্ণ হইয়া গেল। এবং নবদ্বীপ প্রকৃত প্রস্তাবে সারস্বত মন্দির হইয়া উঠিল।

শিরোমণির প্রধান গ্রন্থের নাম চিন্তামণি দীধিতি। গঙ্গেশোপাধ্যায়কৃত 'চিন্তামণি' নামক গ্রন্থ অবলম্বনে ঐ দীধিতি রচিত হইয়াছে। যদিও দীধিতি চিন্তামণি অবলম্বনে লিখিত হইয়াছে। কিন্তু উহাতে ন্যায় সম্বন্ধীয় তর্ক সকল এত নিগূঢ় ও পরিস্কৃত রূপে বিচারিত হইয়াছে যে উহা এক খানি নূতন ন্যায়গ্রন্থরূপে অঙ্গীকৃত হইয়া 'নব্যন্যায়' নামে বিখ্যাত হইয়াছে। এতদ্‌ব্যতীত * তিনি বৈশেষিকশাস্ত্রীয় "পদার্থতত্ত্বনিরূপণ" নামক পুস্তক

অবলম্বনে 'পদার্থ খণ্ডন' নামে এক গ্রন্থ এবং "আত্মতত্ত্ব বিবেক" বা "বৌদ্ধাধিকারের" টীকা রচনা করেন। এবং সুবিখ্যাত মৈথিল-নৈয়ায়িক বৰ্দ্ধমান উপাধ্যায়, উদয়নাচার্য্য প্রণীত গুণকিরণাবলী ও বল্লভাচার্য্য প্রণীত ন্যায়-লীলাবতীর 'প্রকাশ' নামে যে টীকা করেন, রঘুনাথ উক্ত গ্রন্থ দ্বয়ের টীকা রচনা করিয়া গিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত শিরোমণির রচিত নঞর্থবাদ, প্রামাণ্যবাদ নানার্থবাদ, ক্ষণভঙ্গুরবাদ, আখ্যাতবাদ নামে কএক খানি গ্রন্থ পাওয়া গিয়াছে। ফলত এই সকল গ্রন্থে তিনি কি অলৌকিক প্রতিভা কি অচিন্তিত পূৰ্ব্ব তর্ক-শক্তি ও কি নিগূঢ় ন্যায়তত্ত্বেরই পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। তাঁহার জন্মগ্রহণে বঙ্গভূমি, কেবল বঙ্গভূমি কেন, সমস্ত ভারতভূমি অলঙ্কৃত হইয়াছে বলিলে কখনই অতিবর্ণন দোষে দূষিত হইতে হইবেনা। যত দিন সংসারে তর্কশাস্ত্রের আলোচনা থাকিবে, যত দিন লোকে অনুধ্যান ও ধীশক্তির সমাদর করিবে—তত দিন শিরোমণির নাম কখনই বিলুপ্ত হইবার নহে। ধন্য রঘুনাথ! তুমিই ধন্য! তুমি জন্ম পরিগ্রহ দ্বারা জন্মভূমির কতই গৌরবের বৃদ্ধি করিলে এবং বঙ্গজ গণের বুদ্ধিমত্তার কতদূরই না পরিচয় প্রদান করিলে?

দীধিতি গ্রন্থ প্রচারিত হইবার পর, নবদ্বীপ তর্কশাস্ত্রালোচনার প্রধান স্থান হইয়া উঠিল, এবং ন্যায় জিজ্ঞাসু ব্যক্তি বর্গের নবদ্বীপ ভিন্ন, আর কোন স্থানই তৃপ্তিপ্রদ রহিলনা। সেই অবধি নবদ্বীপ ভারতবর্ষের মধ্যে ন্যায় আলোচনার প্রধান স্থান হইয়া উঠিল। সেই অবধিই নবদ্বীপ চতু-

ষ্পাঠী হইতে উপাধি দানের ক্ষমতা স্থাপিত হইল এবং সেই অবধিই নবদ্বীপ সরস্বতীর বিশ্রাম বা পীঠস্থান বলিয়া উল্লিখিত হইল। এবং তদবধিই কাশী, মিথিলা, কাঞ্চি, দ্রাবিড়, মহারাষ্ট্র, তৈলঙ্গ ও পঞ্জাব প্রভৃতি নানা দিকের নানা স্থানের ছাত্রগণ এই সরস্বতীপীঠ—নবদ্বীপ ভূমি সমাগমন পূর্ব্বক ন্যায় শিক্ষা করিতে লাগিলেন, এবং নবদ্বীপের অধ্যাপকগণ যেন সর্ব্বজ্ঞানীর ন্যায় অবস্থিত হইয়া সিদ্ধান্তপক্ষ অবলম্বন করিলেন।

রঘুনাথ মহাতেজস্বী ও দৃঢ়ব্রত ছিলেন। এই গুণ ছিল বলিয়া তিনি ভারতে চিরকীর্ত্তি স্থাপনে ক্ষমবান হইয়াছিলেন। পক্ষধর তাঁহাকে পুনঃ পুন অবমানিত করিয়া চতুষ্পাঠী হইতে বিদায় করিয়া দেন; কিন্তু রঘুনাথ স্বীয় দৃঢ়-অধ্যবসায় গুণে ভীত না হইয়া পুনঃ পুন তাঁহার সহিত তর্কে প্রবৃত্ত হন ও অবশেষে তাঁহাকে পরাজিত করেন। তিনি আত্মতত্ত্ব বিবেক দীধিতিতে আপনাকে তার্কিক শিরোমণি বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন।

"নির্ণীয় সারং শাস্ত্রাণাং তার্কিকানাং শিরোমণিঃ।
আত্মতত্ত্ববিবেকস্য ভাবমুদ্রাবয়ত্যসৌ॥"

অন্য স্থানে

"বিদুষাং নিবহৈর্ঘ্যদৈক মত্যাদ্দিরটঙ্কি যদ্দুষ্টং যচ্চদুষ্টং।
ময়ি জল্পতি কল্পনাধিনাথে রঘুনাথে মনুতাং তদন্যথৈব॥"

শ্লোকের অর্থ-

প্রাচীন পণ্ডিতবর্গে একমত হইয়া যাহা দুষ্ট ও যাহা অদুষ্ট স্থির করিয়া গিয়াছেন, কল্পনাধিনাথ রঘুনাথ বলিতে

আরম্ভ করিলে সে সকল অন্যরূপ জানিবে। অর্থাৎ প্রাচীন পণ্ডিতেরা যাহা যাহা দুষ্ট স্থির করিয়া গিয়াছেন সে সকল অদুষ্ট এবং যাহা যাহা অদুষ্ট স্থির করিয়া গিয়াছেন যে সকল দুষ্ট রূপে উপপন্ন হইল। ফলত তিনি দীধিতি গ্রন্থে যেরূপ গর্ব্ব করিয়া গিয়াছেন কার্য্যেও সেইরূপ ক্ষমতা প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন।

ইউরোপীয় দার্শনিক ডাক্তার ব্যালেণ্টাইন বলিয়াছেন যে সুপ্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক সর্ উইলিয়ম হ্যামিণ্টন যেরূপ করিয়া ন্যায় ভাঙ্গিয়া গিয়াছেন, ভারতবর্ষীয় গৌতম, তদপেক্ষা অধিকতর সূক্ষ্মরূপে ন্যায়ের অবয়ব বিচার করিয়াছেন কিন্তু তিনি শিরোমণির গ্রন্থ পাঠ করেন নাই। শিরোমণির গ্রন্থ পাঠ করিলে বোধহয় আমাদের ন্যায়ের প্রশংসা করিয়া শেষ করিতে পারিতেন না।

রঘুনাথ ন্যায় শাস্ত্রীয় পূর্ব্বোক্ত গ্রন্থ ভিন্ন, স্মৃতিশাস্ত্রীয় "মলিম্লুচ (মলমাস) বিবেক" নামে এক খানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। ঐ গ্রন্থ পূর্ব্বস্থলি নবাসী অধ্যাপক শ্রীযুক্ত কৃষ্ণনাথ ন্যায় পঞ্চানন মহাশয়ের নিকটে আছে। ঐ গ্রন্থের শেষে, উহা রঘুনাথ শিরোমণির কৃত বলিয়া নির্দ্দেশ আছে। এবং রঘুনাথ, দীধিতি গ্রন্থের মঙ্গলাচরণে যে শ্লোক ব্যবহার করিয়াছেন ঐ গ্রন্থের প্রথমেও সেই শ্লোক দৃষ্ট হয়। যথা——

ওঁ নমঃ সর্ব্ব ভূতানি বিষ্টভ্য পরিতিষ্ঠতে।
অখণ্ডানন্দ বোধায় পূর্ণায় পরমাত্মনে।

রঘুনাথের ছাত্রগণের মধ্যে মথুরানাথ ও রামভদ্র

প্রধান। কেহ কেহ রামভদ্রকে রঘুনাথের পুত্র বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। আবার কেহ কেহ বলেন যে রঘুনাথ আদৌ বিবাহ করেন নাই তাঁহাকে বিবাহের কথা জিজ্ঞাসা করিলে তিনি কহিতেন পুত্র, কন্যার জন্যই বিবাহের প্রয়োজন, ব্যুৎপত্তিবাদ আমার পুত্র এবং লীলাবতী আমার কন্যা অতএব বিনা বিবাহেই আমার বিবাহে আশা ফলবতী হইয়াছে। আবার বিবাহে প্রয়োজন কি? যাহা হউক রঘুনাথ আজীবন শাস্ত্রালোচনাতেই কাটাইয়া খৃষ্টের ষোড়ষ শতাব্দীর মধ্য ভাগে কলেবর পরিত্যাগ করেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

অন্যান্য গ্রন্থকারগণ।

হরিদাস ন্যায়ালঙ্কার—হরিদাস বাসুদেবের ছাত্র সুতরাং খৃষ্টীয় ষোড়ষশতাব্দীর প্রথম ভাগে বর্ত্তমান ছিলেন।

হরিদাসের কোন জীবনী নাই। নবদ্বীপেও তাঁহার বংশধর কেহ থাকিলেও তাহা নিরাকরণ করিবার কোন

উপায় নাই। তিনিও স্বীয় গ্রন্থে নিজের কোনরূপ পরিচয় দেন নাই। তৎপ্রণীত পুস্তক কয়েকখানি না থাকিলে এত দিন সংসার হইতে তাঁহার নাম বিলুপ্ত হইত। হরিদাস অনেকগুলি টীকা করেন। তৎসমুদয় "হরিদাসী টীকা" বলিয়া প্রসিদ্ধ।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে বাসুদেব, উদয়নাচার্য্য প্রণীত কুসুমাঞ্জলির পদ্যাংশ কণ্ঠস্থ করিয়া আনয়ন করেন। রঘুনাথ, ঐ কুসুমাঞ্জলির কোন টীকা প্রণয়ন করেন নাই। হরিদাস ঐ কুসুমাঞ্জলি গ্রন্থের "কুসুমাঞ্জলিকারিকাব্যাখ্যা" নামে এক খানি টীকা রচনা করিয়া, স্বীয় পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। হরিদাস কুসুমাঞ্জলির কেবল পদ্যাংশেরই টীকা করিয়া ছিলেন। গদ্যভাগের টীকা করেন নাই। ইহাতে বোধ হয় তৎকালে নবদ্বীপে ঐ অংশ আইসে নাই। কুসুমাঞ্জলির যে কএক খানি টীকা আছে—তন্মধ্যে হরিদাসী টীকা অতিশয় প্রসিদ্ধ। সংস্কৃত কলেজের ভূতপূর্ব্ব প্রধানাধ্যক্ষ ডাক্তার কাউএল সাহেব, পণ্ডিত প্রবর শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন মহাশয়ের সাহায্যে, হরিদাসী টীকাসহ সমগ্র কুসুমাঞ্জলি ইংরেজীতে অনুবাদ করিয়া প্রচার করিয়াছেন।

হরিদাস, কুসুমাঞ্জলির টীকা ব্যতীত, পক্ষধরমিশ্রকৃত চিন্তামণির আলোকনামক পুস্তকের টীকা করিয়া বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। পুরীর শঙ্কর-মঠে হরিদাস ন্যায়ালঙ্কারকৃত অনুমানালোক, শব্দালোক এবং প্রত্যক্ষা-লোক, নামে তিনখানি হস্তলিখিত পুস্তক বিদ্যমান আছে।

ঐ সকল পুস্তক কন্দর্পরায় নামক কোন লেখক কর্ত্তৃক যথা ক্রমে ১৫২১, ১৫২২, ১৫২৩, শকাব্দে লিখিত হইয়াছে। প্রত্যক্ষমণ্যালোকের শেষে এই অস্পষ্ট শ্লোকটী লিখিত আছে——

শাকে ত্রিযুগ্ম বিশিখ ক্ষণদাধিনাথে

* * *

কন্দর্প রায় পদবীক ইদং লিলেখ।

রামভদ্র-সার্ব্বভৌম*——রামভদ্র ও মথুরানাথ উভয়েই রঘুনাথের ছাত্র। ইহাঁরা খৃষ্টীয় শাকের ষোড়ষ শতাব্দীর শেষভাগে বর্ত্তমান ছিলেন। কেহ কেহ রামভদ্রকে রঘুনাথের পুত্র বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, এবং তিনি স্বকৃত পদার্থখণ্ডনের টীকার প্রথম শ্লোকে যে আত্ম পরিচয় দিয়াছেন তাহাই প্রমাণস্বরূপ ব্যবহার করেন। ঐ শ্লোকটী এই——

"তাতস্যতর্ক-সরসীরুহ কাননেষু
চূড়ামণে র্দিনমণেশ্চরণে প্রণম্য
শ্রীরামভদ্রকৃতী কৃতিনাং হিতায়
লীলাবশাৎ কিমপি কৌতুক মাতনোতি।"

এই শ্লোকে তাঁহার পিতাকে যেরূপ বিশেষণে বিশিষ্ট

---

* রামভদ্র দুই জন। রামভদ্র সার্ব্বভৌম ও রামভদ্র সিদ্ধান্ত বাগীশ। দ্বিতীয় রামভদ্র সুপ্রসিদ্ধ জগদীশের পৌত্র। এই উভয় রামভদ্রের গ্রন্থ সাধারণত 'রামভদ্রী টীকা' বলিয়া প্রসিদ্ধ। সুতরাং উক্ত উভয়ের পুস্তক নির্ব্বাচন করা অতীব দুরূহ।

করা হইয়াছে, তাহাতে কেবল রঘুনাথকেই বুঝায়। কিন্তু ইহাতে তাঁহার পিতার উপাধি 'চূড়ামণি' ছিল জানা যাইতেছে। 'চূড়ামণি' ও 'শিরোমণি' একার্থ বোধক শব্দ হইলেও কেবল ছন্দ পতন ভয়ে 'শিরোমণিকে' 'চূড়ামণি' বলিয়া নির্দ্দেশ করা সঙ্গত নহে। বিশেষতঃ নৈয়ায়িক সমাজে 'শিরোমণি' শব্দটী যোগরূঢ়ীরূপে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। শিরোমণি বলিলে যেমন রঘুনাথকে বুঝায়, 'চূড়ামণি' বলিলে তাহা কখনই বুঝায় না। অতএব এই শ্লোকের দ্বারা কখন রামভদ্রকে শিরোমণির পুত্র বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে পারা যায় না।

রামভদ্র কুসুমাঞ্জলি গ্রন্থের যে টীকা প্রণয়ন করিয়াছেন তাহাতেও তিনি বলিয়াছেন——

"ভবানী ভবনাথাভ্যাং পিতৃভ্যাং প্রণমাম্যহং
যৎ প্রসাদাদিদংশাস্ত্রংকরক্ষীরোপমীকৃতং।
মকরন্দে, প্রকাশে, বা ব্যাখ্যা পরিমলেঽথবা।
ততোধিকং পিতুর্ব্যাখ্যা মাথ্যাতুময়মুদ্যমঃ॥"

ইহাতে অনেকে তাঁহার পিতার নাম ভবনাথ ও মাতার নাম ভবাণী নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। কিন্তু ইহা দুই অর্থেই লওয়া যাইতে পারে। এমন হইতেও পারে যে গ্রন্থকার স্বীয় ইষ্টদেব ভাবাণী ও ভবনাথকে প্রণাম করিয়া গ্রন্থ আরম্ভ করিতেছেন। যাহাহউক উক্ত উভয় শ্লোকের দ্বারাই তাঁহার পিতা যে এক জন প্রধান নৈয়ায়িক ছিলেন এবং তিনি যে কুসুমাঞ্জলির উৎকৃষ্ট ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন তাহাই বুঝায়।

রামভদ্র কুসুমাঞ্জলির তিনখানি ব্যাখ্যা-পুস্তকের নাম করিয়াছেন। বর্দ্ধমানউপাধ্যায় কৃত 'প্রকাশ' ও রুচিদত্তকৃত 'মকরন্দ' এবং অজ্ঞাতনামা কোন ব্যক্তিকৃত 'পরিমল'। তিনি হরিদাসী বা অন্য কোন টীকার উল্লেখ করেন নাই। ইহাতে বোধ হয় তৎকালে ঐ টীকা প্রচলিত না হওয়ায় তাহার নাম গৃহিত হয় নাই। হরিদাসী টীকা ঐ সময়ে প্রণীত হইয়াছিল সন্দেহ নাই। কারণ হরিদাস কুসুমাঞ্জলির কেবল শ্লোকেরই টীকা করিয়াছিলেন। গদ্যাংশ তৎকাল নবদ্বীপে প্রচলিত থাকিলে তাহার টীকা করিতেন সন্দেহ নাই। রামভদ্র সমগ্রকুসুমাঞ্জলির অর্থাৎ গদ্য ও পদ্য উভয় অংশেরই টীকা করিয়াছেন। রামভদ্রের সময়ে কুসুমাঞ্জলির সকল অংশই নবদ্বীপ আসিয়াছিল ও অধীত হইত। অতএব রামভদ্রের টীকা হরিদাসের পরবর্ত্তী কালের বলিতে হইবে।

রামভদ্র, শিরোমণিকৃত পদার্থখণ্ডন গ্রন্থের "পদার্থতত্ত্ব বিবেচন-প্রকাশ" ও উদয়নাচার্য্যের কুসুমাঞ্জলির "কুসুমাঞ্জলি কারিকাব্যাখ্যা" ও গুণকিরণাবলীর "গুণকিরণাবলীরহস্য," এবং অন্নভট্টের তর্কসংগ্রেহর "তর্কদীপিকা-প্রকাশ" এবং গঙ্গেশোপাধ্যায় প্রণীত চিন্তামণির "ভাষ্য" এবং সমাসবাদ ইত্যাদি কএকখানি গ্রন্থ লিখিয়া স্বীয় অসাধারণ পাণ্ডিত্যের ও বিদ্যাবত্তার পরিচয় দিয়া অবিনশ্বর কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। তৎকৃত কুসুমাঞ্জলির ও খণ্ডনের টীকাই অতিশয় প্রসিদ্ধ। এক্ষণে নবদ্বীপে রামভদ্রের বংশ নাই।

সমাসবাদ গ্রন্থে তিনি লিখিয়াছেন——

বিচার্য্য আর্য্যৈঃ সততং মুনীন্দ্রৈঃ
তর্কাটবী সঞ্চরণ প্রবিণৈঃ।
শ্রীসার্ব্বভৌম বহুবাদ বিজ্ঞৈঃ
কৃতঃ সমাসেন সমাসবাদঃ॥

মথুরানাথ-তর্কবাগীশ—মথুরানাথের পিতার নাম শ্রীরাম তর্কালঙ্কার। শ্রীরাম এক জন প্রধান নৈয়ায়িক ছিলেন। তিনি রঘুনাথের নিকট ন্যায় শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া নবদ্বীপেই চতুষ্পাঠী করিয়াছিলেন।

বাল্যকাল হইতেই মথুরানাথ, অতিশয় বুদ্ধিমান ও শান্ত স্বভাব ছিলেন। তিনি প্রথমে পাঠশালায় ব্যাকরণ ও কাব্যাদি পাঠ শেষ করিয়া পিতার নিকট ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু পিতার নিকট ন্যায় পড়িয়া তাঁহার তৃপ্তি সাধন হইল না। বিশেষত তৎকালে যিনি সর্ব্ববাদী সম্মতিমতে বিদ্যা-বুদ্ধি ও প্রতিভায় নৈয়ায়িক সমাজে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আসন গ্রহণ করিয়াছেন, সেই অসামান্য-ধীশক্তি-সম্পন্ন-রঘুনাথ-শিরোমণি জীবিত থাকিতে মথুরা-নাথের অন্যত্র ন্যায় অধ্যয়নে তৃপ্তি হইবার সম্ভাবনা কোথায়।

মথুরানাথ, পিতার নিকট কিছু দিন অধ্যয়ন করিয়া, রঘুনাথের টোলে প্রবিষ্ট হইলেন। এই সময়ে শিরোমণি বৃদ্ধ হইয়াছিলেন। তিনি মথুরানাথের যত্নাতিশয় দেখিয়া বিশেষ মনোযোগ সহকারে তাঁহাকে পড়াইতে লাগিলেন। মথুরানাথ, পরিশ্রম ও সুশীলতাগুণে অধ্যাপকের অনুগৃহীত ও সহপাঠীগণের প্রণয়-ভাজন হইয়াছিলেন। তিনি পঠদ্দ-

শাতেই দেখিলেন যে, দীধিতি গ্রন্থ যেরূপ জটীল, তাহাতে টীকা ব্যতীত তাহা হৃদয়ঙ্গম করা সুকঠিন। তজ্জন্য তিনি দীধিতির টীকা লিখিতে আরম্ভ করেন। এক দিন টোলের কোন ছাত্র দীধিতির ঐ টীকা কৌতূহল বশত তাঁহার পিতা শ্রীরামের হস্তে অর্পণ করেন। শ্রীরাম টীকা দেখিয়া সাতিশয় হর্ষলাভ করিলেন। এবং পুত্রকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন যে, বৎস্য! তোমার এই টীকা সুন্দর ও প্রাঞ্জল হইয়াছে। এবং তুমি যে টীকা লিখিতে সমর্থ হইবে, তাহাও আমার বিলক্ষণ আশা হইতেছে। অতএব দীধিতির টীকা না করিয়া মূল চিন্তামণি শাস্ত্রের টীকা করিতে সযত্ন হও; ঐ টীকা এরূপ ভাবে করিবে যে সকলেই যেন সহজে বিনা উপদেশে উক্ত চিন্তামণি শাস্ত্র হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হয়। কথিত আছে—মথুরানাথের পিতা শ্রীরাম যৎকালে রঘুনাথের নিকট অধ্যয়ন করিতেন; তৎকালে দীধিতি ভাল বুঝিতে পারিতেন না। তজ্জন্য তিনি এক দিন রঘুনাথের নিকট তিরস্কৃত হন। এবং তজ্জন্যই পুত্রকে এরূপ টীকা করিতে উপদেশ দেন। যাহাহউক মথুরানাথ এই অবধি দীধিতির টীকা করিতে ক্ষান্ত হইয়া পিতৃ নিদেশানুসারে মূল চিন্তামণি শাস্ত্রের টীকা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

এই ঘটনার কিছু দিন পরেই মথুরানাথের পিতা কালগ্রাসে পতিত হন। এই সময়ে মথুরানাথের পাঠ সমাপন হইয়াছিল। পিতৃবিয়োগে মথুরানাথ পিতৃ চতুষ্পাঠীতেই অধ্যাপনায় প্রবৃত্ত হইলেন। ন্যায় শাস্ত্রে

তাঁহার বিশেষ জ্ঞান জন্মিয়াছিল। তিনি অতি যত্ন সহকারে ছাত্রদিগকে শিক্ষা দিতে লাগিলেন। তাঁহার সুশিক্ষার গুণে তাঁহার টোলে অনেক ছাত্র সমাগত হইল। তিনি অধ্যাপনায় প্রবৃত্ত হইলেন বটে, কিন্তু কোন প্রকারে পিতৃ আদেশ বিস্মৃত হইলেন না। তিনি অধ্যাপনার সঙ্গে সঙ্গে চিন্তামণি গ্রন্থের টীকা লিখিতে আরম্ভ করিলেন। শিরোমণি যে সকল গ্রন্থের ভাষ্য ও বিবৃতি রচনা করিয়া, স্বীয় অসাধারণ-তর্ক-শক্তির পরিচয় দিয়া গিয়াছেন, মথুরানাথ তৎসমুদয় গ্রন্থের টীকা করিয়া শিরোমণির প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে দাঁড়াইতে চেষ্টা পাইলেন। শিরোমণি গঙ্গেশোপাধ্যায়কৃত প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান, ও শব্দ এই চারি খণ্ড চিন্তামণির শাস্ত্রের কেবল মাত্র প্রত্যক্ষের এবং অনুমান খণ্ডের দীধিতি প্রণয়ন করিয়াছিলেন।

মথুরানাথ গঙ্গেশোপাধ্যায়প্রণীত প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান ও শব্দ এই চারি খণ্ড চিন্তামণির টীকা এবং পক্ষধর মিশ্রের মন্যালোক, এবং বর্দ্ধমান-উপাধ্যায়ের গুণ-কিরণাবলী এবং বল্লভাচার্য্যের ন্যায়লীলাবলীপ্রকাশের "ভাষ্য" রচনা করিয়া স্বকীয় বিদ্যানত্তার ও পাণ্ডিত্যের এবং অধ্যবসায়ের চূড়ান্ত নিদর্শন রাখিয়া গিয়াছেন। কিন্তু মথুরানাথ, রঘুনাথের অপেক্ষা বিদ্যাবুদ্ধিতে সর্ব্বাংশেই ন্যূন ছিলেন। সুতরাং মথুরানাথের টীকা, রঘুনাথের টীকা অপেক্ষা সর্ব্বাংশেই নিকৃষ্ট হইয়াছে সন্দেহ নাই।

মথুরানাথের টীকা অতিশয় প্রাঞ্জল। গুরূপদেশ

ব্যতীত কেবল মাত্র এই টীকা পড়িয়াই সকলেই শাস্ত্রার্থ অবগত হইতে পারে ইহাই তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল। কিয়দংশে তাঁহার সে উদ্দেশ্য সফল হইয়াছিল। কথিত আছে—মথুরানাথের পুত্রের পাঠ শেষ না হইতেই, মথুরানাথের মৃত্যু হয়। মথুরানাথের পুত্র অন্যের নিকট পাঠ স্বীকার করিতে অনিচ্ছুক হন। তখন তাঁহার মাতা কহিলেন—'আমি তোমার পিতার মুখে শুনিয়াছি যে তিনি যে সকল পুঁথি করিয়াছেন তাহা পড়িলে অন্য কাহার নিকট আর পড়িতে হয় না। সেই সকল পুঁথি পড়িয়াই পণ্ডিত হওয়া যায়।' মাতার মুখে এই কথা শুনিয়া তিনি পিতৃকৃত টীকাই অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন। এবং অন্যের বিনা সাহায্যে ঐ টীকা উত্তম বুঝিতে পারিয়াছিলেন।

মথুরানাথের টীকা নৈয়ায়িকসমাজে 'মাথুরী' বলিয়া প্রসিদ্ধ। ঐ সকল টীকার সাধারণ নাম 'রহস্য'। তিনি শব্দপ্রামাণ্যরহস্যের আরম্ভে এইরূপ আত্মপরিচয় দিয়াগিয়াছেন। যথা—

"ন্যায়াম্বুধিকৃতসেতুং হেতুং শ্রীরামমখিল সম্পত্তেঃ
তাতং ত্রিভুবনগীতং তর্কালঙ্কারমাদরান্নত্বা।
শ্রীমতা মথুরানাথ তর্কবাগীশ ধীমতা
বিশদীকৃত্য দর্শ্যন্তে তুরীয় মণিফক্কিকা॥"

তিনি অনুমিতি রহস্যের প্রারম্ভেও লিখিয়াছেন—

জগদ্‌গুরোঃ শ্রীরামস্য চরণৌ মূর্দ্ধি ধারয়ন্।
তৎসুতো মথুরানাথ রহস্যং স্ফুটয়ত্যমুং॥

মথুরানাথ কোন স্থানে শিরোমণির ছাত্র বলিয়া পরিচয় দেন

নাই। কিন্তু তিনি শিরোমণির পাঠ বা মত 'ভট্টাচার্য্যাস্তু' বলিয়া উদ্ধৃত করায় তাঁহাকে শিরোমণির ছাত্র বলিয়া জানা যায়।

নবদ্বীপে মথুরানাথের বংশবালী নাই। তাঁহার প্রধান ছাত্রের নাম ভবানন্দ-সিদ্ধান্তবাগীশ।

ভবানন্দ সিদ্ধান্তবাগীশ—ভবানন্দ খৃষ্ট ষোড়ষ শতাব্দীর শেষে বর্ত্তমান ছিলেন। তাঁহার পিতার নাম জানিবার উপায় নাই। তিনি রাঢ়ী শ্রেণীয় ব্রাহ্মণ ছিলেন। অদ্যাপি নবদ্বীপে তাঁহার বংশধরেরা বর্ত্তমান আছেন। ভবানন্দ হইতে এখনও কোন শাখার ৮পুরুষ, ও কোন শাখার ৯।১০ পুরুষ পাওয়া যায়। পক্ষান্তরে ভবানন্দ, মথুরানাথ তর্কবাগীশের ছাত্র ছিলেন। এই সকল বিবেচনা করিলে, আমরা ভবানন্দকে খৃষ্টীয় ষোড়ষ শতাব্দীর শেষে ও সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমে দেখিতে পাই।

ভবানন্দ যে সমস্ত টীকা করিয়া গিয়াছেন তৎসমুদয় "ভবানন্দী" টীকা বলিয়া প্রসিদ্ধ। তৎপ্রণীত পক্ষধরমিশ্রকৃত মন্থালোকের "সারমঞ্জরী" নামক টীকা এবং "কারকচক্র" প্রধান। কারক চক্রে তাঁহার অসাধারণ তর্কশক্তি ও প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। এতদব্যতীত 'লটার্থবাদ,' 'কারণতা-বাদ-বিচার' "শব্দার্থসার-মঞ্জরি" এবং রঘুনাথ শিরোমণির দীধিতির ভাষ্য ও "মণিদীধিতি গূঢ়ার্থ প্রকাশিকা" প্রভৃতি বহুতর গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন। ঐ সকল টীকা ন্যায় সংসারে অতি আদরের সহিত পঠিত হইয়া থাকে। তিনি মণিদীধিতির টীকায় লিখিয়াছেন—

নমস্কৃত্য গুরূন্ সর্ব্বান্ নিগূঢ় মণিদীধিতৌ।
শ্রীভবানন্দ সিদ্ধান্তবাগীশেন প্রকাশিতা॥

ভবানন্দের দুইপুত্র মধুসূদন ও রুদ্রদেব বা রুদ্ররাম*। রুদ্ররামওপিতার উপযুক্ত পুত্র ছিলেন। তিনি 'বৈশেষিক-শাস্ত্রীয়পদার্থনিরূপণ" এবং মীমাংসা শাস্ত্রীয় 'অধিকরণ-চন্দ্রিকা' এবং 'কারকব্যুহ' ও 'বাদপরিচ্ছেদ' এবং 'চিত্ররূপ' প্রভৃতি অনেকানেক গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া স্বীয় বিদ্যাবত্তা প্রকাশ ও পিতৃগৌরব রক্ষা করিয়া গিয়াছেন।

হরিরাম-তর্কবাগীশ—ভবানন্দ সিদ্ধান্তবাগীশের পরেই আমরা হরিরাম তর্কবাগীশের উল্লেখ করিতে পারি। হরিরাম খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমে বর্ত্তমান ছিলেন। কথিত আছে তিনি তৎকালে ন্যায়ের সর্ব্ব প্রধান পণ্ডিত ছিলেন, এবং প্রধান বিদায় পাইতেন। তাঁহার পূর্ব্ব ৫।৬ পুরুষ ঐ রূপ প্রধান বিদায় পাইয়া আসিয়াছিলেন। এই প্রবাদ সত্য হইলে, আমরা হরিরামকে রঘুনাথের বংশধর বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে পারি।

---

* রুদ্রনামধারী দুইজন গ্রন্থকার ছিলেন। প্রথম রুদ্ররাম ভবানন্দের পুত্র। দ্বিতীয় রুদ্রনাথ, 'বিদ্যানিবাস' নামক কোন অধ্যাপকের পুত্র। এই উভয় রুদ্রই গ্রন্থকার এবং ইঁহাদের টীকা সকল সাধারণত "রৌদ্রী" বলিয়া বিখ্যাত। সুতরাংইহাদের পরস্পরের পুস্তক নির্ব্বাচন করা সুকঠিন। যতদূর সম্ভব এই উভয়ের পুস্তক নির্ব্বাচন করা গেল।

হরিরামের বহুতর গ্রন্থ বিদ্যমান আছে। তিনি গঙ্গেশোপাধ্যায়কৃত, অনুমিতিচিন্তামণি অবলম্বনে "অনুমিতি বিচার," শিবাদিত্যকৃত বৈশেষিকশাস্ত্রীয় 'সপ্তপদার্থ নিরূপণ' নামক গ্রন্থের 'ব্যাখ্যা' এবং 'রত্নকোষ' নামে অপর এক খানি গ্রন্থের 'ব্যখ্যা' ও উদয়নাচার্য্য রচিত প্রাচীন ন্যায়ানুযায়ী 'আচার্য্য মত রহস্য' ওনব্য ন্যায়ানুযায়ী 'নব্যমত রহস্য' নামে অনুমিতি বিষয়ক গ্রন্থ, ইত্যাদি ন্যায়শাস্ত্রীয় অনেকানেক গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। এতদব্যতীত 'মঙ্গলবাদ' 'প্রমাণপ্রমোদ' 'বিষয়তাবাদ' 'নবীনমতবিচার' 'অনুমিতি পরামর্শবাধবুদ্ধি" "প্রতিবন্ধকতাবিচার," 'বিশিষ্টবৈশিষ্ট্যবোধবিচার' 'নব্যধর্ম্মিতাবচ্ছেদকতা' ও "প্রত্যাসত্তিবিচার" নামে অনেকগুলি ন্যায় শাস্ত্রীয় পুস্তক রচনা করিয়া গিয়াছেন।

হরিরাম দীর্ঘজীবী ছিলেন। মৃত্যু সময়ে তাঁহার পুত্রগণের মধ্যে কেহই উপযুক্ত ছিলেন না। তজ্জন্য তিনি ঐ সময়ের প্রধান ছাত্র গদাধরভট্টাচার্য্যকে স্বীয় টোলের ছাত্রদিগকে অধ্যাপনা জন্য মনোনীত করিয়া যান। কিন্তু কেহই তাঁহার নিকট অধ্যয়ন করেন নাই। তদবিবরণ পরে লিখিত হইতেছে। হরিরামের মৃত্যুর পর জগদীশ প্রধান হইয়া উঠেন।

ভারতভূমির নানা প্রদেশের ছাত্রগণ এই সকল অধ্যাপকগণের নিকট অধ্যয়ন করিয়া ও তাহাদিগের গ্রন্থাদি লিখিয়া লইয়া স্বীয় স্বীয় দেশে চতুষ্পাঠী স্থাপনপূর্ব্বক অধ্যাপনা করিতে লাগিলেন। অল্পকাল মধ্যেই ভারতের নানা প্রদেশে ন্যায় দর্শনের আলোচনা ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল।

জগদীশ তর্কালঙ্কার।

জগদীশ সুপ্রসিদ্ধ মহাত্মা চৈতন্যদেবের শ্বশুর সনাতন মিশ্রের অধঃস্তন চতুর্থ পুরুষ। এই হিসাবে আমরা ইহাকে চৈতন্যের প্রায় ৭৫ বৎসরের পরবর্ত্তী কালের লোক বলিতে পারি। অদ্যাপি নবদ্বীপে জগদীশের বংশধরেরা বর্ত্তমান আছেন। পুরুষ গণনায় জগদীশ হইতে এক্ষণে ১০ বা ১১ পুরুষ পাওয়া যায়। তাহা হইলে আমরা জগদীশকে প্রায় ৩০০ বৎসরের পূর্ব্ববর্ত্তীকালে দেখিতে পাই। খৃষ্ট ষোড়ষশতাব্দীর প্রথমাংশে, চৈতন্যের অন্তর্ধান হয়। তাহা হইলে আমরা জগদীশকে খৃষ্ট ষোড়ষশতাব্দীর শেষে বা সপ্তদশের প্রথম ভাগে দেখিতে পাই।

জগদীশ, সুপ্রসিদ্ধ আলঙ্কারিক মম্মটভট্টপ্রণীত 'কাব্য প্রকাশ' নামকপুস্তকের 'কাব্যপ্রকাশরহস্যপ্রকাশ' নামে এক খানি টীকা করেন। নবদ্বীপের পণ্ডিত ৺ হরিনাথ তর্কসিদ্ধান্তের নিকট জগদীশপ্রণীত ঐ "কাব্য-প্রকাশ-রহস্য-প্রকাশের" একখানি হস্ত লিখিত পুস্তক ছিল। ঐ পুস্তক, ন্যায়লঙ্কার উপাধিক তাঁহার কোন ছাত্র ১৫৭৯ শাকে (১৬৫৭ খৃষ্টীয় অব্দে) লিখিয়া শেষ করেন।

শাকে রন্ধ্রাদ্রিবাণ, ক্ষিতি পরিগণিতে মাঘ মাসে নবম্যাং
পক্ষেচৈবাব লক্ষে, গ্রহপতি দিবসে জীবযুগ্‌ যুগ্মলগ্নে॥
ন্যায়ালঙ্কার ধীরো নিজগুরু রচিতম পুস্তমেতৎ সমস্তং।
শ্রীমং শ্রীরাঙ্গনস্থো ব্যলিখদ নদলসোহধ্যাপনার্থং সুখেন॥

এই শ্লোকের দ্বারা ও জগদীশ ঐ সময়ে বর্ত্তমান ছিলেন প্রতিপন্ন হইতেছে।

জগদীশের পিতার নাম যাদবচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ। তিনি এক জন নৈয়ায়িক পণ্ডিত ছিলেন। যাদবের পূর্ব্ব পুরুষগণ সকলেই তাঁহাদের মৈথিল উপাধি 'মিশ্র' নামে খ্যাত ছিলেন। এই যাদব হইতেই এই বংশের 'মিশ্র' নাম লুপ্ত হয়।

যাদবের পাঁচ পুত্র, তন্মধ্যে জগদীশ তৃতীয়। যখন জগদীশের বয়স ৫।৭ বৎসর তখন তাঁহার পিতৃবিয়োগ হয়। সুতরাং জগদীশের রক্ষণাবেক্ষণ ভার, তাঁহার জ্যেষ্ঠ সহোদর ষষ্ঠীদাসের উপর বর্ত্তে। যাদবের অবস্থা ভাল ছিল না। সুতরাং পিতৃবিয়োগে ষষ্ঠীদাস বড়ই দুঃখে পড়িলেন। তিনি চৈতন্যের সেবার দ্বারা যাহা কিছু পাইতেন তাহাতেই কথঞ্চিৎ সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন।

জগদীশ, বাল্যকালে অত্যন্ত দুষ্ট ছিলেন। পিতৃবিয়োগে আরও অবাধ্য হইয়া উঠিলেন। তজ্জন্য ষষ্ঠীদাস জগদীশকে মধ্যে মধ্যে তিরস্কার করিতেন। জগদীশ তিরস্কৃত হইয়া আরও অনাবিষ্ট হইয়া উঠেন, ও পথে পথে ভ্রমণ করিয়া নানাপ্রকার অসদাচরণ করিতে থাকেন। এইরূপে অষ্টাদশ বৎসরকাল অতিবাহিত হয়। অবশেষে এমন একটী ঘটনা ঘটিল যে তদবধি তিনি সমস্ত অসদ্বৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া সৎপথের পথিক হইলেন।

এক দিন তিনি পক্ষীশাবক পাড়িবার মানসে এক প্রকাণ্ড তাল বৃক্ষে উঠেন। দৈববশতঃ একটী বিষধর সর্প কুলায়স্থ শাবকগণকে গ্রাস করিয়া তথায় অবস্থিতি করিতেছিল। জগদীশ যেমন শাবক গ্রহণার্থ হস্ত প্রসারণ

করিয়াছেন, সর্প অমনি বিষম ফণা বিস্তার করিয়া তাঁহাকে দংশনোদ্যত হইলে, প্রত্যুৎপন্নমতি জগদীশ, কোন উপায় না দেখিয়া অমনি দৃঢ় মুষ্টিতে সর্পের মুখ চাপিয়া ধরিলেন। ধরিবা মাত্রেই সর্প পুচ্ছ দিয়া তাঁহার হস্ত খানি জড়াইয়া ধরিল। কিন্তু জগদীশ তাহাতে ভীত না হইয়া তালবৃক্ষের ধারাল প্রান্তে ঘর্ষণ করত, সর্পের গলদেশ কর্ত্তন করিয়া মুখ ভাগ দূরে নিক্ষেপ করিলেন। গলা কাটিয়া নিক্ষেপ করিলেন বটে কিন্তু সর্প পূর্ব্ববৎ পুচ্ছ দিয়া জড়াইয়া রহিল। তখন ক্রমে ক্রমে সর্পের সকল অংশ কাটিয়া ফেলিয়া বৃক্ষ হইতে অবতরণ করিলেন।

নিকটে এক জন সন্ন্যাসী ছিলেন। তিনি জগদীশের এই অসাধারণ সাহস ও তীক্ষ্ণধীর পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে নিকটে আহ্বান করিয়া ও নানাপ্রকারে বুঝাইতে লাগিলেন। এই ঘটনাতেই জগদীশ মনে করিয়াছিলেন যে, এ যাত্রা রক্ষা পাইলে এমন কার্য্য আর কখন করিবেন না। এক্ষণে সন্ন্যাসীর কথায় সম্মত হইয়া তাঁহার নিকট অধ্যয়নে কৃতসংকল্প হইলেন।

যখন তিনি অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হন, তখন তাঁহার বয়স অষ্টাদশ বৎসর। এখনও তাঁহার বর্ণপরিচয় হয় নাই বলিলেই হয়। সুতরাং তিনি প্রগাঢ় পরিশ্রমসহকারে দিবা রাত্রি অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন। এমন কি রাত্রিতে নিদ্রা যাইতেন না। পাছে নিদ্রা আসে তজ্জন্য মস্তকের শিখার সহিত চালের পাতায় রজ্জু দ্বারা বন্ধন করিয়া রাখিতেন। কখন শ্রমাধিক্য হেতু নিদ্রাকর্ষণ হইলে যেমন ঢুলিয়া পড়িতেন

অমনি মস্তকের শিথায় টান পড়িত নিদ্রাও ভাঙ্গিয়া যাইত। এইরূপে দিবা রাত্রি পরিশ্রম করিয়া তিনি অতি ত্বরায় ব্যাকরণ ও কাব্যাদি পাঠ শেষ করিলেন।

পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে জগদীশের পিতা যাদব, অতিশয় দুঃখী ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর জগদীশ আরও দুঃখে পড়িলেন। তাঁহার দুঃখের কথা কি বলিব রাত্রিতে তৈল অভাবে তাঁহার পাঠ হইত না। তজ্জন্য তিনি বংশ পত্র কুড়াইয়া তাহাই প্রজ্জ্বালিত করিয়া তাহারই আলোকে রাত্রিতে পাঠ করিতেন। কোন দিন তৈল পাইলে সে তৈল পাঠের নিমিত্ত রাখিয়া দিয়া বংশ পাতার আলোকে আহার করিতেন। এইরূপ দুঃখে পড়িয়াও তিনি লিখন পঠন পরিত্যাগ করেন নাই। বরঞ্চ অবিচলিত অধ্যবসায় প্রভাবে নানা প্রতিবন্ধক অতিক্রম করিয়া অসাধারণ বিদ্যোপার্জ্জন দ্বারা মনুষ্য সমাজের অগ্রগণ্য হইয়া গিয়াছেন।

জগদীশ এইরূপে গাঢ়তর অনুরাগ ও অভিনিবেশ সহকারে অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন। এবং কাব্যাদি পাঠ শেষ করিয়া তিনি সুপ্রসিদ্ধ অধ্যাপক ভবানন্দ সিদ্ধান্তবাগীশের চতুষ্পাঠীতে ন্যায় শিক্ষার্থ প্রবিষ্ট হইলেন। সিদ্ধান্ত বাগীশের টোলে অনেক ছাত্র ছিল। তিনি সকল ছাত্রকে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে পড়াইতে পারিতেন না। উচ্চ শ্রেণীর ছাত্রেরা নিম্নশ্রেণীর ছাত্রদিগকে শিক্ষা দিতেন। সুতরাং জগদীশ, টোলে প্রবিষ্ট হইলেও সিদ্ধান্তবাগীশ তাহাকে চিনিতেন না। অবশেষে জগদীশের তর্কশক্তি তাঁহাকে চিনাইয়া দিল।

এক দিন সিদ্ধান্তবাগীশ বাটীর ভিতর সন্ধ্যাহ্নিক করিতে ছিলেন। সেই সময়ে টোলের কোন ছাত্রের সহিত জগদীশের তর্কারম্ভ হয়। জগদীশ পূর্ব্ব পক্ষ করিতে ছিলেন। ঐ ছাত্র তাহার প্রশ্নের যে উত্তর দিতে ছিলেন, কিন্তু তাহা সমধিক ঠিক হইতেছিল না। সিদ্ধান্তবাগীশ বাটীর ভিতর বসিয়া উহাদিগের তর্ক বিতর্ক শুনিতে ছিলেন। তিনি জগদীশের পূর্ব্ব পক্ষ শুনিয়া মনে মনে তাহার ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিলেন। কিন্তু জগদীশকে চিনিতে না পারিয়া ব্রাহ্মণীকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে পূর্ব্বপক্ষ করিতেছে ঐ ছাত্রটী কে? ব্রাহ্মণী কহিলেন উটী বৈদিকদের ছেলে। তখন ভবানন্দ কহিলেন, কে, জগা? বলিয়া বিশেষ সন্তোষ প্রকাশ করিলেন। ০ এবং তদবধি তিনি জগদীশকে অতি যত্নসহকারে পড়াইতে লাগিলেন। অল্পকাল পরেই জগদীশ ভবানন্দের টোলে প্রধান হইয়া উঠিলেন।

জগদীশ ভবানন্দের টোলে পাঠ শেষ করিয়া সিদ্ধান্ত বাগীশ কর্ত্তৃক তর্কালঙ্কার উপাধি পাইলেন। ও নবদ্বীপেই টোল করিয়া অধ্যপনা করিতে বাসনা করিলেন। কিন্তু অর্থাভাবে কিছু দিন তাহার সে বাসনা পূর্ণ হয় নাই। পরে গ্রামস্থ লোকের সাহায্য লইয়া তাঁহার চতুষ্পাঠী স্থাপিত হয়।

জগদীশের পঠদ্দশাতেই অনেকে তাঁহার বিদ্যাবুদ্ধির পক্ষপাতী হইয়াছিল। এক্ষণে তিনি চতুষ্পাঠী করায় অনেকেই তাঁহার টোলে প্রবিষ্ট হইতে লাগিল। দিন দিন তাঁহার টোলে ছাত্র বৃদ্ধি হইতে লাগিল। এই সময়ে

বঙ্গভূমির নানা স্থানে বিশেষত পূর্ব্ব বঙ্গে অনেক ন্যায়ের চতুষ্পাঠী স্থাপিত হইয়াছিল। সেই সেই প্রদেশের ছাত্রগণ তথায় ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া নবদ্বীপে আসিয়া পাঠ সমাপন করিয়া উপাধি লইতেন। ঐ সকল ছাত্রগণের মধ্যে পূর্ব্ব দেশীয় ছাত্রেরা ভ্রান্তিমূলক ব্যাখ্যা শিক্ষিত হইয়া আসিতেন। বিশেষত দীধিতি গ্রন্থ সকলে হৃদয়ঙ্গম করিতেও সমর্থ হইতেন না। জগদীশ এই সকল কারণে দীধিতি গ্রন্থের টীকা করিতে কৃতসংকল্প হইলেন। তিনি অনুমান দীধিতির টিপ্পনীতে লিখিয়াছেন—

প্রাচ্যৈরনূচিত বিবিধক্ষোদৈঃ কলুষীকৃতোঽপি অধুনা।
দীধিতি যুতমণিরেষ শ্রীজগদীশ প্রকাশিতুঃ স্ফুরতু॥

তিনি টীকা লিখিতে কৃতসংকল্প হইলেন বটে কিন্তু তাঁহার সংসার যাত্রা নির্ব্বাহের উপায় ছিল না। নিশ্চিন্ত ভাবে চিন্তা করিতে না পারিলে টীকা লেখা সম্পন্ন হয় না। অবশেষে এমন উপায় নির্দ্ধারণ করিলেন যে, তাঁহার সংসার যাত্রা উত্তমরূপে নির্ব্বাহ হইতে লাগিল। তিনি শূদ্র শিষ্য করিতে বাসনা করিলেন। জগদীশের ন্যায় মহামহোপাধ্যায়কে গুরুরূপে বরণ করিতে কাহার অনিচ্ছা হয়? অল্প দিন মধ্যেই তাঁহার রাশি রাশি শিষ্য হইল। এইরূপে ৩৬০ ঘর শিষ্য করিলেন। শিষ্যদিগের প্রতি নিয়ম হইল যে, তাহাদের মধ্যে প্রত্যেকে বৎসর মধ্যে এক এক দিন তাঁহার সংসার যাত্রা চালাইয়ে দিবে। তৎকালে দ্রব্য সামগ্রী অতিশয় সুলভ ছিল। সুতরাং শিষ্যেরাও আহ্লাদ সহকারে তাহা স্বীকার করিলেন।

জগদীশ এইরূপে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহের উপায় করিয়া নিশ্চিন্ত মনে পুস্তক লিখিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি ক্রমে রঘুনাথ শিরোমণিকৃত—অনুমানদীধিতি, তর্ক, সামান্যভাব, ব্যাপ্ত্যনুগম, সিংহব্যাঘ্র, পক্ষতা, উপাধিবাদ, টীপ্পনী এবং ব্যাপ্ত্যনুমানদীধিতির, অনুমিতি, ব্যাপ্তিপঞ্চক, সিংহব্যাঘ্রী, পূর্ব্বপক্ষ, সিদ্ধান্তলক্ষণ, ব্যাধিকরণ ধর্ম্মাবচ্ছিন্নাভাব, অবচ্ছেদক নিরুক্তি, বিশেষ নিরুক্তি বা ব্যাপ্তি, ব্যাপ্তি-গ্রহোপায়, অতএব চতুষ্টয়ী, তর্ক, সামান্য লক্ষণা, সামা-ন্যাভাব, পক্ষতা, পরামর্শ, কেবলান্বয়ী, কেবল ব্যতিরেকী, অন্বয়ব্যতিরেকী, বাধ, অসিদ্ধি, সৎপ্রতিপক্ষ, ব্যাপ্ত্যনুগম, অনুপসংহারী, অবয়ব, হেত্বাভাস, সাধারণ, সব্যভিচারী, প্রভৃতিদীধিতি প্রকাশিকা টীপ্পনী এবং গঙ্গেশোপাধ্যায়কৃত 'অনুমান ময়ূখ' গ্রন্থরে 'ভাষ্য'. ও প্রশস্তবাদ আচার্য্যেরকৃত বৈশেষিকশাস্ত্রীয় দ্রব্যভাষ্যের টীপ্পনী এবং শিরোমণি প্রণীত ন্যায়লীলাবতী প্রকাশ দীধিতি গ্রন্থের 'টীকা' রচনা করিয়া কি অদ্ভুত বিচার শক্তি ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়া অধ্যসায়ের চূড়ান্ত নিদর্শন রাখিয়া গিয়াছেন। তিনি লীলাবতীদীধিতি টীপ্পনীতে লিখিয়াছেন—

কণভক্ষ মুনেঃ পক্ষরক্ষা বিন্যস্ত বাসনা।
বচাংসি জগদীশস্য চিন্তয়ন্তুবিচক্ষণাঃ॥

জগদীশ কেবল টীকা লিখিয়াই স্বীয় বিদ্যাবুদ্ধির পরিচয় দেন নাই। তিনি 'শব্দশক্তিপ্রকাশিকা' ও 'তর্কামৃত নামে দুই খানি গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া স্বীয় মৌলিকতা ও বিচারশক্তির যথেষ্ট পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। 'শব্দক্তশি প্রকাশিকাই'

জগদীশের সার গ্রন্থ। জগদীশ, যদি আর কোন পুস্তক না করিতেন তাহা হইলে এক শব্দশক্তি প্রকাশ করাতেই তিনি নৈয়ায়িক শ্রেষ্ঠ বলিয়া গণনীয় হইতেন সন্দেহ নাই। তদীয় গ্রন্থ সকল 'জগদীশী' বলিয়া প্রসিদ্ধ। অনেকে বলেন জগদীশের টীকা শিরোম অন্যান্য টীকাকারের রচিত ভাষা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর আসন অধিকার করিয়াছে। জগদীশের শব্দশক্তি প্রকাশিকা পণ্ডিত জীবানন্দ বিদ্যাসাগর কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে। তর্কামৃত অনেক বার কলিকাতার বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃতে এম্, এ, পাঠার্থীদিগের পাঠ্যরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল।

জগদীশের দুই পুত্র। রঘুনাথ ও রুদ্রেশ্বর। ইহাঁরা উভয়েই পরম পণ্ডিত ছিলেন। রঘুনাথ "শাংখ্য তত্ত্ববিলাস" নামে একখানি গ্রন্থ রচনা করেন। বাচস্পতি মিশ্র, ঈশ্বরকৃষ্ণের শাংখ্য কারিকার 'কৌমুদীনামে' এক টীকা করেন। ঐ টীকা অবলম্বনে উক্ত 'শাখ্যতত্ত্ববিলাস' লিখিত হয়।

রামভদ্রসিদ্ধান্তবাগীশ—ইনি রুদ্রের পুত্র ও জগদীশের পৌত্র ও ছাত্র ছিলেন। এবং শব্দশক্তি প্রকাশিকার 'সুবোধিনী' নাম্নী এক টীকা রচনা করেন। ঐ টীকায় তিনি এইরূপে আত্ম পরিচয় দিয়াছেন। যথা—

গুরুমিব গুরুমিহ নত্বা, তৎকৃতশক্তিপ্রকাশেষু
শ্রীরামভদ্রকৃতী কুরুতে টীকাং মুদে সুধিয়ঃ।

রমাবল্লভ প্রভৃতি অনেকানেক পণ্ডিতবর্গ এই বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। এক্ষণে নবদ্বীপে জগদীশের বংশধরেরা বর্ত্তমান আছেন। জগবন্ধু ও নবকুমার ভট্টাচার্য্য

এই বংশ সম্ভূত। কিন্তু কেহই আর পূর্ব্ব পুরুষ দিগের স্থায় পাণ্ডিত্য প্রাপ্ত হন নাই।

জগদীশ অধ্যাপক হইয়া চৈতন্যদেবের সেবার অংশ সহোদরদিগকে দান করেন। তজ্জন্য জগদীশের বংশধরেরা চৈতন্যদেবের সেবা হইতে বঞ্চিত হইয়াছেন।

রঘুদেব ন্যায়ালঙ্কার—রঘুদেব সুপ্রসিদ্ধ ভবানন্দের অধস্তন তৃতীয় কি চতুর্থ পুরুষ হইবেন। রঘুদেব, শিরোমণিকৃত নঞবাদের যে 'নঞবাদ বিবেচন' নামে টীকা করিয়াছেন। তাহাতে তাঁহার এইরূপ পরিচয় পাওয়া যায়—ঐ টীকার প্রথমে লিখিয়াছেন। যথা——

শিবং প্রণম্য ততপশ্চাত্তর্কবাগীশ্বরং গুরং।
ক্রিয়তে রঘুদেবেন নঞোর্থস্য বিবেচনং॥

এই শ্লোকে তাঁহার গুরুর উপাধি তর্কবাগীশ জানা যাইতেছে। কিন্তু তিনি আবার ঐ গ্রন্থ শেষে বলিয়াছেন—

অত্র সুক্তং দুরুক্তং বা যৎ কিঞ্চিৎ জল্পিতং ময়া
তৎসর্ব্বং জগদীশস্য প্রীত্যর্থামিত্যনিন্দিতং।
রঘুদেবকৃত গ্রন্থালোকনেন মনীষিণঃ
অধ্যাপয়ন্তু সন্তোষৈর্ণঞবাদ মবিবাদতঃ॥

এই শ্লোকে তিনি জগদীশের প্রীতির জন্য গ্রন্থ লিখিয়াছেন স্পষ্টাভিধানে প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু জগদীশের উপাধি তর্কালঙ্কার ছিল, তর্কবাগীশ নহে। তাহা হইলে প্রথম শ্লোকের সহিত বিরোধ ঘটিতেছে। কিন্তু এই সময়ে হরিরাম তর্কবাগীশ নামে এক প্রধান নৈয়ায়িক ও গ্রন্থকার

ছিলেন। বোধ হয় রঘুদেব প্রথমে হরিরামের নিকট ও পরে জগদীশের নিকট অধ্যয়ন করিয়া থাকিবেন। যাহা হউক রঘুদেব জগদীশের ছাত্রগণের সমসাময়িক লোক ছিলেন তাহাতে আর সন্দেহ নাই। রঘুদেবের পদার্থতত্ত্বের ব্যাখ্যা ১৬৪১ শকে সুতরাং ১৭১৯ খৃষ্টীয় অব্দে রচিত হয়।

তাহা হইলে তাঁহাকে আমরা ঐ সময়ে দেখিতে পাই। রঘুদেব গঙ্গেশোপাধ্যায়কৃত "চিন্তামণির" "গূঢ়ার্থতত্ত্বদীপিকা" নামে ভাষ্য এবং মহর্ষিকণাদের বৈশেষিকসূত্রের "ব্যাখ্যা" রচনা করেন। এবং শিরোমণিকৃত পদার্থতত্ত্বের 'ব্যাখ্যা' ও নানার্থবাদ ও 'আখ্যাতবাদটিপ্পনী,' এবং "অতিযোগীজ্ঞানের-হেতুত্ব খণ্ডন," 'ধর্ম্মিতাবচ্ছেদক,' 'প্রত্যয়াসক্তি নিরূপণ,' 'ঈশ্বরবাদ' 'সামগ্রীবাদ' 'নিরুক্তি-প্রকাশ' 'বিশিষ্ট-বৈশিষ্ট-বোধ-বিচার,' "অনুমিতিপরমার্শবাদবিচার" নামে বহুবিধ টীকা প্রণয়ন করিয়া বিখ্যাত হইয়া গিয়াছেন ঐ সময় টীকা ন্যায় সংসারে 'রঘুদেবী' বলিয়া প্রসিদ্ধ।

আম্পুলেপাড়া নিবাসী অমরনাথ ভট্টাচার্য্য এই রঘুদেবের বংশ সম্ভূত ছিলেন। উক্ত অমরনাথ, একমাত্র পুত্র নসিরামভট্টাচার্য্যকে রাখিয়া পরলোক গমন করেন। আজ প্রায় এক বৎসর হইল উক্ত নসিরামের মৃত্যু হওয়ায় নবদ্বীপ হইতে রঘুদেবের বংশের লোপ হইয়াছে। কিন্তু ভবানন্দের পুত্র মধুসূদনের বংশধর বর্ত্তমান আছেন। দণ্ডপাণীতলার বিনোদগোপাল ভট্টাচার্য্য এই বংশ সম্ভূত।

গদাধর ভট্টাচার্য্য।

জগদীশের শেষাবস্থায় গদাধরের অভ্যুদয়। গদাধর বারেন্দ্র শ্রেণীয় ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহার পিতার নাম জীবাচার্য্য। পাবনা জেলার অন্তর্গত লক্ষ্মীচাপড় নামক ক্ষুদ্র পল্লী তাঁহার আদি নিবাস।

গদাধর বাল্যকালেই নবদ্বীপে বিদ্যাভ্যাস করিতে আগমন করেন। সুপ্রসিদ্ধ হরিরাম তর্কবাগীশ তৎকালে নবদ্বীপের প্রধান নৈয়ায়িক ছিলেন। গদাধর তাঁহারই টোলে প্রবিষ্ট হইলেন। তিনি অতি যত্ন ও অধ্যবসায় সহকারে ন্যায় শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন। অল্পকাল মধ্যেই তাঁহার বিদ্যা বুদ্ধির বিষয় নবদ্বীপ-পণ্ডিত সমাজে অস্ফুটরূপে প্রচারিত হইল। কিন্তু গদাধরের পাঠ শেষ হইতে না হইতেই হরিরামের আয়ুষকাল পূর্ণ হইয়া আসিল।

হরিরামের মৃত্যু সময়ে, টোলে অধ্যাপনা করাইতে পারেন এমন উপযুক্ত পুত্র ছিল না। গদাধরের বিদ্যাবুদ্ধির বিষয় তিনি উত্তমরূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন। তিনি বুঝিয়া ছিলেন যে, যদিও এই বালকের শিক্ষা পরিসমাপ্তি হয় নাই, তথাপি স্বীয় বুদ্ধিবলে এই বালক সকল বাধা অতিক্রম করিতে সমর্থ হইবে। তজ্জন্য তিনি ব্রাহ্মণীকে বলিয়া যান যে, তাঁহার অবর্ত্তমানে এই গদাধরকে যেন টোলের অধ্যাপনা কার্য্যে নিযুক্ত করা হয়। স্বামীর পরলোকের পর ব্রাহ্মণী স্বামীবাক্যানুসারে গদাধরকেই টোলের অধ্যাপকের কার্য্যে নিযুক্ত করিলেন। ইহা অপেক্ষা গদাধরের আর সৌভাগ্যের বিষয় কি আছে। তিনি আগ্রহ-

সহকারে ঐ কার্য্য স্বীকার করিলেন। গদাধরের পাঠশেষ না হওয়ায় তিনি কোন উপাধি পান নাই। সুতরাং তাঁহার বংশের উপাধি 'ভট্টাচার্য্য' নামে খ্যাত নহে। গদাধর অধ্যাপনায় প্রবৃত্ত হইলেন বটে, কিন্তু তাঁহার হর্ষে বিষাদ হইল। তিনি অধ্যাপনায় প্রবৃত্ত হইবামাত্র, টোলের অধিকাংশ ছাত্রই তাঁহার নিকট পাঠ স্বীকার করিল না। অনেকে তাঁহার টোল ত্যাগ করিয়া কেহ জগদীশতর্কালঙ্কারের কেহ বা অন্য টোলে চলিয়া গেল।

তৎকালে এই নিয়ম ছিল যে, অধ্যাপকের বা গ্রন্থকারের বংশীয় না হইলে কেহই, কোন অধ্যাপকের নিকট পাঠ স্বীকার করিতেন না। তৎকালে পুস্তকের বিরল প্রচার ছিল। অধ্যাপক বা গ্রন্থকারের গৃহ ব্যতীত অন্যের নিকট পুস্তক পাওয়া যাইত না। সুতরাং অন্য অধ্যাপকের নিকট পুস্তক অভাবে পাঠের বড়ই অসুবিধা হইত।

গদাধর অধ্যাপনায় প্রবৃত্ত হইলেই যে কএক জন ছাত্র ছিল তাহারাও চলিয়া গেল। এই দিনেই গদাধরের ভাবী উন্নতির বীজ রোপিত হইল। গদাধর অতিশয় তেজস্বী ও দৃঢ়ব্রত ছিলেন। তিনি ভগ্নোৎসাহ না হইয়া স্বদেশ হইতে ছাত্র আনিয়া পড়াইতে কৃতসংকল্প হইলেন। এবং মনে মনে বিবেচনা করিলেন, যে কোন উপায়ে হউক আমার বিদ্যা-বুদ্ধির পরিচয় না পাইলে, কেহই আমার নিকট পাঠে স্বীকৃত হইবেন না। তখন তিনি হরিরামের টোল পরিত্যাগ করিয়া গঙ্গাস্নানের পথি পার্শ্বে চতুষ্পাঠী ও তৎসংলগ্ন একটী ফুলের বাগান করিলেন। ফুলের বাগান করিবার তাঁহার

উদ্দেশ্য ছিল। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ পূজার জন্য স্বয়ং পুষ্প চয়ন করিতেন। সুতরাং তাঁহার বাগানে পুষ্প চয়ন জন্য অধ্যাপক ও ছাত্রগণের সর্ব্বদা সমাগম হইবে, ও তাঁহাদের সহিত শাস্ত্রালাপও হইবে। গদাধরের এই কৌশল বিফল হয় নাই।

যে পর্য্যন্ত দেশ হইতে ছাত্রগণ না আসিলেন, গদাধর সে পর্য্যন্ত পুষ্পবৃক্ষের মূলে বসিয়া বৃক্ষকে উপলক্ষ করিয়া পড়াইতে লাগিলেন। প্রত্যহ প্রাতে ও স্নানের সময় যে সকল অধ্যাপক ও ছাত্রগণ পুষ্প চয়ন করিতে আসিতেন ও গঙ্গাস্নানে যাইতেন তাঁহারা মনঃসংযোগ পূর্ব্বক ঐ সকল ব্যাখ্যা শুনিতেন। ঐ সময়ে গদাধর ন্যায়ের কঠিনতর অংশ সকল অতি বিশদ ও অতি প্রাঞ্জল করিয়া ব্যাখ্যা করিতেন ও তৎসমুদয় লিপিবদ্ধ করিতেন। ছাত্রগণের ঐ সকল ব্যাখ্যা নূতন বলিয়া বোধ হইয়াছিল। তাঁহারা মনে মনে গদাধরের ভুয়সী প্রশংসা করিতে লাগিলেন। কোন কোন ছাত্র বা গোপনে তাঁহার নিকট আপন আপন সন্দেহ ভঞ্জন করিয়া লইতে লাগিলেন, এবং কেহ কেহ বা গোপনে ঐ পুস্তকের পত্র আনিয়া লিখিয়াও লইতে লাগিলেন। এইরূপে অনেকে তাঁহার নিকট গোপনে পাঠ স্বীকার করিলেন। অবশেষে এমন একটী ঘটনা উপস্থিত ঘটিল যে আর কাহারও তাঁহার নিকট পাঠ স্বীকাব করিতে বাধা রহিল না।

গদাধর এই সময়ে রঘুনাথ কৃত বৌদ্ধাধিকার দীধিতির টীকা রচনা করেন। লিপিকরের ভ্রম বশত 'শিব্যন্তে' পাঠের পরিবর্ত্তে 'শিচ্যন্তে' পাঠ লেখা হয়। ঐ পুথির পত্র

জগদীশের টোলের কোন ছাত্রের হাতে পতিত হয়। তাহাতে ঐ ভুল দৃষ্ট হওয়ায় ঐ পত্র খানি, একটী কুক্কুরের গল দেশে বাঁধিয়া দেওয়া হয়। অচিরে এই সংবাদ গদাধরের কর্ণগোচর হইল এবং অবিলম্বে ঐ কুক্কুরকে ধৃত করিয়া তাহার গলদেশ হইতে ঐ পত্র খুলিয়া লইয়া, স্বীয় অসাধারণ তর্কশক্তি ও প্রতিভা বলে 'শিচাস্তে' পাঠই বজায় রাখিয়া নূতনরূপে ব্যাখ্যা করিলেন। তদনন্তর ঐ টীকা জগদীশের নিকট প্রেরিত হইল। জগদীশ ঐ টীকা পাঠ করিয়া স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছিলেন 'গদাধরের টীকা পড়িয়া এখন আমি নিশ্চয় বলিতে পারি না, যে কোন পাঠ প্রকৃত'। জগদীশের ন্যায়, নৈয়ায়িকপ্রধানের বুদ্ধিকে, ভ্রমে পাতিত-করা, সামান্য শ্লাঘার বিষয় নহে।

এই ব্যাপারের পর হইতেই গদাধরের খ্যাতি ও প্রতিপত্তি সমস্ত নবদ্বীপে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। এবং তদবধি ছাত্র মণ্ডলীতে তাঁহার চতুষ্পাঠী পরিপূর্ণ হইয়া গেল। এবং তিনিও একজন নবদ্বীপের প্রধান অধ্যাপক হইয়া উঠিলেন। এইরূপে গদাধর স্বীয় অধ্যবসায় ও দৃঢ়তা এবং অবিচলিত উৎসাহগুণে নবদ্বীপে অধ্যাপনা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

জগদীশের ন্যায়, গদাধরও অনেকানেক টীকা প্রণয়ন করেন। ঐ সকল টীকা সাধারণত 'গাদাধরী টীকা' ও গাদাধারী 'পাতড়া' বলিয়া বিখ্যাত। এক্ষণে অনেকেই গদাধরের টীকা পড়িয়াই পড়াশুনা শেষ করেন।

গদাধর অনুমিতি দীধিতির টীকায় বলিয়াছেন——

গিরীন্দ্রদুহিতুর্নমৎ স্থরবরাবতংসীভবৎ
পদাম্বুজ রজঃ কণা কলিতভীক্ষ্ণধীসম্পদা
গদাধরবিনির্ম্মিতা কঠিনতর্কদুর্গাটবী
নবীন পদবী মুদং বিতনুতাং সতাং ধীমতাং।

গদাধরের পুস্তকের মধ্যে পক্ষধর 'চিন্তামণিআলোকের টীকা, এবং শিরোমণিকৃত দীধিতি গ্রন্থের অনুমিতি, প্রত্যক্ষপ্রামাণ্যবাদ', বৌদ্ধাধিকার, নানার্থবাদ, ক্ষণ-ভঙ্গুরবাদ, ও নঞ্‌বাদ প্রভৃতি দীধিতির টীকা এবং বাদার্থ বিষয়ে 'প্রথমাব্যুৎপত্তি' 'দ্বিতীয়াদিব্যুৎপত্তিবাদ', 'অনু-মিতিমানসবাদার্থ', 'নব্যমতবাদার্থ', ব্যাপ্ত্যনুগমবাদার্থ, 'রত্নকোষবাদার্থ', কারণতাবাদার্থ এবং 'উপসর্গ বিচার', 'বিষয়তাবাদার্থবিচার', 'অনুকরণবিচার', 'নানার্থবিচার', 'তদাদিসর্ব্বনামবিচার', 'সন্দিগ্ধার্থবিচার', 'ত্বতলাদি ভাব্য-প্রত্যয়বিচার', 'বিধিস্বরূপ বাদার্থবিচার', ও সাদৃশ্যবাদ, শক্তিবাদ ও মুক্তিবাদ প্রভৃতি গ্রন্থে তাঁহার পাণ্ডিত্য ও তর্কশক্তির সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। ঐ সকল পুস্তক অদ্য পর্য্যন্ত নৈয়ায়িক সমাজে সাদরে অধীত হইয়া থাকে। বাদার্থ-বিষয়ে তিনি চতুঃষষ্টি সংখ্যক পুস্তক রচনা করেন। কিন্তু তাঁহার আর কোন গ্রন্থের নাম প্রাপ্ত হই নাই। তিনি নঞ্‌বাদ দীধিতির টীকায় লিখিয়াছেন——

নঞ্‌বাদ সঙ্গত শিরোমণি গূঢ়ভাবং।
শ্রীমান গদাধর সুধীঃ প্রকটী করোতু॥

গদাধর শিরোমণিকৃত প্রত্যক্ষ চিন্তামণিদীধিতির যে ভাষ্য রচনা করিয়াছেন তাহাতে নিম্নলিখিত এই শ্লোক আছে।

নত্বা নন্দতনুজ সুন্দর পদদ্বন্দ্বং গুরোরাদরাৎ
উর্ব্বীমণ্ডলমণ্ডনায়িত লসৎকীর্ত্তে বিদিত্বা গুরুং
সংক্ষিপ্তোক্ত্যতিদক্ষ দীধিতিকৃতঃ প্রত্যক্ষ চিন্তামণে
র্ব্যাখ্যাং ব্যাকুরুতে গদাধর বুধো মোদায় বিদ্যাবতাং।

এই শ্লোকের দ্বারা কেহ কেহ তাঁহাকে শিরোমণির ছাত্র বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। শিরোমণি, গদাধরের অন্তত শত বৎসর পূর্ব্ববর্ত্তীকালের লোক ছিলেন। পুরুষগণনায় এক্ষণে গদাধর হইতে সাত জন পাওয়া যায়। ইহাঁদের এক এক জনের জীবনকাল গড়ে ২৫ বৎসর করিয়া ধরিলে আমরা গদাধরকে অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম সময়ে দেখিতে পাই। কিন্তু শিরোমণি খৃষ্টীয় ষোড়শশতাব্দীর মধ্য সময়ে জীবিত ছিলেন। সুতরাং গদাধরের, কখনই শিরোমণির নিকট অধ্যয়ন সম্ভব নহে। তিনি যে শিরোমণির ছাত্র নহেন তাহা নিশ্চিত। কথায় বলে——

"হরের গদা, গদার জয়।
জয়ার বিশু, লোকে কয়॥"

অর্থাৎ হরিরামের ছাত্র গদাধর ভট্টাচার্য্য, গদাধরের ছাত্র জয়রাম, ও জয়রামের ছাত্র বিশ্বনাথ প্রধান।

এক্ষণে নবদ্বীপে গদাধরের বংশধরেরা বর্ত্তমান রহিয়াছেন। এবং পূর্ব্বপুরুষদিগের গৌরব রক্ষা করিতেছেন।

নিমন্ত্রণ প্রথাই তৎকালে অধ্যাপকগণের সংসার যাত্রা নির্ব্বাহের প্রধান উপায় ছিল। এবং হিন্দুগণও বিশেষ ধর্ম্মানুরাগী ছিলেন ও সকলেই হিন্দুধর্ম্ম্য ক্রিয়াকাণ্ডের অনুষ্ঠানে অনুরক্ত ছিলেন। সংক্রান্তি ও তিথি বিশেষে

ব্রাহ্মণদিগকে দান করা রীতি ছিল। এই সকল উপায়ে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদিগের যাহা কিছু আয় হইত তাহাতেই তাঁহারা সামান্য পরিধেয় ও সামান্য গৃহে বাস করিয়া সন্তুষ্ট চিত্তে শাস্ত্রালোচনায় অনুরক্ত থাকিতেন। তাঁহারা ঐহিক ভোগ সুখে একেবারেই বিরত ছিলেন। ব্রাহ্মণীগণও তদনুরূপ ছিলেন। তাঁহারা স্বর্ণালঙ্কারাদি মূল্যবান গহনার প্রত্যাশী ছিলেন না। এক জোড়া শাঁখা ও একখানি মোটা শাড়ী পাইলেই পরম আহ্লাদিতা হইতেন।

গোবিন্দ ন্যায়বাগীশ—গোবিন্দ সুপ্রসিদ্ধ বাসুদেব সার্ব্বভৌমের বংশীয় ছিলেন। কিন্তু বাসুদেব হইতে কত পুরুষ পরে গোবিন্দ প্রাদুর্ভূত হন, তাহা জানিতে পারি নাই। তিনি খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে বর্ত্তমান থাকিয়া নবদ্বীপের প্রধান নৈয়ায়িকের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তৎকালে গোবিন্দের টোল, নানা দেশীয় ছাত্রে পরিশোভিত ছিল। সকল টোলের অপেক্ষা তাঁহারই টোলে ছাত্র সংখ্যাও অধিক ছিল।

এই সময়ে মহারাজ রাঘব, রেউই (কৃষ্ণনগর) রাজধানী স্থাপন করেন। রাঘবের পিতামহ ভবানন্দ মজুমদার প্রথমে নদীয়ার জমীদারী প্রাপ্ত হন। কিন্তু তিনি মাটীয়ারীতেই বাস করিতেন। রাঘব প্রজারঞ্জক ও ধার্ম্মিক ছিলেন। বিদ্যা বিষয়ে তাঁহার বিশেষ উৎসাহ ছিল। কৃষ্ণনগরে বাস করায় তিনি সর্ব্বদাই নবদ্বীপে আগমন ও অধ্যাপকদিগের সহিত শাস্ত্রীয় আলাপ করিয়া আনন্দানুভব করিতেন।

তিনি এই গোবিন্দন্যায়বাগীশকে আড়বান্দী গ্রামে একহাজার বিঘা ব্রহ্মত্তর ভূমিদান করিয়া বিদ্যোৎসাহিতার বিশেষ পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। মহারাজ রাঘব, যেমন বিদ্যোৎসাহী ছিলেন সাধারণের হিতকর কার্য্যও তাঁহার তেমনি দৃষ্টি ছিল। দীগনগর গ্রামের নিকটে জলাশয় না থাকায় তথাকার ও নিকটবর্ত্তী অধিবাসীদিগের জলাভাবে বড়ই কষ্ট হইত। রাঘব তন্নিবারণ জন্য ঐ স্থানে এক প্রকাণ্ড দীঘী ও তত্তীরে এক মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া রাঘবেশ্বর নামে এক শিব প্রতিষ্ঠা করেন। তাহাতে রাঘবের সময় নির্দ্দেশ আছে।

শাকে সোমনবেষু চন্দ্রগণিতে পুণ্যৈকরত্নাকরো,
ধীর শ্রীযুত রাঘবোদ্বিজমণি র্ভূমিভুজা মগ্রণীঃ।
নির্ম্মায় স্ফুরদূর্ম্মি নির্ম্মল জলপ্রদ্যোতিনীং দীর্ঘিকাং,
তত্তীরে কৃতরম্য বেশ্মনি শিবং দেবং সমস্থাপয়ৎ॥

১৫৯১ শাকে বা ১৬৬৯ খৃষ্টীয়াব্দে মহারাজ রাঘব ঐ শিব প্রতিষ্ঠা করেন।

রাঘবের পুত্র রুদ্র, রেউইএর নাম কৃষ্ণনগর রাখেন। এবং বর্ত্তমান চক ও নহবৎখানা ইত্যাদি নানাবিধ হর্ম্ম্যে রাজধানী পরিশোভিত করেন। এই সময় হইতেই কৃষ্ণ নগরের রাজবংশের সহিত নবদ্বীপের সম্বন্ধ সংঘটিত দেখা যায়। এবং কৃষ্ণনগরের রাজন্যবর্গ নদীয়ার ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদিগের ভূমি ও অর্থাদির দ্বারা সাহায্য করিতে থাকেন।

শ্রীকৃষ্ণ ন্যায়ালঙ্কার—ইনি গোবিন্দের পুত্র একজন পরম পণ্ডিত ছিলেন। ইনি জানকীনাথ তর্কচূড়ামণিকৃত ন্যায়সিদ্ধান্তমঞ্জরী পুস্তকের 'ভাবদীপিকা' নামে একখানি উৎকৃষ্ট টীকা প্রণয়ন করিয়াছেন। যথা——

প্রণম্য শিবয়োঃ পাদৌধীমতা কৃষ্ণশর্ম্মণাঃ
সিদ্ধান্তমঞ্জরীব্যাখ্যা ক্রিয়তে ভাবদীপিকা।

জয়রাম ন্যায়পঞ্চানন—জয়রাম নামে দুইজন অধ্যাপকের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। একের নাম জয়রাম ন্যায়পঞ্চানন, দ্বিতীয় জয়রাম তর্কালঙ্কার। গদাধরের জয়রাম নামে ছাত্র ছিলেন, তাহা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। কিন্তু প্রথমোক্ত জয়রাম, গদাধরের ছাত্র কিনা তাহা স্থির করিতে পারা যায় নাই, কিন্তু জয়রাম তর্কালঙ্কার গদাধরের ছাত্র ছিলেন। ও এক সময়ে উভয়েই বর্ত্তমান ছিলেন।

জয়রাম ন্যায়পঞ্চাননের বংশ নাই। থাকিলেও তাহা নির্ণয় করিবার উপায় নাই। তিনি শিরোমণির কৃত মণিদীধিতির 'ব্যাখ্যাসুধা' নানার্থবাদের 'বিবৃতি, সামান্য লক্ষণাদীধিতির 'টীপ্পনী' পদার্থতত্ত্বের 'পদার্থমণিমালাভাষা' গুণপ্রকাশদীধিতির 'টীপ্পনী' হেত্বাভাষদীধিতির 'টীপ্পনী' এবং পক্ষধর মিশ্রকৃত মণ্যালোকের 'আলোকবিবেক' এবং রুদ্ররাম তর্কবাগীশেরকৃত কারব্যুহের 'ব্যাখ্যা' প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন। তিনি মহর্ষি গৌতমের ন্যায়সূত্রের 'ন্যায়সিদ্ধান্ত-মালা' নামে এক ভাষ্য রচনা করত চতুর্ব্বিধ প্রমাণের বিচার করিয়া অসাধারণ পাণ্ডিত্য দেখাইয়া গিয়াছেন। তাঁহার

ন্যায়সিদ্ধান্তমালা ১৭৫০ সংবতে ও ১৬৯৩ খৃষ্টীয় শাকে রচিত হয়। জয়রাম আখ্যাতবাদ টীপ্পনীর 'ব্যাখ্যাসুধায়' এইরূপ পরিচয় দিয়াছেন——

ন্যায়পঞ্চাননঃ শ্রীমান্ জয়রামঃ সমাসতঃ।
আখ্যাত বাদব্যাখ্যান মাতনে'তি মনোরমং॥
ধীর শ্রীজয়রামেন রামনৈব মহোদধেঃ।
ন্যায়সিন্ধোঃ পরং পারং গন্তমধ্বা নিবধ্যতে॥

এই সময়ে মহারাজ রামকৃষ্ণ রায়, কৃষ্ণনগরের রাজ-সিংহাসনে উপবিষ্ট ছিলেন। তিনি বিদ্যার উন্নতি সাধন সঙ্কল্পে পূর্ব্বপুরুষদিগের অপেক্ষা অধিকতর উৎসাহী ছিলেন ও নবদ্বীপস্থ অধ্যাপকদিগের সংসার যাত্রানির্ব্বাহের নিমিত্ত বহুতর নিষ্কর ভূমি দান করিয়া গিয়াছেন। এবং পাঠার্থী-দিগের ব্যয়ের জন্য অনেক টাকার সম্পত্তিও নির্দ্দিষ্ট করিয়া গিয়াছেন। এক্ষণে গবর্ণমেণ্ট হইতে মাসিক ১০০ টাকা হিসাবে নবদ্বীপস্থ টোলের ছাত্রেরা বৃত্তি পাইয়া থাকেন। ঐ টাকা রামকৃষ্ণের প্রদত্ত ভূমির আয় হইতেই দেওয়া হইয়া থাকে। কেহ কেহ বলেন যে ঐ টাকা সুপ্রসিদ্ধ মহারাণী রাণী-ভবাণীর পুত্র রামকৃষ্ণের প্রদত্ত। যাহাহউক রামকৃষ্ণ এইরূপে নবদ্বীপের পণ্ডিতগণের সাহায্য করায় নবদ্বীপস্থ পণ্ডিতমণ্ডলী তাঁহাকে 'নবদ্বীপাধিপতি' এই উপাধি প্রদান করেন। তদবধি কৃষ্ণনগরের রাজবংশ 'নবদ্বীপাধিপতি' নাম সাদরে গ্রহণ করিয়া আসিতেছেন।

জয়রাম তর্কালঙ্কার—জয়রামের আদি নিবাস পাবনা জেলায় ছিল। ইহার পিতা জয়দেব একজন অতি প্রধান নৈয়ায়িক ছিলেন। তিনি পুটীয়া রাজবংশের সভা-পণ্ডিত থাকিয়া বিশেষ খ্যাতি লাভ করেন। এবং বৃদ্ধাবস্থায় নবদ্বীপে বাস করেন। জয়রাম বারেন্দ্রশ্রেণীয় ব্রাহ্মণ ছিলেন। অদ্যাপি তাঁহার বংশধরেরা বর্ত্তমান আছেন। আম্পুলে-পাড়া নিবাসী কৃষ্ণকুমার সান্ন্যাল তাহার বংশধর। কিন্তু ইঁহারা আর কেহই সংস্কৃত শাস্ত্র ব্যবসায়ী নহেন। কৃষ্ণকুমার ও তদীয় পুত্রগণ সকলেই ইংরেজী শিক্ষা করিয়া চাকরী করিতেছেন। কৃষ্ণকুমার হইতেই সংস্কৃত অধ্যয়ন লোপ হইয়াছে। জয়রাম গদাধরের ছাত্র ছিলেন। তিনি গদাধর প্রণীত শক্তিবাদ গ্রন্থের টীকা করিয়া বিশেষ পাণ্ডিত্য প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন।

বিশ্বনাথ ন্যায়পঞ্চানন—বিশ্বনাথ জয়রাম তর্কালঙ্কারের ছাত্র। তিনি খৃষ্টীয় শাকের সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে প্রাদুর্ভূত হন।

বিশ্বনাথেরা দুই সহোদর ছিলেন। দ্বিতীয়ের নাম রুদ্রনাথ বাচস্পতি। উভয়েই বিদ্যানিবাস-পুত্র বলিয়া পরিচয় দিয়া গিয়াছেন কিন্তু কেহই পিতার নাম নির্দ্দেশ করেননাই। 'বিদ্যানিবাস' তাঁহাদের পিতার উপাধি ছিল।

বিশ্বনাথ, ভাষাপরিচ্ছেদ ও সিদ্ধান্তমুক্তাবলী নামে দুইখানি মৌলিকগ্রন্থ এবং মহর্ষি গৌতমপ্রণীত ন্যায়সূত্রের 'ন্যায়সূত্র-বৃত্তি' ও শিরোমণিকৃত পদার্থতত্ত্বের 'অবলোক' নামে ভাষ্য

রচনা করিয়া কি সারগ্রাহিতার ও বিদ্যাবত্তার পরিচয় দিয়া গিয়াছেন! তদীয় গ্রন্থ সকল অস্মদ্দেশীয় চতুষ্পাঠীতে ও কলিকাতা সংস্কৃতকালেজে অতি আদরে অধীত হইয়া থাকে। কথিত আছে তিনি স্বীয় পৌত্র, রাজকৃষ্ণের শিক্ষা সৌকর্য্যার্থে ভাষাপরিচ্ছেদ রচনা করিয়াছিলেন।

বিশ্বনাথ পিঙ্গলাচার্য্যকৃত ছন্দসূত্রের 'পিঙ্গলপ্রকাশিকা' নামে এক টীকা করেন, তাহাতে তাঁহার এইরূপ পরিচয় পাওয়া যায়। যথা——

বিদ্যা নিবাস সূনোঃ কৃতিরেষা বিশ্বনাথস্য।
বিদুষা মতিসূক্ষ্ম ধিয়া মমৎসরাণাং মুদে ভবিতা।

রুদ্রনাথ ন্যায়বাচস্পতি—পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে ইনি বিশ্বনাথের কনিষ্ঠ ভ্রাতা। পাণ্ডিত্যে কোন অংশেই ইনি ভ্রাতার ন্যূন ছিলেন না। রুদ্রনাথ, ন্যায়শাস্ত্রীয় কয়েকখানি ভাষ্য রচনা করিয়া অসাধারণ পাণ্ডিত্য দেখাইয়া গিয়াছেন। তৎপ্রণীত টীকা সকল 'রৌদ্রী' বলিয়া বিখ্যাত। শিরোমণিকৃত বৈশেষিকশাস্ত্রীয় গুণপ্রকাশদীধিতির 'ভাবপ্রকাশিকা' ও মণিদীধিতির 'ভাষ্য' এবং উদয়নাচার্য্যকৃত কুসুমাঞ্জলির ব্যাখ্যা এবং স্বীয় ভ্রাতার রচিত সিদ্ধান্তমুক্তাবলীর 'ভাষ্য' ইত্যাদি পুস্তকে তাঁহার বিশেষ বিদ্যাবত্তার ও পাণ্ডিত্যের যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি প্রত্যক্ষমণিদীধিতির ব্যাখ্যাবিবেচন নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন——

বিদ্যানিবাস পুত্রস্য ন্যায়বাচস্পতেরিয়ং
নির্ম্মিতং নির্ম্মলং ধিয়াং আনন্দয়তু মানসং॥

শিবরাম বাচস্পতি—রুদ্রনাথের সময়ে বা কিঞ্চিৎ পরেই শিবরাম প্রাদুর্ভূত হন। ইনি একজন ষড়দর্শনবেত্তা প্রধানপণ্ডিত ছিলেন। ইনি গদাধর ভট্টাচার্য্যপ্রণীত মুক্তিবাদের একখানি টীকা করিয়া গিয়াছেন। ইঁহার পুত্র হরিরাম তর্কসিদ্ধান্ত। তিনি নবদ্বীপের প্রধান নৈয়ায়িকছিলেন। তৎকালে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায় নবদ্বীপের রাজসিংহাসনে উপবিষ্ট ছিলেন। এক্ষণে নবদ্বীপের হরিরামের বংশধর বর্ত্তমান রহিয়াছেন।

বুনো রামনাথ—ইহাঁর প্রকৃত নাম রামনাথ তর্কসিদ্ধান্ত। খৃষ্টীয় অষ্টাদশশতাব্দীর শেষভাগে ইনি প্রাদুর্ভূত হন। রামনাথ, ন্যায়শাস্ত্রে অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন। কিন্তু তাঁহার কোন গ্রন্থের উল্লেখ পাওয়া যায়না। রামনাথ অতিশয় দুঃখী ছিলেন। এই দারিদ্র্য নিবন্ধন তিনি প্রথমে বিবাহ করিতে স্বীকৃত হন নাই। পক্ষান্তরে রামনাথের ন্যায় সৎপাত্রে কন্যাদান করিতে অনেকেই বাসনা করিয়াছিলেন। অবশেষে অধ্যাপকের অনুরোধে তিনি বিবাহ করিতে বাধ্য হন। বিবাহের কিছু পরেই রামনাথের পাঠ সমাপন হয়।

তৎকালে নিয়ম ছিল এই যে, কোন ছাত্রের পাঠ শেষ হইলে তিনি নবদ্বীপের (কৃষ্ণনগরের) রাজ-সমীপে উপস্থিত হইয়া বিদ্যার পরিচয় দিতেন ও রাজার নিকট টোল করিবার সাহায্য ও অনেক ভূমি প্রাপ্ত হইতেন। রামনাথের অবস্থা ভাল ছিলনা বটে কিন্তু রাজসমীপে উপস্থিত হইলেন না।

তিনি নবদ্বীপের প্রত্যন্ত প্রদেশে (এখন যেখানে পাকা টোল আছে) বনের মধ্যে কুটীর নির্ম্মাণকরিয়া তথায় শাস্ত্রালোচনায় প্রবৃত্ত রহিলেন।

রামনাথ হইতে শিক্ষা প্রণালীর মহৎ পরিবর্ত্তন হইয়াছে। ভারতবর্ষীয় শিক্ষা প্রণালী অতি উচ্চ। পৃথিবীর কোন স্থানে কোন জাতির মধ্যে এরূপ শিক্ষা প্রণালী প্রবর্ত্তিত নাই। এই প্রণালীতে অধ্যাপকগণ ছাত্রগণের নিকট বেতন লয়েন না; পরন্তু তাঁহাদিগের অশনাদির ব্যয় নির্ব্বাহ করিতে হয়। রামনাথের এই ব্যয়ভার গ্রহণ করিবার ক্ষমতা ছিলনা। অন্যেরও সাহায্য লইতেন না। এদিকে তাঁহার নিকট অনেক ছাত্র শিক্ষার্থী হইল। তখন রামনাথ ছাত্রদিগকে কহিলেন, তাহাদের আহারাদি প্রদান করিতে পারেন এ ক্ষমতা তাঁহার নাই। ছাত্রেরা কহিলেন, মহাশয়! আমরা পাঠার্থী হইয়াই আসিয়াছি, আহারার্থী হইয়া আসি নাই অতএব আমাদের নিজের আহারের নিমিত্ত মহাশয়ের কোন চিন্তা নাই।এই অবধি নবদ্বীপের পণ্ডিত সমাজে ছাত্রগণের অশনাদির নিয়ম পরিবর্ত্তিত হইয়া আসিয়াছে।

রামনাথের ঘরে অন্ন ছিলনা, তথাপি তিনি কাহারও দ্বারস্থ হন নাই। একদিন প্রাতঃকালে তিনি টোলে যাইতেছিলেন, এমন সময়ে তাঁহার গৃহিণী কহিলেন নাথ! আজ ঘরে কিছুই নাই কি পাক করা যাইবে? রামনাথ, শাস্ত্র চিন্তায় নিমগ্ন, ব্রাহ্মণীর প্রতি ফিরিয়া চাহিলেন বটে কিন্তু তাঁহার মনোযোগ হইল না। তাঁহার কথাগুলি কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট

হইল বটে কিন্তু মনোযোগ অভাবে তাহা মস্তিষ্কে নীত হইল না। তিনি কিয়ৎক্ষণ নিকটস্থ তিন্তিড়ী বৃক্ষে দৃষ্টিপাত করিয়া স্বীয় কর্ম্মে চলিয়া গেলেন। অবোধ ব্রাহ্মণী ভাবিলেন বুঝি স্বামী তিন্তিড়ী পত্র রাঁধিতে বলিয়া গেলেন। মধ্যাহ্ন-কালে স্বামী বাটী প্রত্যাগমন করিয়া স্নানাহ্নিক সমাপন করিলে পর, ব্রাহ্মণী অন্ন ও তিন্তিড়ী পত্রের ঝোল রন্ধন করিয়া স্বামী সমীপে সংস্থাপিত করিলেন। ভোজন করিয়া রামনাথের অতীব তৃপ্তি লাভ হইল। তখন তিনি ব্রাহ্মণীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন "আজ এ অমৃতময় বস্তু কোথায় পাইলে" তখন ব্রাহ্মণী কহিলেন "কেন নাথ! ওত তেঁতুল পাতা সিদ্ধ, তুমিত যাইবার সময়ে আমাকে রন্ধন করিতে বলিয়া গেলে" তখন রামনাথ অতিশয় আহ্লাদ সহকারে কহিলেন, বটে, তেঁতুলপাতা সিদ্ধ এত উত্তম! তবেত আর আমাদের আহারের ভাবনা নাই।"

এই সময়ে কৃষ্ণনগরের রাজ-সিংহাসনে মহারাজ শিবচন্দ্র আসীন ছিলেন। তিনি লোকমুখে রামনাথের এইরূপ কষ্ট শুনিয়া তাঁহাকে স্বীয় রাজধানীতে আসিবার জন্য অনুরোধ করেন। কিন্তু তাহাতে কৃতকার্য্য না হইয়া অবশেষে একদিন তাঁহার চতুষ্পাঠীতে উপস্থিত হইলেন। তৎকালে রামনাথ ছাত্রগণকে শিক্ষা দিতে ছিলেন। শিক্ষায় এতাদৃশ মনঃসংযোগ হইয়াছিল যে, মহারাজকে তাঁহার জ্ঞান গোচর হইল না। পরে তর্ক শেষ হইলে মহারাজকে যথাবিহিত সম্মান পুরঃসর অভ্যর্থনা করিলেন। মহারাজ আসনপরিগ্রহ করিয়া কহিলেন মহাশয়! কোন বিষয়ে আপনার অনুপপত্তি

আছে? তখন রামনাথ কহিলেন "মহারাজ! চারিখণ্ড চিন্তামণিশাস্ত্রের উপপত্তি করিয়াছি, কৈ আমারত অনুপপত্তি কিছুই দেখিতেছি না; কেমন হে ছাত্রগণ! তোমাদের কিছু অনুপপত্তি আছে কি?" এই উত্তরে মহারাজ, একেবারে বিস্ময় সাগরে নিমগ্ন হইলেন। তখন তিনি মনে করিলেন হয়ত ভট্টাচার্য্য তাঁহার কথার ভাব বুঝিতে পারেন নাই। যাহা হউক পরিষ্কার করিয়া জিজ্ঞাসা করিতে হইল। তিনি পুনরায় কহিলেন, মহাশয়! আপনাকে শাস্ত্র সম্বন্ধে কোন কথা জিজ্ঞাসা করি নাই, আপনার সাংসারিক অভাব কি আছে তাহাই জিজ্ঞাসা করিয়াছি। উহার প্রত্যুত্তরে রামনাথ কহিলেন, মহাশয়! সেবিষয় ব্রাহ্মণীকে জিজ্ঞাসা না করিয়া বলিতে পারি না। মহারাজ দেখিলেন যে, এই তাঁহার অভিষ্ট সিদ্ধির সুন্দর উপায় হইয়াছে। তিনি মনে করিলেন যে স্ত্রীলোকেরা সহজেই অর্থের বশীভূত, অনায়াসেই তাঁহার মনোরথ পূর্ণ হইবে। তিনি স্বয়ং ব্রাহ্মণীর সমীপে যাইবার বাসনা করিলেন। রামনাথের তাহাতে কোন আপত্তি নাই। তিনি কহিলেন, অদূরে যে কুটীর দেখিতেছেন ঐ কুটীরে ব্রাহ্মণী আছেন। মহারাজ, আজ্ঞা পাইয়া ঐ কুটীর সমীপে উপস্থিত হইলেন এবং দেখিলেন, অভ্যন্তরে এক পরমাসুন্দরী কৃশাঙ্গী তেজস্বিনী রমণী-মূর্ত্তি স্বীয় সৌন্দর্য্যে কুটীর আলোকময় করিয়া অবস্থিতি করিতেছেন। মহারাজ, তাঁহাকে মাতৃ সম্বোধন করিয়া আত্মপরিচয় দিয়া কহিলেন, মা! আপনাদের সংসারের অপ্রতুল নিবারণ জন্যই আমি এখানে আসিয়াছি, এক্ষণে কি কি অপ্রতুল আছে, আমাকে দয়া করিয়া বলিলে, আমি

তত্তাবৎ দূর করিয়া দিই। তখন ব্রাহ্মণী সদর্পে উত্তর করিলেন, বৎস! আমার কিছুমাত্র অভাব নাই। আমার পরণে ঠেঁটী আছে, জল খাবার ঘটী আছে, শয়নের চেটাই আছে, অধিক কি আমার বাম করে লৌহ আছে—আমার কিছুরই অভাব নাই। মহারাজ শিবচন্দ্র, রামনাথ-পত্নীর এই উত্তর শ্রবণে একবারে চমৎকৃত ও বিস্মিত হইলেন। এবং মনে মনে তাঁহার ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিলেন। ধন্য রামনাথ পত্নি! তুমি তোমার পতির উপযুক্ত পত্নীই বট, কিরূপে স্বামীর সমদুঃখভাগিণী হইতে হয়, কিরূপে স্বামীর ধর্ম্মের মতানুবর্ত্তন করিতে হয় এবং কিরূপেই বা পতির সম্মান রক্ষা ও পতিভক্তি করিতে হয়, তাহা তুমি উত্তম-রূপে দেখাইয়া গিয়াছ। তুমি নারীকুলের আদর্শ এবং সতীর শিরোমণি!

অনন্তর রাজা তথা হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া রাম-নাথকে প্রচুর অর্থ দিতে চাহিলেন কিন্তু রামনাথ কহিলেন মহারাজ! অর্থই অনর্থের মূল, ও অধ্যয়ন-রিপু, অর্থ লইলে আমার বংশাবলী ভোগবিলাসী সুতরাং মূর্খ হইবে। আমার অর্থের প্রয়োজননাই।

এই সময়ে কলিকাতায় মহারাজ নবকৃষ্ণের ভবনে একজন নৈয়ায়িক, দিগ্‌বিজয় সংকল্পে আসিয়া উপস্থিত হন। তদুপলক্ষে তাঁহার ভবনে এক মহতী সভা হয়। ঐ সভায় তৎকালে নবদ্বীপের প্রধান নৈয়ায়িক শিবনাথ বিদ্যাবাচস্পতি ও বংশবাটীর সুপ্রসিদ্ধ জগন্নাথতর্কপঞ্চানন প্রভৃতি অধ্যাপক-গণ উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু কেহই দিগ্‌বিজয়ী পণ্ডিতের

প্রশ্নের উত্তর দিতে সক্ষম হন নাই। অবশেষে রামনাথ আসিয়া তাঁহার প্রশ্নের উত্তর দিয়া নবদ্বীপের মান রক্ষা করিলেন। রাজা নবকৃষ্ণ রামনাথের পাণ্ডিত্যে বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে প্রচুর ধন দিতে চাহিলেন। কিন্তু রামনাথ 'কাক বিষ্ঠা' বলিয়া তাহা স্পর্শও করিলেন না। ধন্য রামনাথ! নিস্পৃহতা কি তাহা শিক্ষা দিবার জন্যই তোমরা দম্পতিরূপে শরীর পরিগ্রহ করিয়াছিলে।

তৎকালে নবদ্বীপে তর্কসিদ্ধান্ত উপাধিধারী দুইজন রামনাথ ছিলেন। একজন নৈয়ায়িক ও একজন স্মার্ত্ত। নৈয়ায়িক রামনাথ, গ্রামের প্রান্তে বাস করিতেন বলিয়া তিনি 'বুনো', এবং স্মার্ত্ত রামনাথ, গ্রামে বাস করিতেন বলিয়া তিনি 'গেঁয়ে' নামে প্রসিদ্ধ হন। এই গেঁয়ে রামনাথের বংশাবলী নবদ্বীপে বর্ত্তমান আছেন। শ্রীযুক্ত প্রসন্নচন্দ্র বিদ্যারত্ন এই গেঁয়ে রামনাথের প্রপৌত্র।

কৃষ্ণকান্ত বিদ্যাবাগীশ—কৃষ্ণকান্ত সুপ্রসিদ্ধ রামনারায়ণ তর্কপঞ্চাননের ছাত্র। ইনি বৈদিক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ ছিলেন। অদ্যাপি ইহাঁর বংশধরেরা নবদ্বীপে ও পূর্ব্বস্থলীতে বাস করিতেছেন।

কৃষ্ণকান্ত, ন্যায় ও স্মৃতি উভয় শাস্ত্রেই সমান পারদর্শী ছিলেন। তিনি জগদীশকৃত ন্যায়শাস্ত্রীয় শব্দশক্তিপ্রকাশিকার এবং শিরোমণিকৃত পদার্থতত্ত্বের 'টীকা' এবং জীমূতবাহন কৃত দায়ভাগের 'টীকা' করিয়া ন্যায় ও স্মৃতি উভয় শাস্ত্রেই অসাধারণ পাণ্ডিত্য দেখাইয়া গিয়াছেন। কাব্যশাস্ত্রেও তাঁহার বিলক্ষণ অধিকার ছিল। তিনি 'গোপাললীলামৃত',

'চৈতন্যচন্দ্রামৃত' এবং 'কামিনীকামকৌতুক' নামে তিনখানী ক্ষুদ্র কাব্যগ্রন্থ রচনা করিয়া স্বীয় বিলক্ষণ কবিত্ব প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। এবং 'ন্যায়রত্নাবলী' নামে ন্যায়শাস্ত্রের সারসংগ্রহ করিয়া গিয়াছেন। উহাতে লিখিত আছে——

নব্য প্রাচীন তার্কিক সর্ব্বার্থধীয়ান ধীমতা।
তন্মতে কৃষ্ণকান্তেন ন্যায়রত্নাবলী মতা॥

মহারাজ গিরিশচন্দ্রের সময়ে নবদ্বীপের উত্তরস্থ মাঠে ভূগর্ভ হইতে এক গোপাল মূর্ত্তি উত্থিত হয়। সেই ঘটনা অবলম্বনে 'গোপাললীলামৃত' লিখিত লয়। ঐ গোপাল দেব এক্ষণে কৃষ্ণনগরের রাজবাটীতে বর্ত্তমান আছেন।

কৃষ্ণকান্ত, অতিশয় অহঙ্কৃত ছিলেন। মৃত্যুকালে যখন তাঁহাকে গঙ্গার তীরস্থ করা হয়, তখন তাঁহার জনৈক আত্মীয় কহিলেন, বিদ্যাবাগীশ খুড়ো! গঙ্গায় আনা গেল; প্রণাম করুন। তখন বিদ্যাবাগীশ উত্তর করিলেন বাপু হে! আনা গেল নহে, আনা রহিল। আমি গেলে নবদ্বীপের পনর আনা যাইবে, আনা মাত্র রহিবে। এই বলিয়া তিনি সেই মৃত্যুশয্যায় শায়িত হইয়া নিম্নলিখিত শ্লোক রচনা করিয়া আবৃত্তি করিলেন।

অধিগগণ মনেকাস্তারকা দীপ্তিভাজঃ
প্রতি গৃহমপি দীপা দর্শয়ন্তু প্রভুত্বং
দিশি দিশি বিলসন্তে ক্ষুদ্র খদ্যোত পোতাঃ
সবিতরি পরিভূতে কিন্নলোকৈর্ব্বালোকি॥

অর্থাৎ—সূর্য্য অস্তগমন করিলে আকাশে তারকা সকল দীপ্তিপায় গৃহে গৃহে প্রদীপ সকল প্রভুত্ব প্রদর্শন করে এবং

ক্ষুদ্র জোনাকী পোকা সকলও টিপ্‌টিপ করিয়া আলো করিবার চেষ্টা করে। ভাবার্থ-আমি চলিয়া গেলে, নবদ্বীপের পণ্ডিতেরাও সেই দশাপ্রাপ্ত হইবেন।

নবম পরিচ্ছেদ।

ন্যায়ের প্রাধান্য-পদ।

রঘুনাথ নবদ্বীপে ন্যায়ের প্রাধান্য স্থাপন করেন। এবং তিনিই প্রধান নৈয়ায়িকের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তদবধি বঙ্গীয় নৈয়ায়িক সমাজে এক এক জন প্রধান হইয়া আসিতেছেন। ঐ প্রাধান্যপদ রঘুনাথের সময় হইতে অদ্য পর্য্যন্ত নবদ্বীপের অধ্যাপকগণের মধ্যেই নিবদ্ধ রহিয়াছে। রঘুনাথের পর হইতে কে, কোন সময়ে প্রাধান্য করেন, তাহা ধারাবাহিক জানিতে পারি নাই। গ্রন্থকার হইলেই প্রধান হইতেন এমন নহে। যাঁহার বিশেষ বাকপটুতা থাকিত এবং সভাজয়ী হইতে পারিতেন, তিনিই শ্রেষ্ঠ আসনে আসীন হইতেন। হরিরাম তর্কবাগীশ প্রধান ছিলেন তাহা উল্লেখ করিয়াছি। তৎপূর্ব্বে কে কোন সময়ে প্রধান ছিলেন জানিতে পারি নাই। গোবিন্দ ন্যায়বাগীশ প্রধান ছিলেন তাহাও

বলিয়াছি। গোবিন্দের পর আর কএক জনের বিষয় জানিতে পারা যায় নাই।

এক জন প্রধান অধ্যাপকের মৃত্যু হইলে বঙ্গীয় পণ্ডিত সমাজে একটী সভা হইত, বিচারে যিনি জয়ী হইতেন তিনিই প্রধান পণ্ডিতের পদে বরিত হইতেন। এবং তিনিই একপত্রী হইতেন।

রামনারায়ণ তর্কপঞ্চানন—খৃষ্টীয় অষ্টদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে আমরা রামনারায়ণ তর্কপঞ্চাননকে এই প্রধানপদে অধিষ্ঠিত দেখিতে পাই। তিনি একজন অসাধারণ নৈয়ায়িক ছিলেন। ইহার সময়ে সুপ্রসিদ্ধ গদাধরের পৌত্র হরদেব তর্কালঙ্কার, জগদীশের পৌত্র রামভদ্রসিদ্ধান্তবাগীশ, ও যদুরাম সার্ব্বভৌম প্রভৃতি অনেকানেক সুপ্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক বর্ত্তমান ছিলেন। কৃষ্ণকান্ত বিদ্যাবাগীশ ও বুনোরামনাথ এই রামনারায়ণের ছাত্র ছিলেন। এক্ষণে রামনারায়ণ তর্কপঞ্চাননের বংশ নাই।

হরিরাম তর্কসিদ্ধান্ত—রামনারায়ণের মৃত্যুর পর হরিরাম তর্কসিদ্ধান্ত প্রাধান্য প্রাপ্ত হন। ইনি সুপ্রসিদ্ধ শিবরাম বাচস্পতির পুত্র। এই সময়ে শঙ্কর তর্কবাগীশ, কৃষ্ণকান্ত বিদ্যালঙ্কার ও রমাবল্লভ বিদ্যাবাগীশ বর্ত্তমান ছিলেন। এক্ষণে হরিরামের বংশধরেরা বর্ত্তমান আছেন। হেরম্ব ভট্টাচার্য্যের পুত্র হরমোহন বাবু এই বংশ সম্ভূত।

শঙ্কর তর্কবাগীশ—হরিরামের মৃত্যুর পর শঙ্কর তর্কবাগীশ প্রধান হইয়া উঠেন। শঙ্কর যদুরাম সার্ব্বভৌমের পুত্র। ইনি পিতার নিকট অধ্যয়ন করেন। ইঁহার সময়ে

বুনোরামনাথ, মধুসূদন ন্যায়লঙ্কার, কান্ত বিদ্যালঙ্কার, শরণতর্কালঙ্কার প্রভৃতি প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িকগণ বর্ত্তমান ছিলেন। শঙ্করতর্কবাগীশের যদিও কোন গ্রন্থ নাই তথাপি ইনি একজন অসাধারণ পণ্ডিত বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন। অদ্যাপি নবদ্বীপে তাঁহার ও তদীয় সহোদর শরণ তর্কালঙ্কারের বংশধরেরা বর্ত্তমান আছেন।

শিবনাথ বিদ্যাবাচস্পতি—শঙ্করের পরলোকের পর তদীয় পুত্র শিবনাথ পিতৃপদ প্রাপ্ত হন। কথিত আছে শঙ্কর তর্কবাগীশের শ্রাদ্ধ বাসরে বঙ্গদেশীয় অনেক স্থলের অধ্যাপকগণ নিমন্ত্রিত হইরা শ্রাদ্ধ-সভায় সমবেত হন। বংশবাটী নিবাসী সুপ্রসিদ্ধ জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন এই সভায় আহুত হইয়াছিলেন। তিনি শঙ্কর তর্কবাগীশের অবর্ত্তমান-রূপ সুযোগ পাইয়া নৈয়ায়িক সমাজে প্রাধান্য লাভাশয়ে-এক পূর্ব্বপক্ষ করিলেন, উপস্থিত অধ্যাপকগণ কেহই তাহার উত্তরদানে সমর্থ হইলেন না। সুতরাং নবদ্বীপের গৌরব-লক্ষ্মী এই দিনই অন্তর্হিত হইবার উপক্রম হইল। এই সময়ে শিবনাথ দানোৎসর্গ করিতেছিলেন। এমন সময়ে শিবনাথের কোন আত্মীয় কহিলেন শিবনাথ! তোমার পিতৃ শ্রাদ্ধে বুঝি তোমার শ্রাদ্ধ পর্যন্ত হইয়া যায়। তখন শিবনাথ দানোৎসর্গ পরিত্যাগ করিয়া জগন্নাথের সম্মুখীন হইলেন। এবং তাঁহার পূর্ব্বপক্ষের যথাযথ সিদ্ধান্ত করিয়া দিলেন। জগন্নাথ উত্তর শ্রবণে আহ্লাদিত হইয়া কহিলেন, বৎস শিবনাথ! তোমার কিরূপ শিক্ষালাভ হইয়াছে তাহাই পরীক্ষা করিবার জন্যই আমি এই পূর্ব্বপক্ষে করিয়া-

ছিলাম। এক্ষণে আমি বুঝিলাম, যে তুমি তোমার পিতার উপযুক্ত পুত্র বট, তোমা হইতে নবদ্বীপের মান রক্ষা হইবে। শিবনাথ অতি অল্প বয়সেই কালগ্রাসে পতিত হন।

কাশীনাথ চূড়ামণি—শিবনাথের পর কাশীনাথ চূড়ামণি প্রধান নৈয়ায়িকের পদে অধিষ্ঠিত হন। কাশীনাথের পর 'দণ্ডী' নামে এক জন নৈয়ায়িক কিছু দিন ঐ পদ প্রাপ্ত হন। তদনন্তর সুপ্রসিদ্ধ গদাধর ভট্টাচার্য্যের অধস্তন পঞ্চম পুরুষ শ্রীরাম শিরোমণি প্রাধান্য লাভ করেন। এক্ষণে নবদ্বীপে কাশীনাথের বংশ নাই।

শ্রীরাম শিরোমণি—এই সময়ে নবদ্বীপে শ্রীরাম শিরোমণি ও মাধব তর্কসিদ্ধান্ত এই দুই জন প্রধান নৈয়ায়িক ছিলেন। মাধব তর্কসিদ্ধান্ত তৎকালে নলডাঙ্গার রাজার সভাসদ থাকিয়া তথায় অধ্যাপনা করাইতেন। তিনি বিচার সভায় নির্দ্দিষ্ট সময়ে উপস্থিত হইতে না পারায় শ্রীরাম শিরোমণিই প্রাধান্যপদ প্রাপ্তহন। আলোকনাথ ও গোলকনাথ ন্যায়রত্ন নামে শ্রীরাম শিরোমণির প্রধান দুই ছাত্র ছিলেন। গোলকনাথ ন্যায়শাস্ত্রে এক জন অসাধারণ পণ্ডিত হইয়া উঠিয়া ছিলেন। দুঃখের বিষয় এই যে ৪৮ বৎসর বয়সে ১৮৫৪ খৃষ্টীয় অব্দে সেই নবীন নৈয়ায়িক ইহলোক পরিত্যাগ করেন।

মাধবচন্দ্র তর্কসিদ্ধান্ত—শ্রীরাম শিরোমণির প্রাধান্যের পর মাধবচন্দ্র নবদ্বীপেই চতুষ্পাঠী করেন। তিনি অতি শান্ত ও গম্ভীর প্রকৃতির লোক ছিলেন। ন্যায়শাস্ত্রে তাঁহার প্রগাঢ় জ্ঞান ছিল। তিনি শিরোমণিকৃত পদার্থতত্ত্বের

'সুবোধা' নামে এক টীকা করেন। খণ্ডনের যে কএকখানি টীকা আছে 'সুবোধা' তাহাদের কাহারও অপেক্ষা নিকৃষ্ট নহে। মাধব 'সুবোধা' নামক ভাষ্যে লিখিয়াছেন——

দেবং তমেব প্রণিপত্য পদার্থতত্ত্বে।
শ্রীমাধবো বিতনুতে বিবৃতিং সুবোধাং॥

হরমোহন চূড়ামণি—শ্রীরাম শিরোমণির মৃত্যুর পর তদীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র হরমোহন চূড়ামণি প্রাধান্য পদ প্রাপ্ত হন। এই সময়ে মাধব তর্কসিদ্ধান্ত ও প্রসন্নতর্করত্ন বর্ত্তমান ছিলেন। মাধব প্রাধান্যের বাসনা না করায় হরমোহন ঐ পদ প্রাপ্ত হন। হরমোহন, জগদীশতর্কালঙ্কার প্রণীত অনুমান খণ্ডের সামান্য লক্ষণা পরিচ্ছেদের 'সামান্য লক্ষণা ব্যাখ্যা' নামে একখানি টীকা করিয়া স্বীয় বংশগৌরব রক্ষা করিয়া গিয়াছেন। ঐ গ্রন্থের প্রারম্ভে লিখিত আছে।

যথা——

শ্রীরামমিব মত্তাতং শ্রীরামং পুরুষোত্তমং
শিরোমণি তন্নাখ্যাতং বন্দেঽহমতি যত্নতঃ।
সামান্যলক্ষণাব্যাখ্যা, জগদীশেন যা কৃতা
তাং টীপ্পনীং শ্রিয়াযুক্ত স্তনুতে হরমোহনঃ॥

উক্ত পুস্তক ১৭৮৫ শকে বা ১৮৬৩ খৃষ্টীয় অব্দে লিখিত হয়।

রম্যং শ্রীহরমোহন দ্বিজ ইহচ্ছাত্রেচ্ছয়োবেত্যাহং।
শাকে বাণ বসুদধীন্দু বিমিতেঽব্দঃ পুস্তকং নির্ম্মমে॥

প্রসন্ন তর্করত্ন এক জন প্রধান নৈয়ায়িক ছিলেন। বাবুলাল নামক জনৈক ধনাঢ্য মাড়ওয়ারীর অর্থ সাহায্যে

তাঁহার বর্ত্তমান পাকাটোল প্রস্তুত হয়। বাবুলাল কেবল টোল করিয়া দিয়াছেন এমন নহে, তিনি ঐ টোলের ছাত্রদিগের আহারেরও ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন। হরমোহনের মৃত্যুকালে প্রসন্নতর্করত্ন ও গোলকনাথের পুত্র হরিনাথ তর্কসিদ্ধান্ত প্রধান নৈয়ায়িক ছিলেন। হরিনাথ মূলাজোড়ের সংস্কৃত কালেজে ন্যায়াধ্যাপকের পদে নিযুক্ত থাকায় প্রাধান্য পদের অনধিকারী হন। তিনি গদাধরের কৃত মুক্তিবাদের একখানি অতি উৎকৃষ্ট টীকা করিয়াছেন। আজ প্রায় ১০। ১২ বৎসর হইল তিনি উক্ত মূলাজোড়ের চাকরী পরিত্যাগ করিয়া নবদ্বীপে চতুষ্পাঠী করেন। তাঁহার শিক্ষার গুণে তাঁহার টোলে অনেক জন ছাত্র হইয়াছিল। আজ প্রায় ৩। ৪ বৎসর হইল তিনি কালগ্রাসে পতিত হইয়াছেন মৃত্যু সময়ে তাঁহার টোলে ৭৫ জন ছাত্র ছিল। প্রায় বিশ বৎসরের মধ্যে নবদ্বীপের কাহার টোলে এত অধিক ছাত্রের সমাগম দেখিতে পাওয়া যায় নাই। হরিনাথ শেষ সময়ে মূল গৌতম সূত্রের টীকা করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি কালগ্রাসে পতিত হওয়ায় তাঁহার আরব্ধ কার্য্য অসম্পূর্ণই রহিয়া গেল। তাঁহার তিন পুত্রের মধ্যে মধ্যম পুত্র সর্ব্বেশ্বর ন্যায়াধ্যয়ন করিতেছেন।

হরমোহনের মৃত্যুর পর তদীয় সহোদর মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত ভুবনমোহন বিদ্যারত্ন তৎপদ পরিশোভিত করিতেছেন।

দশম পরিচ্ছেদ।

স্মৃতি বা ধর্ম্মশাস্ত্র।

ধর্ম্মশাস্ত্রসকল ঋষি প্রণীত। মনু, যাজ্ঞবল্ক্য, প্রভৃতি গ্রন্থ, আধুনিক ধর্ম্মশাস্ত্রের মূল। ঐ সকল গ্রন্থ স্মৃতি বলিয়া প্রসিদ্ধ। স্মৃতি শাস্ত্র কত আছে তাহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতায় উনবিংশ জন স্মৃতিকার ঋষির উল্লেখ আছে——

"মন্বত্রি বিষ্ণুহারীত যাজ্ঞবল্ক্যোশনাঙ্গিরাঃ।
যমাপস্তম্ব সম্বর্ত্তাঃ কাত্যায়ন বৃহস্পতী॥
পরাশরব্যাসশঙ্খলিখিতা দক্ষগৌতমৌ।
সাতাতপোবশিষ্ঠশ্চ ধর্ম্মশাস্ত্রপ্রয়োজকাঃ॥

অর্থাৎ—মনু, অত্রি, বিষ্ণু, হারিত, যাজ্ঞবল্ক্য, উশনা, অঙ্গিরা যম, আপস্তম্ব, সম্বর্ত্ত, কাত্যায়ন, বৃহস্পতি, পরাশর, ব্যাস শঙ্খলিখিত, দক্ষ, গৌতম, সাতাতপ, ও বশিষ্ঠ।

এই সকল স্মৃতিকার ঋষিদিগের মধ্যে পরস্পর ভিন্ন সম্প্রদায় ও মত ভেদ ছিল। সুতরাং ঐ সকল গ্রন্থেও বিরুদ্ধ মত লক্ষিত হয়। ঐ সকল স্মৃতি পাঠ করিলে কোন্ মত ভ্রান্ত ও কোন্ মত, অভ্রান্ত তাহা জানা যায় না। বিশেষত হিন্দুগণ ঐ সকল স্মৃতি বেদ মূলক বলিয়া বিশ্বাস করেন। স্মৃতিকর্ত্তাদিগের মধ্যে যতই কেন মত দ্বৈধ থাকুক না হিন্দুরা

সকল মতই প্রামাণিক ও অভ্রান্ত বলিয়া স্বীকার করিয়া থাকেন, এবং ব্যাখ্যার ইতর বিশেষ করিয়া বিরোধ ভঙ্গ পূর্ব্বক একবাক্যতা করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। এই কারণেই মীমাংসা গ্রন্থের সৃষ্টি। ঐ মীমাংসকদিগের মধ্যে মেধাতিথি, বিজ্ঞানেশ্বর, কুল্লুকভট, বাচস্পতি মিশ্র ও রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য প্রধান।

মেধাতিথি—মেধাতিথি খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীতে মিথিলায় প্রাদুর্ভূত হন। মনুসংহিতার টীকাই তাঁহার প্রধান গ্রন্থ। তিনি কেবল মনুসংহিতার টীকা করিয়াছেন এমন নহে, অন্যান্য ধর্ম্মশাস্ত্রের বচন প্রমাণ-স্বরূপ উদ্ধৃত করিয়া পরস্পর বিরোধও নিরাস করিয়াছেন।

বিজ্ঞানেশ্বর—খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর শেষভাগে প্রাদুর্ভূত হন। তিনি মধ্য ভারতবর্ষের অন্তর্গত কল্যাণ নামক নগরের রাজা বিক্রমের মন্ত্রী ছিলেন। তৎসংগৃহীত মিতাক্ষরার মত এক্ষণে বঙ্গদেশ ব্যতীত সমস্ত ভারতে প্রামাণিক বলিয়া গৃহীত হইয়া থাকে। মিতাক্ষরার ন্যায় কোন গ্রন্থ ভারতে লব্ধপ্রতিষ্ঠ ও প্রচলিত হয় নাই। বর্ত্তমান শতাব্দীর প্রারম্ভে কলিকাতার সদর আদালতের অন্যতম বিচারক কোলব্রুক সাহেব মিতাক্ষরা ইংরেজীতে অনুবাদ করিয়াছেন।

কুল্লুকভট্ট—ইনি বঙ্গদেশবাসী ছিলেন। গৌড়-নগরের নিকট নন্দনপুর ইহার নিবাসভূমি। ইঁহার পিতার নাম দিবাকর ভট্ট। ইনি বারেন্দ্র শ্রেণীয় ব্রাহ্মণ ছিলেন। কুল্লুক ভট্ট কাশীতে অধ্যয়ন করেন। ইনি 'মন্বর্থমুক্তাবলী'

নামে মনুসংহিতার এক উৎকৃষ্ট টীকা করিয়াছেন। ইনি খৃষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে বর্ত্তমান ছিলেন। তৎকৃত মনুসংহিতার টীকায় তাঁহার এইরূপ পরিচয় আছে—

গৌড়ে নন্দনবাসিনাম্নি সুজনৈর্বন্দ্যেবরেন্দ্র্যাং কুলে।
শ্রীমদ্ভট্ট দিবাকরস্য তনয়ঃ কুল্লুকভট্টোভবৎ॥

বাচস্পতি মিশ্র—খৃষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীর শেষ ভাগে মিথিলা প্রদেশে জন্মগ্রহণ করেন। তৎপ্রণীত 'বিবাদ চিন্তামণি' অন্যান্য গ্রন্থ অপেক্ষা আদৃত। বঙ্গদেশেও বাচস্পতি মিশ্রের মত কিয়দংশে প্রচলিত ছিল। এক্ষণে মিথিলা প্রদেশে শিমুল নামক স্থানে বাচস্পতি মিশ্রের বংশাবলী বর্ত্তমান আছেন।

জীমূতবাহন—খৃষ্টীয় শাব্দের চতুর্দ্দশ শতাব্দীর শেষ ভাগে জীমূত বাহন বঙ্গদেশে প্রাদুর্ভূত হন। তিনি যেরূপ আত্ম পরিচয় দিয়াছেন তাহাতে অনেকে তাঁহাকে রাঢ়ী শ্রেণীর শ্রোত্রিয় কুলোদ্ভব বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। তৎসংগৃহীত স্মৃতি সংগ্রহের নাম 'ধর্ম্মরত্ন'। কিন্তু দায়ভাগ সম্বন্ধেই জীমূতবাহনের মত বঙ্গদেশে বিশেষ আদৃত। আচার ব্যবহারাদি বিষয়ে তিনি তাদৃশ কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই।

শ্রীনাথ-আচার্য্য চুড়ামণি—খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে নবদ্বীপে বর্ত্তমান ছিলেন। ইঁহার পিতার নাম শ্রীকরাচার্য্য। পিতা ও পুত্র উভয়েই পরম পণ্ডিত ছিলেন। শ্রীনাথ মীমাংসা সম্বন্ধে অনেকগুলি গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন। ঐ সকল গ্রন্থের সাধারণ নাম 'তত্ত্বার্ণব'।

তিনি জীমূতবাহনকৃত দায়ভাগের 'দায়তত্ত্বার্ণব' নামে টীকা সর্ব্ব প্রথম প্রকাশ করেন। তদ্‌ভিন্ন 'কৃত্যতত্ত্বার্ণব' 'উদ্‌বাহ তত্ত্বার্ণব' প্রভৃতি অনেকগুলি গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া যশস্বী হইয়া গিয়াছেন।

এই সকল মীমাংসকদিগের মতানুসারেই তৎকালে বঙ্গীয় হিন্দুগণের হিন্দুধর্ম্মের কার্য্যগুলি অনুষ্ঠীত হইত। কিন্তু দায়ভাগের ন্যায় কোন বিষয়ে কোন এক জনের মত বিশেষ আদৃত বা সম্মানিত ছিল না। ইহাতে সমাজে ধর্ম্মাচরণের বিশেষ বিশৃঙ্খলা ঘটীয়াছিল। পরে যে মহামহোপাধ্যায়ের মীমাংসা গ্রন্থ প্রচারিত হইলে বঙ্গদেশ হইতে ঐ সকল মত তিরোহিত হইয়া একমত স্থাপিত হয়,তাঁহার নাম রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য। তিনিই স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য বলিয়া বিখ্যাত হন।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

রঘুনন্দন স্মার্ত্তভট্টাচার্য্য।

স্মৃতির প্রাধান্য-স্থাপন।

রঘুনন্দন খৃষ্টীয় শাকের ষোড়ষ শতাব্দীর প্রথমভাগে নবদ্বীপে জন্মগ্রহণ করেন। তৎসংগৃহীত জ্যোতিষতত্ত্ব নামক গ্রন্থের রবিসংক্রান্তি গনণায় উল্লিখিত আছে——

"নবাষ্ট শক্রহীনেন শকাব্দাঙ্কেন পূরিতা"

অর্থাৎ ১৪৮৯ শকাঙ্কেতে পূরণ করিবে।

এতদ্বারা ঐ শাকে তাঁহার জ্যোতিষতত্ত্ব গ্রন্থ সংগৃহীত হয়, তাহার প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। জ্যোতিষতত্ত্ব তাঁহার শেষ সময়ের গ্রন্থ বলিয়া সকলে অনুমান করেন। এক্ষণে ঐ খানি যদি আমরা তাঁহার ৬০ বৎসর বয়সের গ্রন্থ অনুমান করি, তাহা হইলে আমরা তাঁহার জন্মকাল ১৪২৯ শাকে বলিতে পারি। অতএব চৈতন্যদেবের জন্মের প্রায় ২০।২২ বৎসর পরে রঘুনন্দনের জন্ম অনুভূত হয়।

রঘুনন্দনের সময়নিরূপণ সম্বন্ধে তদীয় গ্রন্থ হইতে আরও প্রমাণ পাওয়া যায়। রঘুনন্দন একাদশীতত্ত্বে, বিষ্ণুপূজা পদ্ধতিতে এবং আহ্নিকতত্ত্বে 'হরিভক্তিবিলাস" গ্রন্থের উল্লেখ করিয়াছেন। অতএব রঘুনন্দনের উক্ত সংগৃহীত গ্রন্থ, যে হরিভক্তি গ্রন্থের পরে হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই।

এক্ষণে ঐ হরিভক্তিগ্রন্থের কাল নিরূপণ করিতে পারিলে স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্যের কাল নিরূপণ করা সহজ হইবে। সনাতন গোস্বামী ভাগবত গ্রন্থের দশম স্কন্দের এক টীকা রচনা করেন। ঐ টীকার নাম বৃহতবৈষ্ণবতোষিণী। ঐ টীকা ১৪৭৬ শাকে সমাপ্ত হয়, তাহা তদ্‌গ্রন্থেই বিবৃত আছে——

'শাকে ষট সপ্ততি মনৌ পূর্ণেয়া টীপ্পনীশুভা।'

আবার সনাতন গোস্বামীকৃত ঐ বৃহৎবৈষ্ণবতোষিণী গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ের ৪র্থ শ্লোকের টীকায় তিনি বলিয়াছেন—"অস্মদ্ভগবদ্ভক্তিবিলাসটীকায়াং কথামাহাত্ম্যে বিস্তারিত মেবাস্তি অর্থাৎ—এতদ্‌ব্যতীত বিশেষ-ব্যাখ্যা ভগবৎ-ভক্তিবিলাসের টীকায় বিশেষরূপে করা হইয়াছে ইত্যাদি।" অতএব স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য, যে গ্রন্থে হরিভক্তি গ্রন্থের উল্লেখ করিয়াছেন, তাঁহার সেই গ্রন্থ তাহার পরে, অর্থাৎ ১৪৭৬ শাকের পরে হইয়াছে বলিতে হয়। তাহাহইলে স্মার্ত্ত সম্বন্ধে উপরে যে সময় নির্দ্দেশ হইল তাহাই প্রকৃত সময় বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে।

রঘুনন্দনেরপিতার নাম হরিহর বন্দ্যোপাধ্যায় ভট্টাচার্য্য। তিনিও নবদ্বীপে একজন স্মার্ত্তপণ্ডিত ছিলেন। নবদ্বীপে তাঁহার স্মৃতির টোল ছিল। 'সময়প্রদীপ' নামক স্মৃতি গ্রন্থ ইঁহারই প্রণীত বলিয়া প্রসিদ্ধ। হরিহরের দুই পুত্র। জ্যেষ্ঠের নাম রঘুনন্দন, কনিষ্ঠের নাম যদুনন্দন। যদুনন্দন বাল্যকালেই কালগ্রাসে পতিত হন।

রঘুনন্দন অতি শান্তস্বভাব ও ধীরপ্রকৃতি ছিলেন।

কথিত আছে, হরিহরকে তাঁহার পুত্রের অসদাচরণ জন্য কখন কোন অভিযোগ শ্রবণ করিতে হয় নাই। রঘুনন্দন যেমন শান্ত ছিলেন, লেখাপড়াতেও তাঁহার তেমনি মনোযোগ ছিল। তিনি পাঠশালার পাঠ শেষ করিয়া, ব্যাকরণ ও অভিধান ও কাব্যাদি অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন। অল্পকালের মধ্যেই সংস্কৃত ভাষায় তাঁহার বিলক্ষণ অধিকার জন্মিল। তিনি পঠদ্দশাতেই নব নব ভাবপূর্ণ কবিতা লিখিয়া সহাধ্যায়ীদিগের নিকট এবং অধ্যাপকের নিকট বিশেষ আদৃত হইতে লাগিলেন। এবং তিনি যে ভবিষ্যতে একজন প্রধান লোক হইবেন, তাহা এই সময় হইতেই অনেকে বুঝিতে পারিয়া ছিলেন।

হরিহর কুলীন ছিলেন। কুলীনদিগের মধ্যে বাল্যবিবাহ ও বহুবিবাহ তৎকালে অতিশয় প্রবল ছিল। কিন্তু হরিহর এই উভয়েরই বিরোধী ছিলেন। তিনি পুত্রের কাব্যাদি পাঠ শেষ হইলে, অন্তত ২০ বৎসর বয়সে নবদ্বীপেই পুত্রের বিবাহ দেন। এই বিবাহের পরই রঘুনন্দন পিতার নিকট স্মৃতি অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হন। পিতার নিকট কিছু দিন পড়িয়া তিনি সুপ্রসিদ্ধ অধ্যাপক শ্রীনাথ আচার্য্য চূড়ামণির নিকট অধ্যয়ন করেন। কথিত আছে তিনি বাসুদেবের নিকট ও পড়িয়াছিলেন।

রঘুনন্দনের সময় বঙ্গের সমৃদ্ধির সময়, মহাত্মা চৈতন্যদেব এই সময়ে ধর্ম্মপথের পথিক হইয়া সনাতন সত্যধর্ম্মের যথার্থ মর্ম্মোদ্ভেদ করিয়া সর্ব্ব বর্ণের লোকদিগকে ধর্ম্মপথের পথিক করিতেছেন। এবং তর্ককেশরী রঘুনাথ শিরোমণি স্বীয়

অসাধারণ তর্কশক্তি প্রভাবে মিথিলার গর্ব্ব খর্ব্ব করিয়া ন্যায়ের নূতনরূপ ব্যাখ্যা আবিষ্কার করিয়া সর্ব্বোচ্চ আসনে আসীন হইয়াছেন। সুতরাং রঘুনন্দন স্বীয় প্রধান্য লাভাশয়ে ধর্ম্মশাস্ত্রের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। বাস্তবিক সহাধ্যায়ী বা সমসাময়িক ব্যক্তিগণের মধ্যে কাহাকেও কোন বিষয়ে প্রাধান্যলাভ করিতে দেখিলে বুদ্ধিমান ও উচ্চাভিলাসী ছাত্রগণের মনে ঈর্ষা জন্মে এবং অন্য বিষয়ে প্রধান্যলাভের চেষ্টা তাঁহাদিগের মনে সতই উদিত হইয়া থাকে।

এই সময়ে বঙ্গের সিংহাসনে মুসলমান ভূপতি সয়াদ্ হোসেন সা উপবিষ্ট ছিলেন। তিনি দীল্লির অধীনতা অস্বীকার করিয়া স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিতেছিলেন। এই মুসলমান দিগের রাজ্যকাল প্রায় চারিশত বৎসর অতীত হইয়াছে। তাঁহাদের এই দীর্ঘ অধিকারকালে হিন্দুদিগের আচার, ব্যবহার, রীতি, নীতি, অনেক পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, হিন্দু-ধর্ম্মের জ্যোতি দিন দিন মলিন হইয়া আসিতেছে। যবন-দিগের সংসর্গে জাতি ভেদের বন্ধন অনেক শিথিল হইয়া পড়িয়াছে। আহার সম্বন্ধেও অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে। ব্রাহ্মণ ও শূদ্রদিগের মধ্যে যে বৈষম্য ছিল তাহারও অনেক হ্রাস হইয়াছে। অনেক হিন্দু, প্রকাশ্যে মুসলমান-ধর্ম্ম গ্রহণ করিতেছে। এই মুসলমানদিগের শাসনে—হিন্দুসমাজ নিতান্ত ক্ষুণ্ণবল হইয়া পড়িয়াছে। সুতরাং এই সময়ে হিন্দু-সমাজের ব্যবস্থা পরিবর্ত্তন হওয়া আবশ্যক হইয়াছিল। সূক্ষ্মদর্শী রঘুনন্দন তাহা বুঝিয়াছিলেন।

রঘুনন্দন পঠদ্দশাতেই দেখিলেন যে প্রাচীন ধর্ম্মশাস্ত্রে

নানা মুনির নানা মত, এবং নব্য স্মৃতিসংগ্রাহকগণও তাহার প্রকৃত সামঞ্জস্য করিতে পারেন নাই। ঐ সকল প্রাচীন ও নব্য স্মৃতিকারদিগের মতের সামঞ্জস্য করিয়া সময়োপযোগী করিতে না পারিলে ধর্ম্মাচরণ করা নিতান্তই কঠিন হইবে। আরও তৎকালে সমাজেও ধর্ম্মাচরণের অত্যন্ত বিশৃঙ্খলা ঘটিয়াছে। তিনি দেখিলেন হিন্দুসমাজের অবস্থা যেরূপ দাড়াইয়াছে তাহাতে ধর্ম্মশাসনে শাসিত করা নিতান্ত কঠিন ব্যাপার। তিনি সমাজবন্ধন শিথিলকরণজন্য ধর্ম্মশাস্ত্রেরনূতন টীকা করিতে কৃতসংকল্প হইলেন।

রঘুনন্দন স্মৃতি সংগ্রহ করিতে আরম্ভ করিয়া প্রথমেই মলমাসতত্ত্ব সংগ্রহ করেন। এবং এই গ্রন্থের প্রথমেই তিনি যে যে গ্রন্থ করিয়াছেন তাহাও নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

"মলিম্লুচে দায়ভাগে, সংস্কারে শুদ্ধি নির্ণয়ে।
প্রায়শ্চিত্তে বিবাহেচ তিথৌ জন্মাষ্টমীব্রতে॥
দুর্গোৎসবে ব্যবহৃতাবেকাদশ্যাদি নির্ণয়ে।
তড়াগ ভবনোৎসর্গে বৃষোৎসর্গ ত্রয়েব্রতে।
প্রতিষ্ঠায়াং পরীক্ষায়াংজ্যোতিষে বাস্তুযজ্ঞকে।
দীক্ষাযামাহ্নিকে কৃত্যে ক্ষেত্রে, শ্রীপুরুষোত্তমে॥
সামশ্রাদ্ধে যজুঃশ্রাদ্ধে শূদ্রকৃত্য বিচারণে।
ইত্যষ্টাবিংশতি স্থানে তত্ত্বং বক্ষ্যামি যত্নতঃ।

অর্থাৎ মলমাস (মলিম্লুচ), দায়, সংস্কার, শুদ্ধি, প্রায়শ্চিত্ত, উদ্‌বাহ, তিথি, জন্মাষ্টমী, দুর্গোৎসব, ব্যবহার, একাদশী, জলাশয়োৎসর্গ, ঋকৃবেদীয়, সামবেদীয়, যজুঃবেদীয় বৃষোৎসর্গ-শ্রাদ্ধ, ব্রত, দেবপ্রতিষ্ঠা, পরীক্ষা, জ্যোতিষ, বাস্তুযাগ, দীক্ষা,

আহ্নিক, কৃত্য, শ্রীপুরুষোত্তম, শূদ্রকৃত্য মঠপ্রতিষ্ঠা, সমস্ত স্মৃতিকে এই অষ্টাবিংশতিতত্ত্বে বিভক্ত করেন। এই অষ্টাবিংশতি স্মৃতিতত্ত্ব সমাপ্ত করিতে তাঁহার ন্যূনাধিক ২৫ বৎসরকাল পরিশ্রম করিতে হয়। এই দীর্ঘ কালের মধ্যে তিনি কেবল গ্রন্থ পড়িয়াই স্বীয় মত স্থাপন করেন নাই। তিনি মিথিলা কাশী প্রভৃতি ভারতের নানাস্থানে পরিভ্রমণ ও তদ্দেশীয় আচার ব্যবহার রীতি নীতি পর্য্যবেক্ষণ পূর্ব্বক তদ্দেশবাসী অধ্যাপকদিগের সহিত বিচার করিয়া স্বীয় মত সংস্থাপন করিয়া গিয়াছেন।

এই অষ্টাবিংশতি স্মৃতিতত্ত্বে হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী ব্যক্তি মাত্রেরই জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত যাহা কিছু কর্ত্তব্য আছে তাহা উত্তম রূপে লিখিত হইয়াছে। তিনি ঐ সকল গ্রন্থ সংগ্রহ করিবার সময়ে পরস্পর বিরুদ্ধ মতের একবাক্যতা করিবার জন্য শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ, তন্ত্র আদি নানা শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া প্রমাণ উদ্ধৃত করত ধর্ম্মশাস্ত্রের বিধি সমুদয় নিরূপণ করিয়াছেন এবং কোন স্থলে বা প্রাচীন গ্রন্থের মত খণ্ডন করিয়া কোথাও বা গ্রন্থ বিশেষের মত উদ্ধৃত করিয়া স্বমতের সাধন দিয়াছেন, এবং কোথাও বা শ্রুতি ও স্মৃতির ভিন্নরূপ ব্যাখ্যা করিয়া বিরোধ ভঞ্জন করিয়াছেন। এই সকল গ্রন্থে তিনি অসামান্য বুদ্ধিমত্তা, ও মীমাংসকতা এবং কি সার গ্রাহিতা ও দূরদর্শিতার পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। ফলে ভিন্ন ভিন্নমুনিমতের বিরোধ সামঞ্জস্য করিতে হইলে, যে এক অসাধারণ ক্ষমতাও বিচারশক্তির আবশ্যকতা হয়, এই গ্রন্থে তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যায়।

জীমূতবাহন দায়ভাগ সম্বন্ধে যেরূপ ভূয়োদর্শন ও ব্যুৎপত্তি দেখাইয়া গিয়াছেন, রঘুনন্দন ও আচার সম্বন্ধে তদপেক্ষা অধিকতর ক্ষমতা প্রকাশ করিয়াছেন। রঘুনন্দনের গ্রন্থে অধিকারী না হইলে আর কেহই স্মার্ত্ত নামের অধিকারী হইতে পারেন না। কিরূপে সাক্ষীকে পরীক্ষা করিতে হয়, কিরূপেই বা বিচার করিতে হয়, এবং অন্যান্য কর্ম্মচারীরই বা কিরূপ ব্যবহার করা উচিত ব্যবহারতত্ত্বে তৎসমুদয় সূক্ষ্মরূপে আলোচিত হইয়াছে।

রঘুনন্দের ঐ সকল গ্রন্থ সংগ্রহে তৎকাল প্রচলিত আচার ব্যবহার কোন কোন বিষয়ে পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল। এইরূপে পরিবর্ত্তন হওয়ায় নবদ্বীপের ও অন্যান্য স্থানের অধ্যাপকগণ তাঁহার মতের প্রতিবাদ করিয়া বিচারার্থী হন, কিন্তু রঘুনন্দন এমন দৃঢ়তা সহকারে আত্মপক্ষ সমর্থন করিতে লাগিলেন যে পরিশেষে তাঁহার বিরোধীগণ সকলেই তাঁহার মতাবলম্বী হইলেন। ইহাতে অল্পকাল মধ্যেই তাঁহার যশোরাশি চতুর্দ্দিকে প্রক্ষিপ্ত হইয়া পড়িল, দিন দিন তাঁহার টোলে ছাত্র প্রবিষ্ট হইতে লাগিল। তাঁহার সুশিক্ষার গুণে ছাত্রেরা তাঁহার প্রতি ভক্তিমান হইতে লাগিলেন। অধ্যাপকের প্রতি ভক্তি বশত ছাত্রগণ যখন অধ্যাপনা কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন তখনগুরুর গ্রন্থ হইতে আপন-আপন ছাত্রদিগকে শিক্ষা দিতে লাগিলেন। অল্পকাল মধ্যে তাঁহার ছাত্রমণ্ডলীর দ্বারা বঙ্গভূমির চারিদিকে তাঁহার মত প্রচারিত হইয়া পড়িল। এইরূপে রঘুনন্দনের স্মৃতিতত্ত্ব, প্রাচীন স্মার্ত্তগণের গ্রন্থ অবলম্বনে রচিত হইয়া, তাঁহাদের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা বিলুপ্ত করিয়া, সমস্ত বঙ্গদেশে

আপন প্রধান্ত প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল। বঙ্গদেশের এমন ব্রাহ্মণ পণ্ডিত নাই, যাঁহার গৃহে দুই চারিখানি স্মৃতিতত্ত্ব না পাওয়া যায়।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, রঘুনন্দনের স্মৃতি প্রচারিত হইলে হিন্দুসমাজের প্রাচীন রীতি নীতি অনেক পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। হিন্দুধর্ম্মশাস্ত্র মতে ব্রাহ্মণদিগের সিদ্ধচাউল, মৎস্য এবং মশুরডাউল ইত্যাদি আহার করা নিষেধ আছে। কিন্তু এই সময়ে অনেক ব্রাহ্মণ গোপনে সিদ্ধচাউল ও মশুরডাউল ইত্যাদি ভক্ষণ করিতেন। রঘুনন্দন ইহা দেখিয়া উহা ব্রাহ্মণেরা ব্যবহার করিতে পারেন, এমন ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। তদবধি ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে সিদ্ধ চাউল ও মশুরডাউল ব্যবহার হইয়া আসিয়াছে। অদ্যাপি এমন ব্রাহ্মণও আছেন যাঁহারা সিদ্ধচাউল ও মৎস্য এবং মশুর ডাউল স্পর্শও করেন না।

হিন্দুগণ অতিশয় ধর্ম্মভীত। তজ্জন্য প্রাচীন ঋষিগণ কি সাংসারিক, কি ব্যবহারিক সকল বিষয়ই ধর্ম্মের সহিত বিধিবদ্ধ করিয়া দিয়াছেন। মধ্যে মধ্যে আহার পরিবর্ত্তন ও উপবাস স্বাস্থ্যরক্ষার একটী প্রধান নিয়ম। তজ্জন্য আর্য্যঋষিগণ তিথি বিশেষে, বস্তু বিশেষের আহার নিষেধ করিয়া গিয়াছেন। পূর্ব্বে ঐ বিষয় স্বতন্ত্র আলোচিত না থাকায় ঐ নিয়ম প্রচারিত ছিল না। রঘুনন্দন তৎসমুদয় তিথি তত্ত্ব নামক গ্রন্থে বিশেষ করিয়া আলোচনা করিলেন। তদবধি ঐ নিয়ম সমাজে বহুলরূপে প্রচলিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে।

প্রাচীনমতে, যতক্ষণ একাদশী তিথি থাকিত ততক্ষণ

উপবাস করিলেই একাদশীপালন করা হইত। রঘুনন্দনের স্মৃতিতত্ত্ব প্রচারিত হইলে এই প্রথা রহিত হইয়া যায়। তিনি একাদশী সম্বন্ধে এরূপ নিয়ম করিয়াছেন যে সকলকেই একদিন উপবাস করিতে হইবে।

পূর্ব্বে নিয়ম ছিল যে বিধবাগণ অত্যন্ত অসুস্থ, রুগ্ন বা শৈশবাবস্থা হেতু একাদশীর উপবাস করিতে অসমর্থ হইলে তাহারা অনুকল্প করিতে পারিতেন। রঘুনন্দন হইতে এই প্রথা রহিত হইয়া যায়। রঘুনন্দন নানা শাস্ত্র হইতে বচন উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছেন যে, বিধবারা কোন প্রকারেই অনুকল্প করিতে পারেন না। একাদশী সম্বন্ধে সকল নিষেধই বিধবাদিগের প্রতিপাল্য। অনেকে বলেন যে রঘুনন্দন হইতেই বিধবাদিগের একাদশীর অনুকল্প রহিত হইয়াছে। কিন্তু বিশিষ্টরূপে বিবেচনা করিয়া দেখিলে, বুঝা যায় যে তাহা নহে। তিনি নিজে কোন মত প্রচলিত করেন নাই। শাস্ত্রকারদিগের যাহা অভিপ্রায় তাহাই তিনি বিধিবদ্ধ করিয়াছেন। বরঞ্চ বিধবাদিগের মধ্যে যে অশাস্ত্রীয় ব্যবহার ছিল তাহাই রহিত করিয়াছেন।

রঘুনন্দনের স্মৃতিতত্ত্ব প্রকাশের পরেই তিনি পিতৃপুরুষদিগের শ্রাদ্ধাদি করিবার জন্য গয়াক্ষেত্রে যাত্রা করেন। তিনি গয়ায় উপস্থিত হইয়া পিণ্ডদান করণ জন্য মন্দিরে প্রবিষ্ট হইতে উদ্যত হইলে, মন্দিরাধ্যক্ষ পাণ্ডারা তাঁহার নিকট অসঙ্গত কর চাহেন। রঘুনন্দন তাহাতে অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া তৎক্ষণাৎ তথা হইতে চলিয়া যান, এবং এক ক্রোশ পরিমিত গয়াক্ষেত্রের পরিমাণ বলিয়া, তিনি প্রান্তরে গিয়া পিণ্ড দান

করিতে উদ্যত হইলেন। এদিকে পাণ্ডারা যখন শুনিলেন যে ইনি নবদ্বীপের ‘স্মার্ত্তভট্টাচার্য্য’, তখন তাঁহারা চমকিত ও মহাভীত হইয়া তাঁহাকে পুনরানয়ন জন্য তদুদ্দেশে যাত্রা করিলেন। তাঁহারা বুঝিয়াছিলেন যে, যদি রঘুনন্দন ঐরূপ স্থানে পিণ্ড দিয়া যান, তাহা হইলে আর কেহই মন্দিরে আসিয়া শ্রাদ্ধাদি করিবে না। অনন্তর তাঁহারা রঘুনন্দনকে অনেক স্তব ও স্তুতি করিয়া আনিয়া শ্রীমন্দিরে শ্রাদ্ধাদি করাইলেন। পাঠকগণ দেখুন! এখন রঘুনন্দনের মত কি, প্রবলরূপে প্রচারিত হইয়াছে। পাণ্ডারা বিবেচনা করিয়াছিলেন যে, রঘুনন্দন যাহা করিবেন তাহাই প্রচলিত হইবে। ইহা সামান্য ক্ষমতার পরিচায়ক নহে।

রঘুনন্দনের এই স্মৃতিতত্ত্ব প্রকাশিত হওয়ায় সংস্কৃত সাহিত্য জগতে আর এক মহৎ উপকার হইয়াছে।

হিন্দুদিগের অধিকারকালে ব্রাহ্মণেরাই কেবল মাত্র শাস্ত্র প্রণেতা ছিলেন। তাঁহারা ঐহিক ভোগাভিলাষ পরিত্যাগ করিয়া, আজীবন শাস্ত্রালোচনা করিয়া গিয়াছেন। হিন্দুরাজগণ তাঁহাদের আবশ্যকীয় ব্যয়ভার বহন করিয়া আসিতেন। তাঁহারও নিশ্চিন্ত থাকিয়া মানব সমাজের উপকারক নানা গ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন। বাস্তবিক এই প্রথা ছিল বলিয়া ব্রাহ্মণেরা সকল জাতীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ আসন পরিগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

এক্ষণে আর ব্রাহ্মণদিগের রাজ্য নাই। হিন্দু বিরোধী যবনেরা এক্ষণে রাজ্যের অধিপতি। ব্রাহ্মণদিগকে উৎসাহ দেওয়া দূরে থাকুক বরং যাহাতে তাঁহাদের অবনতি হয়

তাহারই চেষ্টা করিতেন। সংস্কৃত শাস্ত্রের আলোচনা দিন দিন ন্যূন হইয়া আসিয়াছিল। এবং অনেকেই অর্থকরী বিদ্যা, পার্শী শিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। এই সময়ে রঘুনন্দনের স্মৃতি প্রচারিত হওয়ায় সংস্কৃত শাস্ত্র ব্যবসায়ীদিগের আয়ের কিছু সংস্থান হইয়াছিল।

রঘুনন্দনের সংগ্রহ গ্রন্থের মধ্যে প্রায় সকলগুলিই বঙ্গদেশে প্রচলিত হইয়াছে; কেবল সংস্কারতত্ত্বের মধ্যে উপনয়ন বিধি প্রচলিত হয় নাই। তৎসম্বন্ধে একটী প্রবাদ প্রচলিত আছে। কথিত আছে রঘুনন্দন আপন পুত্রের উপনয়ন স্বমতে প্রদান করিয়াছিলেন। ঐ উপনয়নের পর তাঁহার পুত্র কোন কার্য্য উপলক্ষে রঘুনাথ শিরোমণিকে নিমন্ত্রণ করিতে গিয়া প্রথানুসারে তাঁহাকে নমস্কার করেন। কিন্তু শিরোমণি একটু চিন্তা করিয়া প্রতিনমস্কার করিলেন না। বালক দুঃখিত মনে পিতৃসন্নিধানে উপস্থিত হইয়া কহিলেন যে 'আমি জেঠা মহাশয়কে নমস্কার করিলাম, কিন্তু তিনি প্রতিনমস্কার করিলেন না'। রঘুনন্দন শুনিয়া দুঃখিত হইলেন। যথা সময়ে শিরোমণি উপস্থিত হইলে রঘুনন্দন তাঁহাকে প্রতিনমস্কার না করার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। তখন শিরোমণি কহিলেন—ভাই হে আমি বিবেচনা করিয়া দেখিলাম, তুমি যে মতে পুত্রের উপনয়ন দিয়াছ তাহাই যদি শাস্ত্রের প্রকৃত মত হয়, তাহাহইলে তোমার, তদনুসারে উপনয়ন না হওয়ায়, তুমি নিজে অব্রাহ্মণ রহিয়াছ। সুতরাং অব্রাহ্মণের ঔরষজাত সন্তানকে যদি শত গাছি যজ্ঞসূত্র দেওয়া যায়, তাহা হইলে ও সে কোন মতেই ব্রাহ্মণ বলিয়া গণ্য হইতে

পারিবে না। আর যদি তোমার মত যথার্থ শাস্ত্রসঙ্গত না হয়, তাহা হইলে তোমার পুত্রও এক্ষণে ব্রাহ্মণ হয়েন নাই। এইরূপ বিবেচনা করিয়াই আমি তোমার পুত্রকে প্রতি-নমস্কার করি নাই। তদবধি রঘুনন্দনের সংস্কারতত্ত্বের উপনয়ন প্রথা অপ্রচলিত হইল। এক্ষণে উপনয়ন প্রাচীন মতেই হইয়া থাকে।

রঘুনন্দন অষ্টাবিংশতি স্মৃতিতত্ত্ব ভিন্ন 'রাসযাত্রাপদ্ধতি', 'সংকল্প চন্দ্রিকা', ত্রিপুষ্করাশান্তিতত্ত্ব', ও 'দ্বাদশযাত্রাপ্রমাণ-তত্ত্ব' নামে কএকখানি স্মৃতি পুস্তক রচনা করিয়া গিয়াছেন।

রঘুনন্দন ঐ সকল পুস্তকে কি অসাধারণ পাণ্ডিত্য ও বিচার শক্তির এবং কি প্রগাঢ় যুক্তির ও সুক্ষ্মদর্শিতার পরিচয় দিয়া গিয়াছেন! তিনি কি শুভক্ষণেই বঙ্গভূমিতেজন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন! তাঁহার জন্ম গ্রহণে হিন্দু-সমাজে সুশৃঙ্খলা স্থাপিত হইয়াছিল এবং সংস্কৃত সাহিত্যের আলোচনার শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছিল। যত দিন পৃথিবীতে হিন্দুধর্ম্ম প্রচলিত থাকিবে, যত দিন পৃথিবীতে সংস্কৃত সাহিত্য বর্ত্তমান থাকিবে, ততদিন রঘুনন্দনের নাম কখনই বিলুপ্ত হইবার নহে। তিনি "স্মার্ত্তভট্টাচার্য্য" এই আখ্যায় আখ্যায়িত হইয়া অবিনশ্বর কীর্ত্তিরূপ শরীর পরিগ্রহপুর্ব্বক বঙ্গবাসীর হৃদয়ে বিরাজিত রহিয়াছেন। তিনি এইরূপ বিদ্যাবুদ্ধিসম্পন্ন হইয়া ও অহঙ্কৃত ছিলেন না। মলমাসতত্ত্বের শেষে বলিয়াছেন।

বিরুদ্ধং গুরুবাক্যস্য যদত্র ভাবিতং ময়া।
তৎক্ষন্তব্যং বুধৈরের স্মৃতিতত্ত্বং বুভুৎসয়া॥

এইরূপে রঘুনন্দন আজীবন শাস্ত্রালোচনায় থাকিয়া 'প্রায়

সপ্ততি বৎসর বয়ক্রমকালে কালকবলে পতিত হন। এক্ষণে নবদ্বীপে রঘুনন্দনের বংশ নাই।

কাশীরাম বাচস্পতি, ও শান্তিপুর নিবাসী অদ্বৈতের বংশীয় রাধামোহন গোস্বামী, এই অষ্টাবিংশতি তত্ত্বের দুই খানি টীকা করিয়াছেন। কাশীরাম আপনাকে সার্ব্বশাস্ত্র নিপুণ রামকৃষ্ণের পৌত্র ও রাধাবল্লভের পুত্র বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

অন্যান্য স্মৃতিগ্রন্থকারগণ।

রামভদ্র ন্যায়ালঙ্কার—রামভদ্র, শ্রীনাথ আচার্য্য চূড়ামণির পুত্র। ইনি রঘুনন্দনের সমসাময়িক লোক ছিলেন। ইনিও পিতার ন্যায় জীমূতবাহনকৃত দায়ভাগের 'দায়ভাগটীকা' ও 'সিদ্ধান্তকুমুদচন্দ্রিকা' নামে দুই খানি টীকা করিয়া গিয়াছেন। তিনি দায়ভাগের টীকায় লিখিয়াছেন—

আলোচ্যতাত নির্ম্মিত, নিবন্ধমারাধ্য বিশ্বেশ্বরং।
আচার্য্যাচার্য্যতনুজে বিবৃতি মিমাং দায়ভাগস্য॥

এতদ্ব্যতীত তিনি মহাকবি কালিদাসেরকৃত রঘুবংশ মহাকাব্যের 'বিদ্বন্মোদিনী' নাম্নী এবং অভিজ্ঞান শকুন্তলা

নাটকের 'শকুন্তলাবিবৃতি' নামে টীকা করিয়া পাণ্ডিত্যের যথেষ্ট পরিচয় রাখিয়া গিয়াছেন।

রামভদ্রের অনেকগুলি পুত্র ছিলেন। তন্মধ্যে তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র রামেশ্বর তান্ত্রিক দীক্ষাহোমাদি বিষয়ে "তন্ত্রপ্রমোদন" ও তাঁহার ষষ্ঠ পুত্র রঘুমণি 'আগমসার' নামে এক গ্রন্থ রচনা করিয়া স্বীয় বংশের গৌরব রক্ষা করিয়া গিয়াছেন। তদনন্তর এই বংশে আর কোন গ্রন্থকারের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না। এক্ষণে নবদ্বীপে রামভদ্রের বংশধর বর্ত্তমান আছেন। শ্রীপতি ভট্টাচার্য্য যিনি ডাক্তারী করিতেছেন তিনি এই রামভদ্রের বংশধর।

শ্রীকৃষ্ণ সার্ব্বভৌম—খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে শ্রীকৃষ্ণ সার্ব্বভৌম নবদ্বীপে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি স্মৃতিশাস্ত্রে একজন প্রধান পণ্ডিত ছিলেন। কাব্যশাস্ত্রেও তাঁহার বিশেষ পাণ্ডিত্য ছিল। ইহাঁর সময়ে কৃষ্ণনগরে মহারাজ রামজীবন রায় রাজত্ব করিতেছিলেন। রামজীবন মহারাজ রাঘবের পৌত্র ও রুদ্রের পুত্র। রামজীবন অতি ধার্ম্মিক ও অতিশয় বিদ্যানুরাগী ছিলেন। তিনি সর্ব্বদাই নবদ্বীপে আগমন করিয়া অধ্যাপকদিগের সহিত শাস্ত্রালাপে লিপ্ত থাকিতেন। কৃষ্ণনগর হইতে নবদ্বীপ পর্য্যন্ত যে পাকারাস্তা দৃষ্ট হয়, রামজীবন উহার উভয় পার্শ্ব বৃক্ষশ্রেণীর দ্বারা পরিশোভিত করেন। তজ্জন্য ঐ বৃক্ষশ্রেণী রামজীবনের সার বলিয়া প্রসিদ্ধ।

শ্রীকৃষ্ণ, রামজীবনের উৎসাহে এবং তাঁহার প্রীতির জন্য 'কৃষ্ণপদামৃত' ও 'পদাঙ্কদূত' নামে দুইখানি অতি সুন্দর কাব্য

রচনা করেন। এই উভয় গ্রন্থে কৃষ্ণলীলা বর্ণিত হইয়াছে। ঐ দুই পুস্তকে তাঁহার, কবিত্বের বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি পদাঙ্কদূতে এইরূপ পরিচয় দিয়াছেন——

শাকে নায়ক বেদ ষোড়শমিতে শ্রীকৃষ্ণ শর্ম্মাস্মরন্
আনন্দপ্রদনন্দনন্দন পদদ্বন্দ্বারবিন্দ হৃদি
চক্রে কৃষ্ণপদাঙ্কদূত বচনং বিদ্বন্ মনোরঞ্জনং
শ্রীল শ্রীযুত রামজীবন মহারাজাধিরাজাদৃতঃ।

এক্ষণে নবদ্বীপে শ্রীকৃষ্ণের বংশ নাই।

চন্দ্রশেখর বাচস্পতি——ইহার পর চন্দ্রশের বাচস্পতি প্রাদুর্ভূত হন। ইনি বারেন্দ্রশ্রেণীয় ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহার পিতা একজন ষড়দর্শনবেত্তা প্রসিদ্ধ দার্শনিক পণ্ডিত ছিলেন। চন্দ্রশেখর পিতার নিকট স্মৃতিশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া নবদ্বীপে একজন প্রধান পণ্ডিত হইয়া উঠেন। তিনি স্মৃতিশাস্ত্রীয় 'স্মৃতিপ্রদীপ', ও 'স্মৃতিসারসংগ্রহ' এবং 'সংকল্পদুর্গভঞ্জন' ও 'ধর্ম্মবিবেক', নামে চারিখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া স্বীয় পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। শেষোক্ত গ্রন্থদ্বয়ে তাহার এইরূপ পরিচয় পাওয়া যায়।

যথা——

সদানন্দ ময়ীং স্মৃত্বা চন্দ্রশেখর শর্ম্মণা।
বরেন্দ্রান্বয়সম্ভূত নবদ্বীপ নিবাসিনা॥
শ্রীকৃষ্ণ প্রীতয়ে গূঢ়শাস্ত্রার্থস্যাভিসন্দিতঃ।
স্মৃতিনাং ক্রিয়তে দুর্গভঞ্জনং বুধরঞ্জনং॥
বিদ্যাভূষণ-বিখ্যাতঃ ষড়দর্শন মতে সুধীঃ।
তৎ সুতস্তাদৃশোধীমাং স্ততোঽধীতি চ তৎসুতঃ॥

শ্রীচন্দ্রশেখরো নাম্না খ্যাতো বাচস্পতিঃ ক্ষিতৌ।
স্মৃতিনাঞ্চ প্রকাশার্থং তনোতীমাং প্রদীপিকাং॥

চন্দ্রশেখরের বংশ কেহ নবদ্বীপে আছেন কি না তাহা জানিবার উপায় নাই।

শ্রীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কার—ইনি অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে বর্ত্তমান ছিলেন। সুপ্রসিদ্ধ সংস্কৃত বেত্তা কোলব্রুক সাহেব বলিয়াছেন যে ১৮০৬ অব্দে শ্রীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কারের প্রপৌত্র বর্ত্তমান ছিলেন। কথিত আছে শ্রীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কারের আদি নিবাস মালদহ জেলায় ছিল। তিনি নবদ্বীপে স্মৃতি অধ্যয়নার্থ আগমন করেন। এবং পূর্ব্বস্থলী নামক গ্রামে বিবাহ করিয়া এই নবদ্বীপেই চতুষ্পাঠীকরত অধ্যাপনায় প্রবৃত্ত হয়েন। তিনি জীমূতবাহনকৃত দায়ভাগের 'টীকা' এবং 'দায়ক্রমসংগ্রহ' নামে দায়ভাগ সম্বন্ধীয় দুইখানি পুস্তক রচনা করিয়া বিশেষ সুখ্যাতি লাভ করিয়াছেন। দায়ভাগের যতগুলি টীকা হইয়াছে তন্মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের টীকা সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান। দায়াধিকারের প্রামাণিকতা সম্বন্ধে এই গ্রন্থ দায়ভাগের নিম্নতর আসন পরিগ্রহ করিয়াছে। সুপ্রসিদ্ধ কোলব্রুক সাহেব এই দায়ক্রমসংগ্রহ ইংরেজী ভাষায় অনুবাদ করিয়াছেন। দায়ভাগ সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণের মত ধর্ম্মাধিকরণে অতি সাদরে গৃহীত হইয়া থাকে। ইহাঁর পরবর্ত্তী অধ্যাপক সুপ্রসিদ্ধ গোপাল ন্যায়ালঙ্কারের সময় হইতে নবদ্বীপে শ্রীকৃষ্ণের পুস্তক অধীত হইতে আরম্ভ হইয়াছে।

ন্যায়শাস্ত্রে ও ইনি একজন প্রধান পণ্ডিত ছিলেন। ইনি সাহিত্যের লক্ষণ ও অর্থাদি বিষয়ে 'সাহিত্যবিচার' নামে এক ন্যায়গ্রন্থ রচনা করেন।

এক্ষণে শ্রীকৃষ্ণের আর বংশ নাই। অতি অল্প দিন হইল পূর্ব্বস্থলীতে তাঁহার বংশধর বর্ত্তমান ছিলেন।

গোপাল ন্যায়ালঙ্কার—খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে গোপাল নবদ্বীপে বৈদিক ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি রঘুনন্দনের প্রায় দুই শত বৎসর পরে প্রাদুর্ভূত হন। স্মৃতিশাস্ত্রে ইহার বিশেষ পাণ্ডিত্য ছিল। ইনি রঘুনন্দনের তত্ত্বের ন্যায় "নির্ণয়" নামক অনেকগুলি গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন। এই নির্ণয় সকলে প্রাচীন স্মৃতি ও নব্য মীমাংসকগণের মতামত অতি সুন্দররূপে বিচারিত হইয়াছে। তৎপ্রণীত 'প্রায়শ্চিত্ত' 'তিথি' 'দায়' 'কাল' 'সম্বন্ধ' 'শুদ্ধি' 'উদ্বাহ' 'আচার' 'বিচার' 'অধিকার' 'দুর্গোৎসব' 'সংক্রান্তি' আদি অনেক নির্ণয়গ্রন্থ প্রচলিত আছে।

এই সময়ে নবদ্বীপের মহারাজ সুপ্রসিদ্ধ কৃষ্ণচন্দ্র রায় কৃষ্ণনগরের সিংহাসনে উপবিষ্ট ছিলেন। গোপাল ন্যায়ালঙ্কার তাঁহার সভাসদ ছিলেন।

এই সময়ে ঢাকার নবাব রাজা রাজবল্লভের বালিকা কন্যা বিধবা হওয়ায় তিনি বিধবা বিবাহ প্রচলিত করিবার মানসে পূর্ব্বদেশীয় কতিপয় প্রধান প্রধান পণ্ডিতের ব্যবস্থা সংগ্রহ করেন। এবং ঐ ব্যবস্থায় নবদ্বীপ পণ্ডিতমণ্ডলীর স্বাক্ষর জন্য কতিপয় প্রধান পণ্ডিতকে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের নিকট প্রেরণ করেন। এই উপলক্ষে কৃষ্ণনগরে এক সভা আহূত হয়। ঐ সভায় গোপাল ন্যায়ালঙ্কার অতি সুন্দররূপে বিধবা বিবাহের অশাস্ত্রীয়তা, অপ্রশস্ততা এবং দেশাচার বিরুদ্ধতা প্রতিপন্ন করিয়া দেন। সুতরাং নবদ্বীপের পণ্ডিত

সমাজের অনুমোদিত না হওয়ায় বিধবা বিবাহ প্রচলিত হয় নাই।

গোপাল ন্যায়পঞ্চাননের সময়ে বঙ্গভূমি ইংরেজদিগের অধিকৃত হইয়াছিল। ইংরেজ রাজপুরুষগণ স্বহস্তে বিচার ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। উক্ত রাজপুরুষগণ তৎকালে হিন্দু ব্যবস্থায় নিতান্ত অজ্ঞ ছিলেন। এই জন্য তাঁহারা হিন্দু-অধ্যাপকদিগের নিকট ব্যবস্থা গ্রহণ করিতেন। গোপাল ন্যায়ালঙ্কার এইরূপ একজন ব্যবস্থাপক ছিলেন। তজ্জন্য তিনি গবর্ণমেণ্ট হইতে মাসিক বৃত্তি পাইতেন। গোপাল খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে পরলোক গমন করেন। কিন্তু তাঁহার বংশধরেরা পূর্ব্ব গৌরব রক্ষা করিতে লাগিলেন। সুপ্রসিদ্ধ দেবী তর্কালঙ্কার ও রামনাথ তর্কসিদ্ধান্ত এই বংশ সম্ভূত ছিলেন। এক্ষণে এই বংশীয় অনেকেই বর্ত্তমান আছেন। কিন্তু কেহই আর পূর্ব্বপুরুষগণের ন্যায় পাণ্ডিত্য প্রাপ্ত হন নাই।

বীরেশ্বর ন্যায়পঞ্চানন—ইনি গোপাল ন্যায়পঞ্চাননের সমসাময়িক ও স্মৃতি শাস্ত্রে এক জন অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন। ইনিও ইংরেজদিগকে শাস্ত্রীয় ব্যবস্থা দিয়া গবর্ণমেণ্ট হইতে মাসিক বৃত্তি পাইতেন। অদ্যাপি তাঁহার বংশধরেরা নবদ্বীপে বর্ত্তমান আছেন। অম্বিকা ভট্টাচার্য্য বীরেশ্বরের বংশীয় ছিলেন।

কথিত আছে বীরেশ্বর এক দিন তাঁহার ভৃত্যের উপর ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাকে একটী চড় মারেন। এক চড়েই উক্ত ভৃত্য পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়। তৎকালে ইংরেজ শাসনকর্ত্তাগণ

কেবল কর সংগ্রহের ভারই লইয়াছিলেন। দেওয়ানী ও ফৌজদারী বিচার দেশীয় জমীদারগণের হস্তেই ছিল। এই সময়ে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায় বর্ত্তমান ছিলেন। বিচারে ভট্টাচার্য্য অব্যাহতি পাইলেন বটে, কিন্তু মহারাজ কহিলেন ভট্টাচার্য্য মহাশয় আপনার কার্য্যটী দৈত্যের ন্যায় হইয়াছে। তদবধি উক্ত ভট্টাচার্য্য ও তদবংশীয়েরা 'দৈত্য' বলিয়া আখ্যাত হইয়াছেন।

রামানন্দ বাচস্পতি— ইনি ঐ সময়ের একজন প্রধান স্মার্ত্ত ছিলেন। ইনি 'আহ্নিক আচার' নামে এক স্মৃতিগ্রন্থ প্রণয়ন করেন। ইহাঁর বংশের পরিচয় পাওয়া যায় নাই।

রামানন্দের পর রামনাথতর্কসিদ্ধান্ত, কৃপারাম তর্কভূষণ লক্ষ্মীকান্ত ন্যায়ভূষণ, ও রামলোচন ন্যায়ভূষণ প্রভৃতি স্মার্ত্ত পণ্ডিতগণ বিশেষ প্রসিদ্ধিলাভ করিয়া গিয়াছেন। লক্ষ্মীকান্ত ন্যায়ভূষণ সুপ্রসিদ্ধ রামনাথ তর্কসিদ্ধান্তের ছাত্র। ইনি মহারাজ গিরিশচন্দ্র রায়ের সময়ে বর্ত্তমান ছিলেন। তিনি জগন্নাথ দেবের রথযাত্রা উপলক্ষে 'রথপদ্ধতি' নামে একখানি গ্রন্থ রচনা করেন। সুপ্রসিদ্ধ ব্রজনাথ বিদ্যারত্ন মহাশয় এই লক্ষ্মীকান্ত ন্যায়ভূষণের পুত্র ও ছাত্র ছিলেন।

ব্রজনাথ বিদ্যারত্ন—বর্ত্তমান শতাব্দীর প্রারম্ভে ব্রজনাথ জন্মগ্রহণ করেন। আজ পাঁচ ছয় বৎসর হইল তিনি ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন। ইনি স্মৃতিশাস্ত্রে একজন অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিধবা বিবাহের শাস্ত্রীয়তা সম্বন্ধে মহারাজ রাধাকান্তদেব বাহাদুরের বাটীতে যে এক সভা হয়, তাহাতে ব্রজনাথ, বিচারে বিধবা

বিবাহের অশাস্ত্রীয়তা প্রতিপন্ন করিয়া মহারাজ কর্ত্তৃক বিশেষরূপে পুরস্কৃত হন।

ব্রজনাথ হইতে নবদ্বীপের পণ্ডিত সমাজে এক মহান পরিবর্ত্তন হইয়াছে। এক্ষণ পর্য্যন্ত নবদ্বীপের পণ্ডিতগণের মধ্যে কেহই চৈতন্যদেবকে অবতার বলিয়া স্বীকার করেন না। পরন্তু চৈতন্য সম্প্রদায়ের উপর নবদ্বীপ, নিবাসী ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের ও নবদ্বীপের রাজাদিগের বিশেষ বিদ্বেষই ছিল। এই কারণে নবদ্বীপবাসী বৈষ্ণববর্গ স্বতন্ত্র ভাবে বাস করিতেন। গ্রামবাসীদিগের সহিত তাহাদের সাহানুভূতি ছিল না। ব্রজনাথবিদ্যারত্ন হইতে এই ভাব অনেক বিদূরিত হইয়াছে। ব্রজনাথ শেষ বয়সে চৈতন্যের মতানুবর্ত্তন করেন। এবং চৈতন্যদেব যে ভগবানের পূর্ণাবতার তাহা স্বীকার করিয়া অবতারত্ব প্রতিপাদক 'চৈতন্যচন্দ্রোদয়' নামে একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। এই গ্রন্থে তিনি নানা শাস্ত্র হইতে প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া স্বীয় ভূয়োদর্শিতার ও বিচারশক্তির পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। তিনি পুস্তক লিখিয়াই ক্ষান্ত হন নাই। যাহাতে চৈতন্যের মত বহুলরূপে প্রচারিত হয়, তজ্জন্য স্বীয় চতুষ্পাঠীতে এক হরিসভাস্থাপন করিয়াছিলেন। ঐ হরিসভা অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। ঐ হরিসভায় নবদ্বীপের অনেক পণ্ডিত ও অধিবাসী ও বৈষ্ণবগণ সমবেত হইয়া হরিগুণগান, শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও কীর্ত্তনাদি করিয়া আনন্দ সাগরে নিমগ্ন হইতেন। তৎপরে তিনি ঐ সভায় এক চৈতন্যমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত করেন। ঐ মূর্ত্তি আজ পর্য্যন্ত তদীয় পুত্র শ্রীমথুরানাথ

পদরত্ন মহাশয় সেবা করিয়া আসিতেছেন। ব্রজনাথ অতি অমায়িক ও নিরহঙ্কৃত লোক ছিলেন।

কৃষ্ণকান্ত শিরোরত্ন—ইনি একজন কাব্যশাস্ত্র বিশারদ সংকবি ছিলেন। প্রায় ১০।১২ বৎসর হইল ইঁহার পরলোক হইয়াছে। ইনি নানা বিষয়িণী প্রাচীন কবিতা সকল সংগ্রহ করিয়া 'সৎকাব্যকল্পদ্রুম' নামে দুইখানি গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়াছেন। ১৭৯৫ শকাব্দে ঐ গ্রন্থ সংগৃহীত হয়। উক্ত গ্রন্থে তাঁহার স্বরচিত অনেক শ্লোক সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। উক্ত গ্রন্থে তাঁহার এইরূপ পরিচয় পাওয়া যায়।

ধ্যাত্বা শঙ্কর পাদপদ্মযুগলং প্রাচীন পদ্যাবলীং
সংগৃহ্য স্বকৃতং তথা সুকবিতাবৃন্দং সদানন্দদং।
সাহিত্যার্ণব রত্নরাজি সদৃশং শ্রীকৃষ্ণকান্তঃ কবি
ধীরাভীষ্টফলপ্রদং প্রতনুতে সৎকাব্য-কল্পদ্রুমং॥

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

আগম বা তন্ত্রশাস্ত্র।

তন্ত্র সকল শিবের উক্তি বলিয়া প্রসিদ্ধ। উহার অপর নাম আগম। তন্ত্র সমুদয়ে চতুঃষষ্ঠী সংখ্যক। মহাবিশ্বসারতন্ত্রে লিখিত আছে।

চতুঃষষ্টীশ্চ তন্ত্রাণিঃ যামলাদীনি পার্ব্বতি।
সকলানীহ, বারাহে, বিষ্ণু ক্রান্তাষু ভূমিষু॥
কল্পভেদেন তন্ত্রাণি, কথিতানি চ যানি চ।
পাষণ্ডমোহনায়ৈব বিফলানীহ সুন্দরি॥

বৌদ্ধদিগের অবসানের পর হইতেই ভারতে তন্ত্রের মত প্রচারিত হইবার সুত্রপাত হয়। কিন্তু বঙ্গ ভূমিতে তন্ত্রের মত যেরূপ প্রবলরূপে প্রচারিত হইয়াছে, ভারতের অন্য কোন প্রদেশে তাদৃশ হয় নাই। তন্ত্রে বহুতর অলৌকিককার্য্যের অনুষ্ঠান থাকায় এবং তৎসমুদয় বঙ্গ সমাজের প্রিয় বোধ হওয়ায় বঙ্গবাসীগণ তান্ত্রিক কার্য্যের অনুষ্ঠানে রত হন। খৃষ্টীয় ষোড়ষ শতাব্দীতে বঙ্গভূমির নানাস্থানে তান্ত্রিক অধ্যাপকগণ কর্ত্তৃক তন্ত্রের বিশেষ উন্নতি হয়। ঐ সকলঅধ্যাপকগণের মধ্যে অনেকেই সিদ্ধ পুরুষ বলিয়া লোক সমাজে খ্যাত হইতে লাগিলেন। ইহাদের মধ্যে পূর্ণানন্দপরমহংস ও কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ প্রধান।

পূর্ণানন্দগিরি পরমহংস—পূর্ণানন্দের নিবাস কোথায় জানিতে পারি নাই। অনেকে ইঁহাকে পূর্ব্ব দেশীয় পণ্ডিত বলিয়া অনুমান করেন। তিনি বেদ ও বেদান্ত আগম ও তন্ত্রশাস্ত্রে এক জন বিশারদ পণ্ডিত ছিলেন। তিনি তন্ত্রোক্ত মন্ত্র সাধনে সিদ্ধপুরুষ বলিয়া বিখ্যাত ছিলেন। তৎপ্রণীত 'ষটচক্রভেদ' 'বামকেশ্বরতন্ত্র', 'শ্যামারহস্যতন্ত্র', 'শাক্তক্রমতন্ত্র' প্রভৃতি তন্ত্রশাস্ত্র এবং 'তত্ত্ব চিন্তামণি' নামক মুক্তি বিষয়ক বৈদান্তিক গ্রন্থ প্রভৃতি অনেকানেক গ্রন্থ বিদ্যমান আছে। তাঁহার তত্ত্বচিন্তামণি ১৪৯৯ শকে রচিত হয়।

পূর্ণানন্দেন গিরিণা কৃতং শ্রীপতি বাসরে।
ইষে কালাঙ্কবেদেন্দু-শাকে মঙ্গলবাসরে॥

কথিত আছে ইনি যে যে স্থানে বসিয়া জপ করিয়াছেন, সেই সেই স্থানই 'সিদ্ধপীঠ' বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। তিনি গঙ্গার উভয় কুলের স্থানে স্থানে অনেক আসন করিয়াছিলেন। সেই সেই স্থান অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। কেহ কেহ নবদ্বীপের পশ্চিমে 'ব্রাহ্মণী তলার ঘট', পূর্ব্বস্থলীর 'বুড়মার ঘট' 'বাগ্‌দেবীর ঘট' এবং নবদ্বীপের 'পোড়ামার ঘট' ইহাঁরই স্থাপিত বলিয়া নির্দ্দেশ করেন।

কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ।

পাঠকগণ উপরে যে মহাত্মার নাম দেখিতেছেন ইনিই বঙ্গদেশে 'আগমবাগীশভট্টাচার্য্য' বলিয়া প্রসিদ্ধ। এই নবদ্বীপই তাঁহার জন্ম ভূমি। ইহাঁর পিতার নাম মহেশ্বর গৌড়াচার্য্য। মহেশ্বর গৌড়দেশ হইতে আসিয়া প্রথমে নবদ্বীপে বাস করেন বলিয়া গৌড়াচার্য্য নামে বিখ্যাত হন। মহেশ্বরের দুই পুত্র। জ্যেষ্ঠ কৃষ্ণানন্দ, কনিষ্ঠ মাধবানন্দ। কৃষ্ণানন্দ 'আগমবাগীশ' নামে বিখ্যাত হন। মাধবানন্দের উপাধি 'সহস্রাক্ষ' ছিল।

কৃষ্ণানন্দ চৈতন্য দেবের সমসাময়িক লোক। এক্ষণে নবদ্বীপে উক্ত উভয় ভ্রাতার বংশাবলী বর্ত্তমান রহিয়াছেন। পুরুষ গণনায় কোন শাখায় ১৫। ১৬ পুরুষ ও কোন শাখায় ১১। ১২ জন পাওয়া যায়। যদি তৎকালের লোকদিগকে কিছু দীর্ঘজীবী মনে করিয়া প্রত্যেকের জীবনকাল গড়ে

২৫ বৎসর ধৃত করা যায় তাহা হইলে উক্ত উভয় ভ্রাতাকে খৃষ্টীয় ষোড়ষ শতাব্দীর প্রথমে দেখিতে পাই।

কথিত আছে কৃষ্ণানন্দ কাব্যাদি পাঠ শেষ করিয়া, সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত বাসুদেব সার্ব্বভৌমের নিকট তন্ত্রশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। এবং শক্তিমন্ত্র গ্রহণ করিয়া ঘোর তান্ত্রিক হইয়া উঠেন। মাধবানন্দ স্বীয় কুলদেবতা গোপাল দেবের উপাসক ছিলেন। সুতরাং উভয় ভ্রাতার মধ্যে নানারূপ বিবাদের কথা প্রচলিত আছে। কথিত আছে যে, কোন সময়ে বাটীতে এক কান্দি মর্ত্তমান রম্ভা হইয়াছিল। ভ্রাতৃদ্বয় পরস্পর মনে করিয়াছিলেন যে, রম্ভা সুপক্ক হইলে স্বীয় স্বীয় ইষ্টদেবদেবীকে অর্পণ করিবেন। একদিন কৃষ্ণানন্দ নিকট-বর্ত্তী কোন গ্রামান্তরে গিয়াছিলেন, এবং তথা হইতে আসিয়া সুপক্ক রম্ভা স্বীয় ইষ্টদেবীকে নিবেদন করিয়া দিবেন বাসনা করিয়াছিলেন। এদিকে মাধবানন্দ ভ্রাতার অনুপস্থিতিরূপ সুযোগ পাইয়া অগ্রেই স্বীয় ইষ্টদেব গোপাল-দেবকে পক্করম্ভাগুলি নিবেদন করিয়া দিতেছেন, এমন সময়ে কৃষ্ণানন্দ বাটী আসিয়া উপস্থিত হইলেন, এবং রম্ভা দেখিতে না পাইয়া ক্রোধে অন্ধ হইয়া এবং উহা মাধবানন্দেরই কার্য্য মনে করিয়া তাহার প্রাণ সংহারে প্রতিজ্ঞারূঢ় হইলেন, ও গৃহের ইতস্তত অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। অবশেষে দেখিলেন যে, গোপালের ঠাকুর গৃহ, ভিতর হইতে অর্গলবদ্ধ রহিয়াছে। তখন তিনি কিঞ্চিৎ স্থৈর্য্য অবলম্বন করিয়া গৃহের ভিতরের ব্যাপার দেখিবার জন্য নিতান্ত উৎসুক হইলেন। তিনি যাহা দেখিলেন, তাহাতে তাঁহার হৃদয় আনন্দে

উচ্ছলিত হইয়া উঠিল। তিনি দ্বারের অন্তরাল দিয়া দেখিলেন, যে ভগবতী কালিকাদেবী গোপালকে ক্রোড়ে ধারণ করিয়া আপনি রম্ভা ভক্ষণ করিতেছেন ও গোপালকে খাওয়াইতেছেন। ইহা দেখিয়া তাঁহার সমস্ত ক্রোধ দূরীভূত হইল। এবং ভ্রাতাকে ধন্য ও আপনাকে কৃতার্থম্মন্য মনে করিয়া প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। এবং বুঝিলেন যে গোপাল ও কালী ভেদ জ্ঞান করা বিড়ম্বনা মাত্র।

পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে, এই সময়ে দেশ-মধ্যে তন্ত্রশাস্ত্রের আলোচনা প্রবলরূপে প্রচলিত হইয়াছিল। কৃষ্ণানন্দ দেখিলেন যে তান্ত্রিকগণ তন্ত্রের বিশুদ্ধ মত, হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিয়া, কেবল তন্ত্রের দোহাই দিয়া নিষ্ঠুরতা করিতে ও মদ্য পানে উন্মত্ত হইতে কুণ্ঠিত নহেন। তজ্জন্য তিনি তন্ত্রশাস্ত্রের সার সঙ্কলনে প্রবৃত্ত হইলেন।

তিনিই তন্ত্রসার নামক সুবৃহৎ গ্রন্থ সংকলন করেন। এই গ্রন্থে তিনি শাক্ত ও বৈষ্ণব উভয় মতাবলম্বীদিগের দেব ও দেবীর উপাসনা ও পূজাপদ্ধতি অতি সুন্দররূপে বিবৃত করিয়াছেন। বিশেষত তন্ত্রমতে স্বাত্ত্বিক পূজা কিরূপে করিতে হয় তাহাও তিনি উত্তমরূপে দেখাইয়া গিয়াছেন।

বর্ত্তমান সময়ে কার্ত্তিকী অমাবশ্যায় যে শ্যামাপূজা হইয়া থাকে, সেই শ্যামামূর্ত্তি ও পূজাপদ্ধতি এই আগমবাগীশেরই আবিষ্কৃত। আগমবাগীশের পূর্ব্বে ঐ পূজা প্রচলিত ছিল না। তৎকালে মূর্ত্তি প্রকাশিত না থাকায় পূজাদি সমস্তই ঘটে হইয়া থাকিত। এখন মূর্ত্তি প্রকাশিত হইলেও সেই ঘট একেবারে রহিত হইয়া যায় নাই। 'ঘটস্থাপন ব্যাপার

অদ্য পর্য্যন্ত প্রচলিত আছে। কৃষ্ণানন্দ প্রথমে ঘট স্থাপন করিয়াই পূজা করিতেন। অদ্যাপি তাঁহার বাটীতে ঐ ঘট আছে। তাঁহার বংশধরেরা অদ্যাপি ঐ ঘট পূজাকরিয়া আসিতেছেন। যাহাহউক কথিত আছে আগমবাগীশ ভট্টাচার্য্য ভগবতী শক্তি দেবীর মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া পূজা করিতে বাসনা করিলেন। কিন্তু তন্ত্রোক্ত ধ্যানানুসারে 'বরাভয়' কর কিরূপে গঠিত হইবে, এবং জ্রদ্বয়ই বা কি রঙ্গেরঞ্জিত হইবে, তাহা স্থির করিতে না পারিয়া চিন্তিত হইলেন। তাঁহাকে এইরূপ চিন্তাযুক্ত দেখিয়া দেবী প্রসন্ন হইয়া এই প্রত্যাদেশ দিলেন যে, তুমি কল্য প্রাতে শয্যা হইতে উঠিয়া যে মূর্ত্তি দেখিবে, তাহাতেই আমার বরাভয় কর ও জ্রদ্বয়ের বিষয় জানিতে পারিবে। পর দিবস কৃষ্ণানন্দ শয্যা পরিত্যাগ করিয়া যেমন বাটী হইতে বহির্গত হইলেন, অমনি দেখিলেন, যে এক কৃষ্ণবর্ণা গোপরমণী দক্ষিণপদ অগ্রবর্ত্তী করিয়া গৃহের ভিত্তি সন্নিকটে দণ্ডায়মাণা হইয়া বামহস্তস্থিত গো-ময়পিণ্ড হইতে দক্ষিণ হস্তে অল্পাংশ গো-ময় লইয়া ভিত্তি গাত্রে প্রক্ষেপ করিতেছে। পরিশ্রম আধিক্যে তাহার মুখমণ্ডল হইতে ঘর্ম্ম নির্গত হওয়ায় এবং উভয় হস্তের পৃষ্ঠদেশ দিয়া ললাটের ঘর্ম্ম মোচন করায়, ললাটস্থ সিন্দুর বিন্দু দ্বারা জ্রযুগল লোহিতরূপ ধারন করিয়াছে। মস্তকের বস্ত্র পতিত ও কেশরাশি আলুলায়িত হইয়াছে। এমন সময়ে কৃষ্ণানন্দ তাহার সম্মুখবর্ত্তী হইলেন। গোপরমণী স্বভাব সুলভ লজ্জা বশত দন্তে জিহ্বা কাটিলেন।

কৃষ্ণানন্দ এই মূর্ত্তি দেখিয়া বরাভয় করাদির বিষয় স্থির করিয়া লইলেন। 'এবং তদবধি রাত্রিতে নিত্য ঐ প্রতিমা

নির্ম্মাণ করিয়া পূজান্তে রাত্রিতেই বিসর্জ্জন দিতেন। এইজন্য অস্মদ্দেশে যে সকল কার্য্য হঠাৎ হইয়া থাকে তাহাকে 'আগম-বাগীশীকাণ্ড' বলিয়া থাকে। কৃষ্ণানন্দের এই পূজায় কোন রূপ বলিদান বা মাদকতার সংশ্রব নাই। আগমবাগীশের এই মূর্ত্তি প্রকাশিত হওয়ার পর হইতেই এদেশে 'শ্যামাপূজা' পদ্ধতি প্রকাশিত হইয়াছে। অদ্যাপি আগমবাগীশের বংশীয়েরা ঐমূর্ত্তি পূজা করিয়া আসিতেছেন। এক্ষণে নবদ্বীপের মহারাজার ব্যয়ে ১০।১২ হাত লম্বা এক প্রকাণ্ড শ্যামামূর্ত্তি পূজিত হইয়া থাকে। আগমবাগীশ কর্ত্তৃক ঐ মূর্ত্তি ও পূজা পদ্ধতি প্রকাশিত বলিয়া ঐ মূর্ত্তি 'আগমেশ্বরী' নামে খ্যাত। কৃষ্ণানন্দ 'শ্রীতত্ত্ববোধিনী' নামে আর একখানি তন্ত্রবিষয়ক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

কৃষ্ণানন্দের বংশধরেরা 'আগমবাগীশ' ভট্টাচার্য্য বলিয়া বিখ্যাত। তাঁহার পুত্রের নাম হরিনাথ। হরিনাথের দুই পুত্র, জ্যেষ্ঠ গোপাল ও কনিষ্ঠ মধুসূদন। গোপালের বংশধরেরা নবদ্বীপে বাস করিতেছেন। গোপালও তন্ত্রশাস্ত্রে একজন অদ্বিতীয় পণ্ডিত হইয়া উঠিয়াছিলেন। তিনিও পিতামহের ন্যায় 'তন্ত্রদীপিকা' নামে এক সুবিস্তীর্ণ তন্ত্র-বিষয়ক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। গোপাল ঐ গ্রন্থে এইরূপ আত্ম পরিচয় দিয়াছেন।

আগমবাগীশ পৌত্রেণ, হরিনাথস্য সূনুনা।
শ্রীগোপালেন বিজ্ঞেন কৃতেযং তন্ত্রদীপিকা॥

আগমবাগীশের দ্বিতীয় পুত্র মধুসূদনের বংশধরেরা এক্ষণে হরিপুর গ্রামে বাস করিতেছেন। মধুসূদনের বংশে

রামতোষণ নামে একজন জন্মগ্রহণ করেন। তিনি 'প্রাণ-তোষিণী' নামে একখানি গ্রন্থ রচনা করিয়া বংশের গৌরব রক্ষা করিয়াছেন। এই গ্রন্থও তন্ত্রসকলের সারসংগ্রহ মাত্র। ১৭৪৩ শকে বা ১৮২১ খৃষ্টীয় অব্দে এই গ্রন্থ সংগৃহীত হয়। এক্ষণে আগমবাগীশের বংশীয়েরা নবদ্বীপ ও অন্যান্য স্থানে বর্ত্তমান আছেন।

মাধবানন্দ—ইনি গোপালের উপাসক ছিলেন। কোন সময়ে এইবংশীয় কোন ব্যক্তি রাধাবল্লভ নামে এক বিগ্রহ মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত করায় মাধবানন্দের বংশধরেরা 'রাধাবল্লভভট্টাচার্য্য', বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছেন। অদ্যাবধি মাধবানন্দের বংশধরেরা নবদ্বীপে বাস করিতেছেন। সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত অজিতনাথ ন্যায়রত্ন এই মাধবানন্দের বংশসম্ভূত।

জগদ্ধাত্রী—মহারাজ গিরিশচন্দ্রের পূর্ব্বে অস্মদ্দেশে জগদ্ধাত্রী পূজা প্রচলিত ছিল না। উক্ত মহারাজের যত্নে তন্ত্র হইতে ঐ মূর্ত্তি প্রকাশিত হয়। শান্তিপুরের নিকট-বর্ত্তী ব্রহ্মশাসন গ্রাম নিবাসী চন্দ্রচূড় ন্যায়পঞ্চানন নামক জনৈক তন্ত্রশাস্ত্র বিশারদ পণ্ডিত কর্ত্তৃক ঐ মূর্ত্তি আবিস্কৃত হয়। পরে নবদ্বীপের পণ্ডিতগণের অনুমোদিত হইলে ঐ মূর্ত্তির পূজা হইতে আরম্ভ হয়। কৃষ্ণনগরে প্রায় ঘরে ঘরে ঐ মূর্ত্তি পূজিত হইয়া থাকে।

কৃষ্ণমাতা—ইহাও এক তান্ত্রিকমূর্ত্তি। নবদ্বীপের সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত নন্দকুমারবিদ্যাভূষণকর্ত্তৃক ১২৪৩ সালে এই মূর্ত্তি প্রকাশিত হয়। এবং তদবধি রাস-পূর্ণিমার দিবস বারইয়ারি পূজায় ঐ মূর্ত্তি পূজিত হইয়া আসিতেছে। দশভুজা

শ্যামবর্ণা ভগবতী শ্রীকৃষ্ণকে ক্রোড়ে ধারণ পূর্ব্বক শিবোপরি দণ্ডায়মানা। চতুর্দ্দিকে গোপ-বালক সকল ক্রিড়ায়মান দেখিলে মনুষ্য মাত্রেরই মন মোহিত হইয়া যায়। এক্ষণে নবদ্বীপে নন্দ বিদ্যাভূষণের বংশাবলীবর্ত্তমান রহিয়াছেন।

নবদ্বীপের ঐ মূর্ত্তি দেখিয়া কলিকাতা বড়বাজারের হরিসভার সম্পাদক শ্রীযুক্ত রামদয়াল বন্দ্যোপাধ্যায় উঁহার পট প্রস্তুত করিয়া বিক্রয় করিতেছেন। দুঃখের বিষয় তিনি আপনাকে ঐ মূর্ত্তির প্রকাশক বলিয়া পরিচয় দিতে কুণ্ঠিত হন নাই।

মহারাজ গিরিশচন্দ্র যৌবন কালে পরম ধার্ম্মিক ছিলেন। তিনি কর্ম্মচারীগণের উপর সমস্ত কার্য্যের ভারার্পণ করিয়া নবদ্বীপে গঙ্গাতীরে কুটিরে থাকিয়া অনেক পুরশ্চরণ করেন। তাঁহার সময়ে কেবল ঐ সকল তান্ত্রিক মূর্ত্তি প্রকাশিত হয় এমন নহে, তিনি নবদ্বীপে দুই প্রকাণ্ড মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া ১২৩২ সালে তাহার একটীতে 'ভবতারিণী' নামে দেবী ও অপরটীতে 'ভবতারণ' নামে শিব মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত করিয়া, তাঁহাদের সেবার নিমিত্ত অনেক নিষ্কর ভূমি নির্দ্ধারিত করিয়া দেন। ইঁহার সময় হইতেই কৃষ্ণনগরের রাজবংশের অবনতির সূত্রপাত হয়, এবং রাজস্ব বাকির দায়ে অনেক জমিদারী নিলাম হইয়া যায়।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

শ্রীশ্রীচৈতন্যদেব ও বৈষ্ণবধর্ম্ম।

শ্রীচৈতন্যদেবের জীবনী সম্বন্ধে বহুতর গ্রন্থ বিদ্যমান আছে। সুতরাং ইহাতে তাঁহার জীবনের বিস্তীর্ণ বিবরণ লিখিত হইল না।

পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর পূর্ব্ব-হইতে বঙ্গদেশে তন্ত্রের মত প্রচারিত হয়। তান্ত্রিক আচারে বঙ্গবাসীগণ পশু হনন, সোমরস পান, ইত্যাদি কার্য্যে রত হইয়া নিষ্ঠুরের একশেষ হইয়া উঠেন। বঙ্গবাসীর মধ্যে এইরূপ নীরস ভক্তিহীন ক্রিয়াকাণ্ড দেখিয়া দুই একজনের মনে বৈষ্ণব ধর্ম্মের মত অর্থাৎ ঈশ্বরে প্রেম-ভক্তি, জীবে-দয়া সূক্ষ্ম রূপে উদিত হয়। বিদ্যাপতি, চণ্ডিদাস প্রভৃতি কবিগণ ঐ মতের পক্ষপাতী হইয়া প্রেমভক্তিপরিপূর্ণ অনেক কবিতা রচনা করেন। এবং বঙ্গদেশের নানা স্থানের লোকের মনে প্রেমভক্তির উদয় হইতে আরম্ভ হয়। খৃষ্টীয় ষোড়ব শতাব্দীর প্রথমভাগে শ্রীহট্টে চন্দ্রশেখরাদি, চট্টগ্রামে পুণ্ডরিকবিদ্যানিধি, রাঢ়দেশে নিত্যানন্দ, এবং বুঢ়নে যবন-হরিদাস ও শান্তিপুরে অদ্বৈতআচার্য্য ও নবদ্বীপে জগন্নাথ মিশ্র প্রভৃতি বৈষ্ণবগণ জন্মপরিগ্রহ করিয়া বঙ্গভূমির নানা স্থান বিশেষত নবদ্বীপ ও শান্তিপুর আলোকিত করিয়াছিলেন।

ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায়, যখন কোন

নূতন মত প্রচারিত হয়, প্রায়ই তাহার বহু পূর্ব্বে তৎ তৎ দেশে তাহার সূত্রপাত হইয়া থাকে। মহাত্মা যীশুর পূর্ব্বে যোহন প্রভৃতি ধর্ম্মপ্রচারকগণ, মার্টিন লুথরের পূর্ব্বে উইক্লিফ, এবং পার্কারের পূর্ব্বে রামমোহন রায় প্রভৃতি ধর্ম্মসংস্কারকগণ, তেমনি চৈতন্যের পূর্ব্বে অদ্বৈতআচার্য্য প্রভৃতি বৈষ্ণবগণ জন্মগ্রহণ করিয়া ভূমণ্ডলকে উজ্জ্বল করিয়াছিলেন। কেবল যে ধর্ম্ম সম্বন্ধেই এইরূপ দেখা যায় তাহা নহে; বিজ্ঞান সম্বন্ধেও ঠিক এইরূপ দেখা যায়। কোপর্নিকসের বহু পূর্ব্বে এনাক্সিমেণ্ডর ও পিথাগোরস এবং নিউটনের পূর্ব্বে গালিলীয় প্রভৃতি জন্মগ্রহণ করিয়া পরবর্ত্তীদিগের মত সুপরিষ্কৃত করিয়া দিয়াছেন। বৈষ্ণব ধর্ম্ম সম্বন্ধেও ঠিক সেইরূপ ঘটিয়াছিল। কিন্তু তন্ত্রের প্রভাবে এতদিন উক্ত মত ম্লান হইয়াছিল। পরিশেষে বৈষ্ণবধর্ম্মের বিশুদ্ধমত পরিস্ফুট হইবার শুভ সময় উপস্থিত হইল। যে মহাত্মা বৈষ্ণব ধর্ম্মের বিশুদ্ধ মত সুপ্রচারিত করেন তাঁহার নাম শ্রীশ্রীচৈতন্য দেব।

যে সময়ে রঘুনাথশিরোমণি স্বীয় অসাধারণ তর্কশক্তি বলে মিথিলার গর্ব্ব খর্ব্ব করিয়া ন্যায় বিষয়ে নবদ্বীপের প্রাধান্য স্থাপন করিতেছিলেন; যে সময়ে ইউরোপখণ্ডে মহাত্মা লুথর, যুক্তি ও বুদ্ধিবলে খৃষ্ট ধর্ম্ম সংস্কারে প্রবৃত্ত হইয়া পোপের সিংহাসন কম্পমান ও তথাকার সমস্ত লোকের জ্ঞান-চক্ষু উন্মিলিত করিয়া প্রটেষ্টাণ্ট ধর্ম্মসম্প্রদায় সংস্থাপন করিতেছিলেন, সেই সময়ে চৈতন্য দেবও নবদ্বীপে অবতীর্ণ হইয়া সনাতন সত্য ধর্ম্ম প্রচারে তৎপর ছিলেন।

১৪০৭ শকে বা ১৪৮৫ খৃষ্টীয় অব্দে ফাল্গুন মাসের পূর্ণিমা

তিথিতে চৈতন্যদেব নবদ্বীপে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম জগন্নাথ মিশ্র। পুরন্দর তাঁহার আর এক উপাধি ছিল। জগন্নাথ বৈদিক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনি বিদ্যা শিক্ষার্থে বা গঙ্গা স্নানার্থেই নবদ্বীপে আগমন করেন। এবং নবদ্বীপ নিবাসী নীলাম্বর চক্রবর্ত্তীর কন্যা শচীদেবীর পাণিগ্রহণ করিয়া নবদ্বীপে বাস করিয়াছিলেন। এই শচীর গর্ভে চৈতন্যের জন্ম হয়। কথিত আছে চৈতন্য দেব ত্রয়োদশ মাস গর্ভবাস করেন। জগন্নাথ মিশ্র অতি শান্ত প্রকৃতি ও পরম ধার্ম্মিক ছিলেন। দেবার্চ্চনা তপ জপাদি এবং শ্রীমদ্ভাগবত পাঠেই সমস্ত সময় অতিবাহিত করিতেন। শচীদেবীও পরম ধার্ম্মিকা ও পতিপরায়ণা ছিলেন।

এই শচীর গর্ভে জগন্নাথের একে একে আটটী কন্যা গতাসু হইলে, সৌভাগ্য ক্রমে একটী পুত্র জন্মে। ঐ পুত্রের নাম বিশ্বরূপরাখেন। বিশ্বরূপ বয়োবৃদ্ধি সহকারে উত্তম লেখাপড়া শিখিলেন। তিনি প্রায় যৌবন সীমায় পদার্পণ করিয়াছেন, এমন সময়ে চৈতন্য দেব জন্মগ্রহণ করিলেন।

চৈতন্যের জন্মগ্রহণ কালে চন্দ্রগ্রহণ হইয়াছিল। সুতরাং ভারতের চিরপ্রচলিত প্রথানুসারে সর্ব্বসাধারণে নানা প্রকার দান ধর্ম্মে রত ছিলেন। যদিও এসকল অন্য কারনে হইয়াছিল তথাপি অনেকের বিশ্বাস হইল, এরূপ শুভ সময়ে যাঁহার জন্ম হইয়াছে, তিনি অবশ্যই কোন মহাপুরুষ হইবেন। কালে হয়ত ইহাও চৈতন্যদেবকে বিশেষরূপে উৎসাহিত করিয়াছিল।

চৈতন্য ভূমিষ্ঠ হইলেই অদ্বৈত আচার্য্য প্রভৃতি বৈষ্ণবগণ, দেশীয় প্রথানুসারে সিন্দুর ও হরিদ্রা প্রভৃতি সুতিকাগারে প্রেরণ করেন। অদ্বৈতের সহধর্ম্মিণী সীতাদেবী শিশুর নাম 'নিমাই' রাখেন। ডাকিণীর, শাখিণীর হস্ত হইতে কোন ভয় না থাকে এই জন্য শিশুর প্রাণরক্ষার্থে এইরূপ নাম রাখা হইয়াছিল। অদ্যাপি অস্মদ্দেশে মৃতবৎসার সন্তান হইলে ঐরূপ নাম রাখা হয়। নামকরণ কালে তাঁহার নাম বিশ্বম্ভর রাখা হয়।

এই স্থানে অদ্বৈতের পরিচয় দেওয়া আবশ্যক। অদ্বৈত আচার্য্যের নিবাস শান্তিপুর। ইঁহার প্রকৃত নাম কমলাক্ষ। তাঁহার শিষ্যগণ তাঁহাকে ঈশ্বর হইতে অভেদে পূজা ও ভক্তি করিত, এইজন্য তাঁহার নাম অদ্বৈত হয়। অধ্যাপনা উপলক্ষে তিনি নবদ্বীপে বাস করেন। ইনি মাধ্বাচার্য্য মঠের সন্ন্যাসী মাধবেন্দ্র পুরীর নিকট দীক্ষিত হন। তদবধি তিনি বৈষ্ণবধর্ম্ম গ্রহণ ও ভক্তি মাহাত্ম্য প্রচার করিয়া আসিতেছিলেন। তিনি চারিদিকে ভক্তিহীন ক্রিয়াকাণ্ড দেখিয়া বুঝিতে পারিয়াছিলেন অধর্ম্ম বিনাশ হেতু ভগবান শীঘ্রই অবতীর্ণ হইবেন।

কথিত আছে একদা অদ্বৈত আচার্য্য শান্তিপুরের ঘাটে গঙ্গাস্নান করিতেছিলেন। তিনি দেখিলেন, একটী তুলসী-পত্র স্রোতের প্রতিকূলে ভাসিয়া যাইতেছে। তিনি এই আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখিয়া, উক্ততুলসীপত্রের অনুসরণ করিলেন। উক্ত তুলসীপত্র ক্রমে উত্তরাভিমুখে নবদ্বীপের স্নানায়মানা শচীদেবীর গর্ভস্পর্শ করে। শচীদেবী তৎকালে গর্ভবতী

ছিলেন। এতদ্দর্শনে অদ্বৈত আচার্য্য শচীর গর্ভে ভগবানের আবির্ভাব হইয়াছে বুঝিতে পারিয়াছিলেন। এবং তজ্জন্যই চৈতন্যদেবের জন্মকালে স্বীয়-পত্নী সীতাদেবীকে সুতিকাগারে প্রেরণ করেন।

শৈশব-কাল হইতেই চৈতন্যদেবের তীক্ষ্ণধীর নানা প্রকার পরিচয় পাওয়া যায়। একদিন নিমাই ক্রীড়া করিতে করিতে মাটী খাইতেছিলেন। শচীদেবী পুত্রকে মাটী খাইতে দেখিয়া তিরস্কার করিলে, নিমাই উত্তর করিলেন, মা আমায় তিরস্কার করেন কেন ? সকলি মৃত্তিকার বিকার মাত্র, সর্ব্বোৎকৃষ্ট সুমিষ্ট দ্রব্যও এই মৃত্তিকাহইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে। তখন শচী কহিলেন, বৎস মাটী খাইলে পীড়া হয়, কিন্তু মাটীর বিকার মিষ্টান্নাদি খাইলে পীড়া হয় না। তখন চৈতন্য কহিলেন, আমি আপনার স্তন্য পান করিব।

নিমাই বাল্যকালে কিছু দুরন্ত ছিলেন। একদিন তাঁহার মাতা তাঁহার দুর্বৃত্ততা নিবন্ধন অসন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে প্রহার করিতে উদ্যত হইলে, নিমাই পলাইয়া আস্তাকুড়ে গিয়া দাড়াইলেন। তিনি জানিতেন যে মা কখনই এই স্থানে আসিতে পারিবেন না। যাহাহউক শচী পুত্রকে স্নান করিয়া আসিতে কহিলেন, তখন নিমাই কহিলেন, মা এই আস্তাকুড় অপবিত্র নহে। পরন্তু মনুষ্য যাহাতে অপবিত্র হয় তাহা মনুষ্য হৃদয়েতেই আছে।

কিছু দিন পরে জগন্নাথ পুত্রকে পাঠশালায় দিলেন। তিনি অতিশয় বুদ্ধিমান ছিলেন। অল্প দিনের মধ্যেই পাঠশালার পাঠ শেষ করিয়া সংস্কৃত পড়িতে আরম্ভ করিলেন।

এই সময়ে বিশ্বরূপ প্রায় যৌবনসীমায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন। নানাশাস্ত্রে তাঁহার বিশেষ জ্ঞানলাভ হইয়াছে। তিনি অদ্বৈত আচার্য্যের টোলে প্রবিষ্ট হইয়া গীতা ভাগবতাদি ভক্তিশাস্ত্র অধ্যয়ন করিতেছেন। জগন্নাথ মিশ্র পুত্রের বিবাহ কাল উপস্থিত দেখিয়া, তাঁহার বিবাহ দিবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন। বাল্যকাল হইতেই বিশ্বরূপ সংসারের প্রতি বীতরাগ ছিলেন। এক্ষণে এই বিবাহের প্রস্তাব শুনিয়া রাত্রিযোগে গৃহপরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিলেন। বৃদ্ধ পিতামাতা পুত্রবিরহে অকূল শোকসাগরে নিমগ্ন হইলেন। কিন্তু চৈতন্যের মুখচন্দ্র দেখিয়া তাঁহারা বিশ্বরূপের কথা কিয়দংশে ভুলিয়াছিলেন। এই সময় হইতে নিমাইয়ের যে কিছু চাঞ্চল্য ছিল, তাহা একেবারে তিরোহিত হইল। তিনি ধীর ও শান্তভাবে পিতা মাতার সেবা শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। তাঁহার সেবারগুণে তাঁহারা বিশ্বরূপের কথা ভুলিয়া গেলেন।

নিমাই গঙ্গাদাসপণ্ডিতের টোলে ব্যাকরণ পড়িতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহার বুদ্ধি ও স্মরণ শক্তি এত অধিক ছিল যে, তিনি একবার পড়িলেই সূত্র সকল কণ্ঠস্থ করিতে পারিতেন। একবার ব্যাখ্যা শুনিলে আর ভুলিতেন না। অল্পকাল মধ্যেই তাঁহার সুখ্যাতি চারি দিকে পরিব্যাপ্ত হইল। জনক-জননী পুত্রের বিদ্যানুরাগের কথা শুনিয়া যার-পরনাই আহ্লাদিত হইতে লাগিলেন।

এই সময়ে তাঁহার পিতৃ বিয়োগ হয়। তখন তাঁহার বয়স ১১। ১২ বৎসর হইবে। পিতৃ • বয়োগে চৈতন্যদেব

মহাদুঃখে পড়িলেন। দুঃখে পড়িলেন বটে কিন্তু বিদ্যাভ্যাসে অধিকতর মনোনিবেশ করিলেন। এবং দিবা রাত্রি পরিশ্রম করিয়া অচিরে গঙ্গাদাসের টোলে প্রধান ছাত্র হইয়া উঠিলেন। তদনন্তর তিনি বাসুদেব সার্ব্বভৌমের নিকট ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন।

চৈতন্যদেব অতিশয় সুপুরুষ ছিলেন। তাঁহার গৌরবর্ণ কমনীয় কান্তি, মনোহর মুখচ্ছবি, এবং মোহিনী-শক্তি-পূর্ণ আয়ত-লোচনদ্বয় দেখিলে লোকমাত্রেরই মনোমোহিত হইত। আবার এই সময়ে যৌবন সীমায় পদার্পণ করায় তাঁহার সৌন্দর্য্য যেন একেবারে উদ্বেল হইয়া উঠিল। শচীদেবী পুত্রের বিবাহ কাল উপস্থিত দেখিয়া তাঁহার বিবাহের জন্য ব্যস্ত হইলেন। তাঁহার ভয়, পাছে নিমাই বিশ্বরূপের ন্যায় সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করে। নিমাই মাতার অভিপ্রায় বুঝিয়া বিবাহে সম্মতি দিলেন। নিমাই পিতার মৃত্যুর ২।১ বৎসর পরেই নবদ্বীপ নিবাসী বল্লভাচার্য্যের কন্যা লক্ষ্মীদেবীর পাণি-গ্রহণ করিলেন।

এই বিবাহের পরেই নিমাই মুকুন্দসঞ্জয়ের চণ্ডীমণ্ডপে চতুষ্পাঠী করিয়া অধ্যাপনায় প্রবৃত্ত হইলেন। অল্প দিনের মধ্যেই তাঁহার খ্যাতি প্রতিপত্তি চারিদিকে বিস্তীর্ণ হইল। এই সময়ে এক জন দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত নানাদেশের পণ্ডিত-বর্গকে বিচারে পরাস্ত করিয়া নবদ্বীপে আসিয়া উপস্থিত হন। যখন নিমাই সশিষ্য গঙ্গাতীরে সন্ধ্যাহ্নিক করিতে ছিলেন, তখন তথায় তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হয়। নিমাই তাঁহার নাম ও বিদ্যাবত্তার কথা পূর্ব্বেই শুনিয়াছিলেন।

এক্ষণে দিগ্বিজয়ীকে গঙ্গার একটী স্তব আবৃত্তি করিতে বলিলেন। দিগ্বিজয়ী নিজকৃত গঙ্গার স্তব পাঠ করিয়া তাহার ব্যাখ্যা করিলে পর, নিমাই তাঁহার ব্যাখ্যায় নানা প্রকার দোষারোপ করিলেন। দিগ্বিজয়ী, তৎসমুদয় খণ্ডন করিতে পারিলেন না। দিগ্বিজয়ী বালকের নিকট এইরূপে পরাজিত হইয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। তৎকালে বিচারে পরাজিত ব্যক্তির দ্রব্য সামগ্রী কাড়িয়া লওয়া রীতি ছিল। কিন্তু নিমাই তাহা না লইয়াই তাঁহাকে বিদায় দিলেন।

নিমাই এতাদৃশ পণ্ডিত হইয়াও আপন বিদ্যার গৌরব করিতেন না। কথিত আছে যে ন্যায়দর্শনে নবদ্বীপ ভারতবর্ষের মধ্যে সর্ব্বাগ্রগণ্য নিমাই সেই ন্যায়সম্বন্ধীয় গৌতমশাস্ত্রের টীকা করিয়াছিলেন। কিন্তু নিমাইয়ের অসাধারণ ঔদার্য্য বশত ঐ গ্রন্থ নষ্ট হয়। তিনি এক ব্রাহ্মণের সহিত এক দিন ঐ পুস্তক হস্তে গঙ্গা পার হইতেছিলেন। ঐ ব্রাহ্মণও অনেক দিন হইতে ন্যায়-শাস্ত্রের একখানি টীকা প্রস্তুত করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণ দেখিলেন, যে নিমাইয়ের টীকা প্রচলিত হইলে তাঁহার টীকার কেহই আদর করিবে না। এজন্য তিনি নিমাইয়ের সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। নিমাই তাহার মনোগত ভাব বুঝিতে পারিয়া স্বকৃত টীকাখানি নদীগর্ভে নিঃক্ষেপ করিলেন। এরূপ নিঃস্বার্থতার দৃষ্টান্ত পৃথিবীতে অতিবিরল।

এই সময়ে নিমাই জ্ঞানার্জ্জনে অধিকতর অনুরক্ত ছিলেন। বৈষ্ণবগণ জগন্নাথ মিশ্রের বংশে ভক্তি-বিরহিত

পণ্ডিতের আবির্ভাব দেখিয়া যারপরনাই দুঃখিত হইলেন। পরিশেষে এমন এক ঘটনা উপস্থিত হইল, যে তিনি আর ধর্ম্মের দিকে মন না দিয়া থাকিতে পারিলেন না। বাস্তবিক সময়ে সময়ে এমন ঘটনা উপস্থিত হয় যে, রাশি রাশি, গ্রন্থ পাঠে ও সহস্র সহস্র উপদেশে যাহা না হয়, ঐরূপ ঘটনায় তদপেক্ষা অধিকতর ফল দর্শিয়া থাকে।

এক দিন নিমাই সশিষ্য রাজপথে যাইতে ছিলেন। সেই সময়ে মুকুন্দ দত্তও গঙ্গাস্নানে যাইতেছিলেন। মুকুন্দ দত্তের আদি নিবাস শ্রীহট্ট। ইনি চৈতন্যের সহাধ্যায়ী ছিলেন। কিন্তু এক্ষণে তিনি বিশুদ্ধ হরিভক্তি পরায়ণ হইয়াছিলেন; ও হরি গুণগানেই সময় অতিবাহিত করিতেন। মুকুন্দ নিমাইকে অবৈষ্ণব বলিয়া জানিতেন সুতরাং তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইলে, সম্ভাষণ করিতে হইবে এই ভয়ে হঠাৎ অন্য পথে বলিয়া গেলেন। নিমাই ইহা বুঝিতে পারিলেন। তখন তিনি বলিলেন যে, 'আমিএমন বৈষ্ণব হইব যে যাহারা আমাকে দেখিয়া পলায়ন করে তাহারাও আমার গুণকীর্ত্তন করিবে,।

নিমাই প্রথম হইতেই শ্রীমদ্ভাগবত পাঠে অনুরক্ত ছিলেন। তাহাতেই তাঁহার মন বৈষ্ণবধর্ম্মে আস্থাযুক্ত হয়। এক্ষণে এই ঘটনায় তিনি বৈষ্ণব ধর্ম্মাচরণে প্রবৃত্ত হইলেন।

এই সময়ে ঈশ্বরপুরী নামক এক জন পরমভাগবত নবদ্বীপে আগমন করেন। তিনি শ্রীবাসের গৃহে অবস্থিতি করিতেন। শ্রীবাসের আদি নিবাস শ্রীহট্ট ছিল। শ্রীবাসেরা

চারি ভাই। ইহাঁরা ও বিদ্যাশিক্ষার জন্ত নবদ্বীপে আগমন করেন। নবদ্বীপেই এক বাটী করিয়া বাস করেন। শ্রীবাস পরম বৈষ্ণব ছিলেন। তিনি আপন বাটীতে থাকিয়া উচ্চ-স্বরে হরিনাম করিতেন ও লোকের সহিত ধর্ম্মসম্বন্ধে নানা তর্ক বিতর্ক করিতেন। তজ্জন্য অনেকে তাঁহার উপর বিরক্ত ছিলেন। ও তাঁহার প্রতি অত্যাচারও করিতেন। যাহাহউক ঈশ্বরপুরীর সহিত এই স্থানে নিমাইয়ের বিশেষ পরিচয় হইল। এবং তৎসূত্রে শ্রীবাসাদি বৈষ্ণবগণের সহিত নিমাইয়ের বিশেষ সম্প্রীতি হইয়াছিল।

নিমাই উনিশ বৎসর বয়সে পূর্ব্ববঙ্গে যাত্রা করেন। তিনি শ্রীহট্ট, চট্টোগ্রাম প্রভৃতি নানাস্থান পরিদর্শন করিয়া পদ্মানদীতীরে কিছু দিন অবস্থিতি করেন। এই স্থানে বহুতর লোক তাঁহাকে দর্শনার্থে সমাগত হইয়াছিল ও অনেকে তাঁহার ছাত্র হইয়াছিল। এইরূপে পূর্ব্বাঞ্চল ভ্রমণকরিয়া তিনি স্বদেশে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। তাঁহার পূর্ব্ববঙ্গে অবস্থান কালে তদীয় সহধর্ম্মিণী লক্ষ্মীদেবী বিরহ-রূপ সর্পদংশনে মৃত্যুমুখে পতিত হন।

নিমাই গৃহে আসিয়া মাতাকে প্রণাম করিলেন। আহারান্তে মাতাকে দুঃখিত দেখিয়া, তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। মা কোন উত্তর না করিয়া কেবল ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। অনন্তর নিমাই স্বীয়পত্নী লক্ষ্মীদেবীর প্রাণ বিয়োগ শুনিয়া শোকে কিয়ংক্ষণ স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন পরে ধৈর্য্য অবলম্বন করিয়া কহিলেন—

"কস্য কে পতি পুত্রাদ্য মোহএবহি কেবল মিতি

এই বলিয়া তিনি মাতাকে নানা মতে বুঝাইয়া সান্ত্বনা করিলেন।

এই সময় হইতেই নিমাইয়ের ধর্ম্মানুরাগ প্রবল হইতে লাগিল। তিনি ছাত্রদিগকে শিক্ষা দিবার সময়ে ধর্ম্মশিক্ষা দিতে লাগিলেন। সন্ধ্যা, আহ্নিক, পূজা এবং তিলকধারণ আদি ব্রাহ্মণের অবশ্যকর্ত্তব্য কার্য্য সকল উপদেশ দিতে লাগিলেন। অধ্যাপনাতেও তাঁহার বিশেষ মনোযোগ ছিল। এদিকে শচীদেবী পুত্রেরপুনর্ব্বারবিবাহ দিবার জন্য বড়ই ব্যস্ত হইলেন। নিমাই অল্পদিনের মধ্যেই রাজপণ্ডিত সনাতনমিশ্রের কন্যা বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর সহিত পুনরায় পরিণয় পাশে আবদ্ধ হইলেন। নবদ্বীপ নিবাসী বুদ্ধিমন্ত খাঁ নামক জনৈক কায়স্থ বংশোদ্ভব, ধনাঢ্য ব্যক্তি, তাঁহার এই বিবাহের, সমস্ত ব্যয় ভার বহন করেন।

দ্বিতীয়বার বিবাহের প্রায় এক বৎসর পরে অর্থাৎ একুশ বৎসর বয়সে নিমাই পিতৃ ঋণ পরিশোধের জন্য গয়া যাত্রা করেন। এই স্থানে পূর্ব্বপরিচিত ঈশ্বরপুরীর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। তিনি উক্ত পুরীর নিকট দশাক্ষর মন্ত্র গ্রহণ করিয়া কৃষ্ণপ্রেমসাগরে ভাসমান হইলেন। এই সময় হইতেই তাঁহার জীবন নববেশ ধারণ করিল। যে ভক্তিতে সমস্ত ভারত বিমোহিত হইয়াছিল, সেই ভক্তির বীজ এইসময় হইতে অঙ্কুরিত হইতে আরম্ভ হইল।

গয়া তীর্থ হইতে নিমাই গৃহ প্রত্যাগমনের পর অধ্যাপনা পরিত্যাগ করিলেন। সর্ব্বদাই হরিসঙ্কীর্ত্তন ও হরিনামামৃত পানে কালযাপন করিতে লাগিলেন। তাঁহার শিষ্যগণ

পাঠজিজ্ঞাসা করিলে তৎ সমুদয় হরি পক্ষেই ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন। দেখিয়া শুনিয়া ছাত্রগণ অন্য চতুষ্পাঠীতে চলিয়া গেল। অচিরে এই সংবাদ নবদ্বীপস্থ ভক্তমণ্ডলির মধ্যে প্রচার হইয়া গেল। এই শুভ সংবাদ শ্রবণে তাঁহাদের আনন্দের সীমা রহিল না।

এই সময়ে হইতে তিনি শ্রীবাসের গৃহে হরিসভা করিতে লাগিলেন। সমস্ত দিন রাত্রি হরিগুণকথন ও হরিসংকীর্ত্তনেই অতিবাহিত হইতে লাগিল। নবদ্বীপবাসী শাক্তগণ বহির্দ্দেশ হইতে নানা প্রকার অত্যাচার ও চিৎকার করিয়া তাঁহাদের সভার বিঘ্ন জন্মাইতে লাগিল। এই সময়ে অবধূত নিত্যানন্দ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বীরভূমের অন্তর্গত সাঁইথিয়ার নিকটবর্ত্তী একচাকা গ্রাম নিতাইএর জন্মভূমি। তাঁহার পিতার নাম হাড়োওঝা, মাতার নাম পদ্মাবতী। হাড়ওঝা রাঢ়ীশ্রেণীয় ব্রাহ্মণ ছিলেন। এই ব্রাহ্মণদম্পতি পরম ধার্ম্মিক ছিলেন। এক দিন এক সন্যাসী, অতিথি হইয়া তাঁহাদের নিকট নিত্যানন্দকে ভিক্ষা প্রার্থনা করিলেন। জনকজননী অতিথির অবমাননা করা অধর্ম্ম বিবেচনায়, অতিথির হস্তে আপন প্রিয় পুত্রকে সমর্পন করিলেন। পাঠকগণ চারি শত বৎসর পূর্ব্বে হিন্দু-ধর্ম্মে বঙ্গবাসীর কিরূপ বিশ্বাস ছিল দেখুন। তাহারা ধর্ম্মের অনুরোধে পুত্রকেও বিসর্জ্জন দিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। এদিকে বালক নিত্যানন্দ সন্ন্যাসীর সহিত নানা তীর্থ পর্য্যটন করিয়া কিছুদিন মথুরায় অবস্থান করেন, নিতাই তথায় চৈতন্যের ভক্তির কথা শুনিয়া নবদ্বীপে আসিয়া উপস্থিত হন।

নিত্যানন্দের সঙ্গমে নিমাইয়ের হরিসঙ্কীর্ত্তন চতুর্গুণে বর্দ্ধিত হইল। পথে পথে কীর্ত্তনের দল লইয়া ধর্ম্মোপদেশ দিতে লাগিলেন। অনেকেই চৈতন্যের মতাবলম্বী হইল বিরোধীপক্ষেরা কহিতে লাগিলেন, "হিন্দুধর্ম্মের লোপের জন্যই কীর্ত্তনের সৃষ্টি হইয়াছে। মনষা বা চণ্ডীরই কীর্ত্তন হইয়া থাকে, কৃষ্ণের আবার কীর্ত্তন হয় ইহা কখন শুনা যায় নাই। অতএব এরূপ নূতনবিধ কীর্ত্তন যে হিন্দু ধর্ম্মের উচ্ছেদের জন্যই প্রচারিত হইয়াছে সন্দেহ নাই"। ইহাতে জানা যাইতেছে, চৈতন্যের সময় হইতে হরিসঙ্কীর্ত্তনের সৃষ্টি হইয়াছে।

জগাই ও মাধাই—এই সময়ে নবদ্বীপে শক্তি উপাসনা অতিশয় প্রবল ছিল। নবদ্বীপের প্রায় সমস্ত ব্রাহ্মণপণ্ডিতই শাক্ত ছিলেন। ইহাদের মধ্যে জগাই ও মাধাই নামক দুই ভ্রাতা ঘোরতর শাক্ত ছিলেন। জগাই ও মাধাই বাল্যকাল হইতে সুরাশক্ত হওয়ায় যারপরনাই কুক্রিয়াশালী হইয়াছিলেন। নবদ্বীপস্থ প্রায় সমস্ত লোকই ইহাদের অত্যাচারে পীড়িত ও ব্যতিব্যস্ত হইয়াছিল। জগাই ও মাধাই, নিমাইয়ের হরিসংকীর্ত্তনে অতিশয় বিরক্ত হইয়াছিলেন। এবং কোনরূপে উহার বিপক্ষতাচরণ করিতে পারিলে অপরিসীম আনন্দ অনুভব করিতেন। একদিন নিত্যানন্দ ভক্তগণ সমভিব্যাহারে নবদ্বীপের বাজার দিয়া হরিসংকীর্ত্তন করিতে করিতে যাইতেছিলেন। ঐ দিবস জগাই ও মাধাই কতকগুলি মদোন্মত্ত স্বপক্ষীয় লোক সঙ্গে করিয়া নিত্যানন্দকে আক্রমণ করিল। উভয় পক্ষে ঘোরতর বিবাদ উপস্থিত হইল। কাহার বা পদ কাহারও বা হস্ত কাহারও বা মৃদঙ্গ ভাঙ্গিয়া গেল।

বিশেষত মাধাই একটী কলসীর কাণা লইয়া নিত্যানন্দের মস্তকে এমন আঘাত করিল যে, সেই প্রহারে তাঁহার মস্তক বিদ্ধ হইয়া অজস্র শোণিতধারা বহিতে লাগিল। নিতাই আঘাতে ব্যথিত না হইয়া প্রেমবিহ্বল হইয়া মাধাইকে আলিঙ্গন করিতে উদ্যত হইলেন। তখন মাধাই পুনরায় প্রহার করিতে উদ্যত হওয়ায় জগাইএর প্রাণে দয়ার উদ্রেক হইল; সে মাধাইকে প্রহার করিতে না দিয়া তাহার হস্ত ধারণ করিল।

নিমাই এই সংবাদ শ্রবণে যারপরনাই ক্রুদ্ধ হইয়া তৎ-ক্ষণাৎ তথায় উপস্থিত হইলেন এবং নিত্যানন্দের গাত্রে রক্ত-ধারা দেখিয়া ক্রোধান্ধ হইয়া তাহাদিগকে শাস্তি দিতে উদ্যত হইলেন। কিন্তু নিতাইয়ের অনুবোধে তাঁহার তৎ-ক্ষণাৎ সে ভাব তিরোহিত হইল। তিনি যখন শুনিলেন যে, মাধাই মারিতে উদ্যত হইলে, জগাই নিবারন করিয়াছে তখন প্রেমে তাঁহার হৃদয় উথলিয়া উঠিল। তখন তিনি "আয়রে জগাই কোলে আয়" বলিয়া তাহাকে গাঢ় আলিঙ্গন করিলেন। এই উভয় ভ্রাতাই পূর্ব্ব হইতে এই নীতি বহির্ভূত কার্য্য করিয়া অনুতপ্ত হইয়াছিল। এক্ষণে নিমাইয়ের এই অসাধারণ প্রেমময় ভাব দেখিয়া একেবারে গলিয়া গেল। এবং তৎক্ষণাৎ নিমাইএরশরণাপন্ন ও ক্ষমা প্রার্থণা পূর্ব্বক তাঁহার চরণে লোটাইয়া পড়িল। তখন দয়াময় নিমাই তাঁহাদিগকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক ক্রোড়ে ধারন করিয়া তাহাদের সকল অপরাধ ক্ষমা করিলেন। তদবধি জগাই ও মাধাই সকল অসৎবৃত্তি পরিত্যাগ পূর্ব্বক পরম বৈষ্ণব হইল। এবং

হরিনামের যে কি মাহাত্ম্য তাহা এই জগাই ও মাধাইএর জীবনে অতি উত্তমরূপে প্রকাশিত হইল।

মুসলমানদিগের অধিকারকাল হইতে নবদ্বীপে একজন কাজী বাস করিতেন। ঐ কাজীর সহিত আর একটী বিবাদ হয়। কিন্তু ইহাতেও নিমাই জয়লাভ করিয়াছিলেন। নিমাইএর মাতামহ, নীলাম্বর চক্রবর্ত্তীর সহিত কাজীর বিশেষবন্ধুত্ব ছিল। নীলাম্বরের অনুরোধে নিমাই একদিন কাজীর সহিত ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় কথায় প্রবৃত্ত হন, তাহাতে কাজী পরাজিত হইয়া নিমাইএর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করেন। ও নিমাইএর মতানুবর্ত্তন করেন।

নিমাইএর প্রথম চব্বিশ বৎসর বয়স এইরূপে গত হইল। অতঃপর মহাপুরুষ নিমাইএর জীবন-প্রবাহ আর এক অভিনব পথ অবলম্বনে উৎসুক হইল। তিনি দেখিলেন যে বৈষ্ণব ধর্ম্ম গ্রহণ করায় পণ্ডিতগণ তাঁহার সহিত বাক্যালাপ পরিত্যাগ করিলেন। শাক্তগণও তাঁহার বিরোধী হইলেন। তাঁহাদিগকে ভক্তিপথে আনয়ন করা তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু তাঁহাদের সহিত আলাপ না হইলেই বা তাঁহাদিগকে কিরূপে স্বমতে আনয়ন করেন। কিন্তু সন্ন্যাসীকে কি শাক্ত কি বৈষ্ণব কি পণ্ডিত সকলেই ভক্তি-সহকারে সম্মান করিয়া থাকেন। অতএব সন্ন্যাসী হইলে এই সকল লোকেরা আমাকে শ্রদ্ধা করিবে ও ইহাদের সহিত আমার আলাপ হইবে, তখন আমি অনায়াসেই সিদ্ধকাম হইতে পারিব। এই বিবেচনা করিয়া তিনি সন্ন্যাসী হইবার বাসনা করিলেন। কন্তু মাকে না বলিয়া গৃহত্যাগ করিলে নিশ্চয়ই মাতৃ-হত্যা-

পাপে লিপ্ত হইতে হইবে এই ভাবিয়া মাকে মনোগত অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন। সরলমতি শচীদেবী পুত্রের এই নিদারুণ কথা শুনিয়া শোকে ম্রিয়মাণা হইলেন। কিন্তু যখন দেখিলেন যে নিমাই আর কোন বাধাই মানিবেন না তখন অগত্যা সম্মত হইলেন।

নিমাই মাতার নিকট সম্মতি পাইলেন। কিন্তু পত্নীর নিকটও তাঁহার সম্মতি লওয়া আবশ্যক। তজ্জন্য রজনীর অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। তৎকালে দিবাভাগে গুরুজন সমক্ষে পত্নীর সহিত আলাপ করা নিন্দনীয় ও সমাজবিরুদ্ধ ছিল। তজ্জন্য দিবাভাগে উভয়ের কোন কথা হইল না। ক্রমে রজনী সমাগত হইল। নিমাই শয়নগৃহে গমন করিলেন। বিষ্ণুপ্রিয়া দিবাভাগে মাতা ও পুত্রের সমস্ত কথা শুনিয়াছিলেন, তাঁহার আর বুঝিতে কিছু বাকী ছিল না। তিনি শয়নগৃহে প্রবেশ করিয়াই দেখিলেন প্রিয় পতি নিদ্রা যাইতেছেন। বিষ্ণুপ্রিয়া তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ না করিয়া তাঁহার পদতলে বসিয়া তাঁহার পা দুখানি হৃদয়ে ধারন করিলেন এবং পুনঃপুন চুম্বন করিতে লাগিলেন। তাঁহার নীরব অশ্রুধারায় গৌরের পদযুগল অভিষিক্ত হইল। উষ্ণ-জলস্পর্শে নিমাইএর নিদ্রাভঙ্গ হইল। নিদ্রা ভঙ্গে তিনি প্রিয়পত্নীকে ক্রোড়ে ধারণ করিয়া নানা প্রকার সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন। বিষ্ণুপ্রিয়া স্বামীর কথার উত্তর না দিয়া নীরবে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। তাঁহার কথা কহিবার শক্তি ছিল না। তিনি অচেতন প্রায় হইয়াছেন। তখন নিমাই কহিলেন প্রিয়ে কি হয়েছে বল ? কাঁদছ কেন ?

গৌরের এই মধুর সম্ভাষণে বিষ্ণুপ্রিয়া কিঞ্চিৎ ধৈর্য্য অবলম্বন করিয়া, কহিলেন 'নাথ তুমি নাকি আমাকে ছাড়িয়া সন্ন্যাস করিবে? আমি যে তোমাকে পতি পাইয়া বড় ভাগ্যবতী হইয়াছিলাম? আমার যে কত আশা ছিল? কিন্তু আমি আমার জন্ম ভাবিতেছি না, তোমার জন্যই আমার বড় ভয়, তুমি কেমন করিয়া এই নবীন বয়সে সন্ন্যাসীর কঠোর দুঃখ বহন করিবে? তোমার সন্ন্যাস গ্রহণে তোমার অনাথিনী মাতা নিশ্চয়ই প্রাণত্যাগ করিবেন। ধর্ম্ম সাধন করিতে গিয়া মাতৃহত্যা পাপে লিপ্ত হইতে হইবে। এবং আমাদিগকে, এই অবস্থায় পরিত্যাগ করিয়া গেলে, লোকে তোমার বিশুদ্ধ চরিত্রে কলঙ্কার্পণ করিবে, তাহাই বা কি প্রকারে সহ্য করিব?

গৌরচন্দ্র পত্নীর এই সকল কথা শুনিয়া ধীরমনে তাঁহাকে বুঝাইতে লাগিলেন। গৌরাঙ্গ কহিলেন প্রিয়ে! কে কাহার পতী, কে কার পত্নী' সেই শ্রীকৃষ্ণই সকলের পতি। তুমি, আমি, আর যা কিছু দেখিতেছ এ সকলই প্রকৃতি, তিনিই একমাত্র পুরুষ।

"কি নারী পুরুষ দেখ, সবার সে আত্মা এক
মিছা-মায়া বদ্ধভাবে দুই।
শ্রীকৃষ্ণ সবার পতি, আর সব প্রকৃতি
এ কথা না বুঝে মাত্র কেই।" চৈঃ মঃ

অতএব তাঁহাকেই পতিরূপে বরণ করিয়া যোগাভ্যাস কর, তিনি আমাদের সকলের পতি। তাঁহাকে পতিরূপে বরণ করিতে পারিলে আর কখন বিচ্ছেদ হইবে না, সে

প্রেমের সমান আর প্রেম নাই। বিষ্ণুপ্রিয়া কহিলেন—সত্য শ্রীকৃষ্ণ জগতের পতি, কিন্তু আমার এমন কি তপস্যা যে তাঁহাকে প্রাপ্ত হইব? তাই বলিতেছি আমাদিগকে অকূল দুঃখ সাগরে ভাসাইও না। তখন গৌরচন্দ্র কহিলেন, "আমার প্রতি ভগবানের আদেশ অন্যরূপ। আমি নিজে স্বাধীন নহি, আমি তাঁহার আজ্ঞার একান্ত অধীন" এই বলিয়া, তিনি প্রিয় পত্নীকে নানামতে বুঝাইয়া বারবার প্রেমভরে আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন—তোমরা আমার অন্তর হইতে মুহূর্ত্তের জন্যও অন্তর্হিত হইবে না। আমি যখন যেখানে থাকিব তোমার হৃদয়ে মিশিয়া থাকিব।" তখন বিষ্ণুপ্রিয়া স্বামীকে প্রতিনিবৃত্ত করিবার আর কোন উপায় নাই বুঝিয়া স্থির ও গম্ভীর স্বরে কহিলেন "নাথ তুমি ভগবানের আদেশ পালনে ব্রতী, আমি সে ব্রত ভঙ্গ করিয়া পাপভাগিনী হইতে চাহিনা। আমার সাংসারিক সুখে কিছু মাত্র প্রয়োজন নাই। তোমার যাহাতে সুখ আমারও তাহাতেই সুখ, আমি আর তোমাকে দুঃখ জানাইয়া তোমার কর্ত্তব্য কার্য্যের বাধা দিতে চাহিনা।" এইরূপে চৈতন্যদেব প্রিয়পত্নীর নিকট বিদায় লইলেন।

১৪৩১ শক বা ১৫০৯ খৃষ্টাব্দে উত্তরায়ণ সংক্রান্তির পূর্ব্ব দিবস নিমাই গৃহত্যাগ করিলেন। শচী দেবী শোকে অধীর এবং পাগলিনীর প্রায় হইয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন। বিষ্ণু-প্রিয়া সতী শোকে অধীর হইয়া ধরাতলে পড়িয়া রহিলেন। গৌরের আনন্দময় ভবন শ্মশানের ন্যায়

হইয়া উঠিল। চৈতন্যের গৃহত্যাগে তাঁহার চিরশত্রুগণও কোন ক্রমেই অশ্রুসম্বরণ করিতে সমর্থ হয় নাই।

নিমাই গৃহত্যাগ করিয়া কাটোয়াভিমুখে যাত্রা করিলেন। কাটোয়ায় তৎকালে কেশব ভারতী নামে একজন দণ্ডী ছিলেন। নিমাই উত্তরায়ণ সংক্রান্তি দিবসে তাঁহার নিকট দীক্ষিত হন। এই সময় তাঁহার বয়স পঁচিশ বৎসর মাত্র। তিনি এই নবীন বয়সে সংসার সুখে জলাঞ্জলি দিয়া পথের ভিখারী হইলেন। দীক্ষার পর ভারতী মহাশয় কি নাম রাখিবেন ভাবিতেছিলেন এমন সময়ে "শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য" এই দৈববাণী হইল। তদনুসারে তাঁহার নাম 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য' হইল।

যোগীবর চৈতন্যদেব কএক দিবস পথে পথে হরিসংকীর্ত্তন করিয়া শান্তিপুরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এবং নবদ্বীপ হইতে মাতাকে আনাইয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। শচীদেবী নিমাইয়ের দণ্ডীবেশ দেখিয়া অবিরলধারে অশ্রুবিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। এবং পুত্রকে ক্রোড়ে ধারণ করিয়া কহিলেন "বৎস নিমাই! বিশ্বরূপের ন্যায়ে নিষ্ঠুর ব্যবহার করিও না, সন্ন্যাসী হইয়া আমাকে ভুলিও না, মধ্যে মধ্যে দেখা দিয়া আমার প্রাণ রক্ষা করিও।" তখন নিমাই কহিলেন, মা এ জীবনে আপনার ঋণ হইতে মুক্ত হইতে পারিব না। আপনি যে শরীর পোষণ করিয়াছেন, সেই আমার দেহ আপনারই আছে জানিবেন। আপনি যখন যাহা আজ্ঞা করিবেন আমি তৎক্ষণাৎ তাহা সম্পন্ন করিব। সন্ন্যাসী বলিয়া আমার মন পার্থিবসকল সকল বস্তু হইতে

নিস্পৃহ থাকিতে পারে, কিন্তু আপনাকে কথনই ভুলিতে পারিব না। অতঃপর চৈতন্যদেব মাতৃআদেশে নীলাচলে থাকিতে স্বীকৃত হন।

পুরীযাত্রা ও সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য—চৈতন্যদেব কএক দিবস শান্তিপুরে থাকিয়া মাতা ও সঙ্গীগণের নিকট বিদায় লইয়া নিতাই ও গদাধর প্রভৃতি কএক জন শিষ্য সমভিব্যাহারে পুরী যাত্রা করিলেন। কএক দিন নানা স্থান পরিভ্রমণ করিয়া ক্রমে কটক, জাজপুর আদি পরিভ্রমণ করত কমলপুরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এই স্থান হইতে জগন্নাথ দেবের মন্দিরের ধ্বজা দৃষ্ট হয়। ধ্বজা দেখিয়া চৈতন্যদেব আনন্দে বিহ্বল হইলেন। এবং সমস্ত সঙ্গীগণকে ছাড়িয়া দ্রুতপদে মন্দিরাভিমুখে অগ্রসর হইলেন। তিনি শ্রীমন্দিরে উপস্থিত হইলে জগন্নাথ দর্শনে তাঁহার প্রেমসিন্ধু একেবারে উদ্বেল হইয়া উঠিল। তিনি জগন্নাথকে আলিঙ্গন মানসে যেমন অগ্রসর হইবেন, অমনি প্রেম বিহ্বল হইয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। এই সময়ে সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য উপস্থিত ছিলেন। তিনি, চৈতন্যের তথাবিধ অবস্থা দেখিয়া বাহকদ্বারা তাঁহাকে তুলিয়া নিজগৃহে লইয়া গেলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে নিত্যানন্দ প্রভৃতি শিষ্যগণ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মুকুন্দ উচ্চৈঃস্বরে হরিসঙ্কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। বেলা তৃতীয় প্রহরের সময়ে গৌরচন্দ্র চৈতন্য লাভ করিলেন। এবংশিষ্যমণ্ডলীদিগকে পশ্চাতে রাখিয়া আঁসিয়াছিলেন বলিয়া মিষ্টবাক্যে তাঁহাদিগকে সান্ত্বনা করিলেন।

অনন্তর সার্ব্বভৌম শুনিলেন যে নবীন সন্ন্যাসী নবদ্বীপ নিবাসী জগন্নাথ মিশ্রের পুত্র এবং নীলাম্বর চক্রবর্ত্তীর দৌহিত্র—এই পরিচয় পাইয়া তিনি নিরতিশয় আহ্লাদিত হইলেন। সার্ব্বভৌমের ও নিবাস নবদ্বীপ। তাঁহার পিতাও নীলাম্বর সমসাময়িক লোক ছিলেন। চৈতন্যের অলোক-সামান্যরূপ-লাবণ্য, প্রেমপূরিত-চক্ষু, আলিঙ্গনদান, ধর্ম্মে-একাগ্রতা, মনোমুগ্ধকরীচরিত্র ও সুমধুর-হাস্য যাহা মনুষ্য মাত্রকেই এমন কি অগাধবিদ্যা-বুদ্ধি-সম্পন্ন অদ্বৈত আচার্য্যকে ও মুগ্ধ করিয়াছিল; নবদ্বীপে অবস্থানকালে এই পণ্ডিতের মনমুগ্ধ করিতে পারেন নাই। কিন্তু এই স্থানে চৈতন্যদেব সার্ব্বভৌমের হৃদয় অধিকার করিলেন।

ভোজনান্তে বাসুদেব কহিলেন, "যে নবদ্বীপ সম্বন্ধে তুমি আমার গৌরবের পাত্র। বিশেষত যখন তুমি সন্ন্যাসী হইয়াছ তখন আমার বিশেষ পূজনীয়।" এই কথায় চৈতন্যদেব বিষ্ণুস্মরণ পূর্ব্বক কহিলেন, "আপনি আমাকে ওরূপ কথা বলিবেন না। আপনি জগৎ গুরু ও আমার পরম পূজনীয়। আমি বালক জ্ঞানহীন, আপনার শরনাপন্ন হইলাম। আমাকে শিক্ষা দান করুন। যদিও আমি জগন্নাথ দর্শনে এখানে আসিয়াছি কিন্তু আপনাকে দর্শন করাই আমার মূল উদ্দেশ্য। কিরূপ করিলে আমার সন্ন্যাসধর্ম্ম রক্ষা পায়, পুনর্ব্বার সংসার মায়ায় মুগ্ধ হইতে না হয় তাহাই আমাকে উপদেশ দিন। আমি আপনার শরণাপন্ন হইয়া আপনাকে গুরু পদে বরণ করিলাম।"

সার্ব্বভৌম গৌরের মধুর সম্ভাষণে সন্তুষ্ট হইয়া, কহিলেন

"তুমি পরম শুবুদ্ধি হইয়া অন্যায় কার্য্য করিয়াছ। তুমি এই অল্প বয়সে সন্ন্যাস-ধর্ম্ম অবলম্বন করিলে কেন? মাথা মুড়াইয়া মাতা ও স্ত্রী ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হইলে কি লাভ হয়? বরঞ্চ বয়োজ্যেষ্ঠ ও মহাসম্মানিত ব্যক্তিগণ প্রণাম করেন তাহাতে প্রত্যবায়ভাগী হইতে হয়। সন্যাসী কাহার নিকট প্রণত হন না। যদিও মাধবেন্দ্রপুরী প্রভৃতি অনেকে সন্যাসধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন; কিন্তু তাঁহারা সকলেই জীবনের শেষভাগে ঔদ্ধত্য নষ্ট হইলে এই পথেরপথিক হইয়াছিলেন। তোমার এ নবীন বয়সে সন্যাসী হওয়া ভাল হয় নাই।

চৈতন্য কহিলেন "আমাকে সেরূপ সন্যাসী মনে করিবেন না। আমি হরি-বিরহে নিতান্ত কাতর হইয়া সংসারাশ্রম, ও শিখা সূত্র পরিত্যাগ করিয়া তাঁহাকে পাইবার জন্য ঘরের বাহির হইয়াছি, অহঙ্কার বিনাশ জন্যই আমার শিখা সূত্র ত্যাগ করা।"

তখন সার্ব্বভৌম মনে মনে বিবেচনা করিলেন, ইহাঁকে বেদান্ত অধ্যয়ন করাইয়া পুনরায় গৃহাশ্রমে আনয়ন করিতে হইবে। তিনি প্রকাশ্যে কহিলেন—বেদাধ্যয়ন ও বেদপাঠ শ্রবণই সন্যাসীর কার্য্য। অতএব তুমি আমার বাটীতে প্রত্যহ বেদ পাঠ শ্রবণ করিবে। চৈতন্য কহিলেন, "আপনি যাহা আজ্ঞা করিবেন তাহাই আমার কর্ত্তব্য।" এই বলিয়া তিনি বেদান্ত ব্যাখ্যা শুনিতে লাগিলেন। এই রূপে সপ্তাহ অতীত হইল। কিন্তু চৈতন্য, ভাল কি মন্দ একটী কথাও কহিলেন না। অষ্টম দিবসে, সার্ব্বভৌম জিজ্ঞাসা করিলেন সাত দিন বেদান্ত পাঠ শুনিলে, কৈ কোন উত্তর করিলেন না। বুঝিতে

পারিয়াছ কি? তখন চৈতন্য দেব উত্তর করিলেন—আমি বেদান্ত সূত্রের অর্থ উত্তম বুঝিতে পারিতেছি কিন্তু ভাষ্যের অর্থ কিছু বুঝিতে পারিতেছি না। ভাষ্যে মুখ্যার্থ গোপন করিয়া গৌণার্থ প্রকাশ করিতেছে।

অনন্তর সার্ব্বভৌমের সহিত ঐ বিষয়ে নানা প্রকার তর্ক বিতর্ক হইল। কিন্তু সার্ব্বভৌম একেবারে পরাস্ত হইলেন। তখন চৈতন্যদেব কহিলেন "আপনি যে বিদ্যায় বিভূষিত তাহাতে ঐশ্বরিক কোন বিষয় জানিতে সমর্থ নহেন, ঈশ্বরকে জানিতে হইলে তাঁহাকে বিশ্বাস ব্যতীত পাওয়া যায় না। ভগবানের সহিত আমাদেয় চির সম্বন্ধ। ভক্তি যোগে সেই সম্বন্ধ বুঝিতে পারা যায়। ধর্ম্মের যদি কোন উদ্দেশ্য থাকে তবে সে ভাগবানে প্রেম ও ভক্তি। আত্মারাম মুনিগণও ভগবানে ভক্তি করিয়া থাকেন। এই বলিয়া তিনি ভাগবতের নিম্ন লিখিত শ্লোক আবৃত্তি করিলেন।

"আত্মারামশ্চ মুনয়ো নির্গ্রন্থা অপ্যুরুক্রমে।
কুর্ব্বন্ত্য হৈতুকীং ভক্তি মিথং ভূত গুণোহরিঃ"।

ভগবানের এতাদৃশ গুণ যে যাঁহারা আত্মারাম ঋষি, ও মৌনব্রতাবলম্বী, যাঁহাদের হৃদয় গ্রন্থি ছিন্ন হইয়াছে তাঁহারাও তাঁহাকে অহৈতুকী ভক্তি করিয়া থাকেন।

সার্ব্বভৌম এই শ্লোকের ব্যাখ্যা শুনিতে চাহিলে চৈতন্য কহিলেন "আপনি মহাপণ্ডিত আপনি আগে ব্যাথা করুন। পরে আমি যা জানি বলিব।" তখন সার্ব্বভৌম আপনার পাণ্ডিত্যের বলে ত্রয়োদশ প্রকার ব্যাখ্যা করিলেন, চৈতন্য তাঁহার সেই ব্যাথা ব্যতীত আঠার প্রকার নূতন

ব্যাখা করিলেন। তখন ভট্টাচার্য্য আপনার বিদ্যাবুদ্ধিতে ধীক্কার দিয়া চৈতন্যের শরণাপন্ন হইলেন।

তদনন্তর সার্ব্বভৌম গৌরাঙ্গকে সাধনের উপায় জিজ্ঞাসা করিলেন। তখন চৈতন্য কহিলেন, কলিতে নাম সঙ্কীর্ত্তন করাই শ্রেষ্ঠসাধন।

"তৃণাদপি সুনীচেন, তরোরিব সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন, কীর্ত্তনীয়া সদাহরি॥"

তৃণের ন্যায় সুনীচ, তরুর ন্যায় সহিষ্ণু, এবং অভিমান শূন্য হইয়া সর্ব্বদা হরি নাম করিবে। মায়াবাদী সার্ব্বভৌম-ভট্টাচার্য্য চৈতন্যের কৃপায় ভক্তিপথ অবলম্বন করিয়াছেন শুনিয়া, নীলাচলবাসী কাশীমিশ্র প্রভৃতি অনেকানেক প্রধান পণ্ডিত চৈতন্যের পথাবলম্বী হইলেন।

তীর্থযাত্রা ও রায়রামানন্দ—১৫০৯ খৃষ্টীয় অব্দের বৈশাখ মাসে চৈতন্যদেব তীর্থ পর্য্যটন মানসে দাক্ষিণাত্য যাত্রা করেন। তিনি ক্রমে জীয়ড়নৃসিংহক্ষেত্র অতিক্রম করিয়া কএক দিন পরে গোদাবরীতীরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি গোদাবরীর নির্ম্মল জল দর্শনে বৃন্দাবন মনে হওয়ায় নদীজলে সন্তরণ ও অবগাহন ও জল-ক্রীড়া করিতে লাগিলেন। এই স্থানের নাম বিদ্যানগর বা রাজমহেন্দ্রী। কিছুক্ষণ পরেই রামানন্দ রায় দোলাবরোহনে বহুসংখ্যক লোক সমভিব্যাহারে স্নানার্থ নদী-তীরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। রামানন্দকরণবংশীয় ও গোদাবরী প্রদেশের শাসনকর্ত্তা ছিলেন বলিয়া তাঁহার রাজোপাধি ছিল। রামানন্দ সন্ন্যাসী দেখিয়া নিকটে গমনপূর্ব্বক প্রণাম করিলেন।

চৈতন্যদেব সার্ব্বভৌমের মুখে রামানন্দের কথা শুনিয়াছিলেন এক্ষণে এই রাজপুরুষকে প্রণাম করিতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, আপারই নাম কি রায় রামানন্দ? রাজপুরুষ উত্তর করিলেন "হাঁ আমি সেই অধমই বটী"। তখন চৈতন্য দেব তাঁহাকে গাঢ় আলিঙ্গন করিলেন। অনন্তর মধ্যাহ্নাদি সমাপনান্তে সন্ধ্যা সমাগত হইলে উভয়ের কথোপকথন আরম্ভ হইল।

চৈতন্য কহিলেন—সাধ্যবস্তু কি!

রামানন্দ কহিলেন—স্বধর্ম্মাচরণ অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারি বর্ণের, ঋষিগণ যে যে আশ্রমধর্ম্ম নিরূপণ করিয়াছেন তাহাই যাজনা করিয়া ভগবানের আরাধণা করার নাম স্বধর্ম্মচরণ।

চৈতন্য কহিলেন—এ বাহিরের কথা গুঢ় কথা বল?

রামানন্দ কহিলেন—ভগবানে কর্ম্মার্পণ অর্থাৎ দান ধর্ম্মাদি সকল কার্য্যের ফলই ভগবানে অর্পণ করিতে হইবে।

চৈতন্য—এও বাহিরের কথা।

রামানন্দ—তবে স্বধর্ম্মত্যাগই শ্রেষ্ঠ অর্থাৎ বর্ণাশ্রম নিরূপিত ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া ভক্তিসাধন করাই শ্রেয়।

চৈতন্য—ইহাও বাহিরের কথা।

রামানন্দ—জ্ঞানমিশ্রাভক্তিই সাধনের সার। অর্থাৎ যাহার বিপদ সম্পদ শুভাশুভ সমজ্ঞান হইয়া চিত্ত-নির্ম্মল ও প্রসন্নতালাভ করিয়াছে তিনিই পরাভক্তিলাভ করিয়াছেন।

চৈতন্যদেব—ইহাও বাহিরের ধর্ম্ম ইহার পর কি বল—

রামানন্দ—জ্ঞানবর্জ্জিতভক্তিই শ্রেষ্ঠ সাধনা অর্থাৎ যিনি

জ্ঞানান্নুসন্ধানে রত না হইয়া সাধুজনপ্রদর্শিত পন্থা অবলম্বন করেন, ভগবান অন্যের দুষ্প্রাপ্য হইলেও এরূপ লোকের নিকট আপনারস্বরূপ প্রকাশ করিয়া থাকেন।

চৈতন্য—আর কি সাধন আছে ?

রামানন্দ—প্রেমভক্তিই সাধনের সার এইরূপ কথাবার্ত্তায় প্রসঙ্গে ক্রমশ শান্ত, দাস্য, সখ্য বাৎসল্য ও মধুর বা কান্তরসের অবতারণা হইল এবং "মহাভাবই" সাধনার চরম অবস্থা ইহাই সিদ্ধান্ত হইল।

চৈতন্য—যতদূর বলিলেন ইহাই সাধনার চরম অবস্থা বটে, কিন্তু যদি ইহার পর আর কিছু থাকে তবে বলুন।

রামানন্দ—ইহার পরের কথা জিজ্ঞাসা করে জগতে এমন লোক আছে বলিয়া জানিতাম না। কিন্তু সে কথা আছে শ্রীরাধার প্রেমই সাধনার পরের কথা। ইত্যাদি অনেক কথা শুনিয়া চৈতন্যদেব মহা আনন্দিত হইলেন।

রামানন্দের সহিত সাক্ষাতের পর তিনি দাক্ষিণাত্যে যাত্রা করিলেন। পথিমধ্যে শৈব ও রামাৎ সম্প্রদায়ের অনেক লোককে বৈষ্ণবধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়া শ্রীরঙ্গ ক্ষেত্রে উপস্থিত হন। তথায় বেঙ্কট ভট্টের আলয়ে চারি মাস অবস্থান করিয়া সেতুবন্ধ রামেশ্বর উপস্থিত হন। পথিমধ্যে তিনি কতকগুলি বৌদ্ধকে স্বমতে আনয়ন করেন। তথা হইতে দাক্ষিণাত্যের নানাস্থান পর্য্যটন করিয়া অবশেষে দ্বারকাতীর্থে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সেখানে কএকদিন থাকিয়া দণ্ডকারণ্যের নানাস্থান পরিভ্রমণ করত পুনরায়

ভক্ত রামানন্দের আশ্রমে আসিয়া উপনীত হইলেন। চৈতন্যদেব এইরূপে নির্ভয় চিত্তে শত শত যোজন পথ, অরণ্য, প্রান্তর অতিক্রম করিয়া প্রকৃত বীরেরন্যায় নীলাচলে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। ভক্তগণ বহুদিনের পর গৌরাঙ্গকে পাইয়া আনন্দ-সাগরে ভাসমান হইলেন।

গৌরাঙ্গ নীলাচলে আসিয়াই নিত্যানন্দ ও অদ্বৈতকে বঙ্গদেশে পাঠাইয়াদিলেন। এবং শ্রীবাসকে ডাকিয়া কহিলেন "প্রিয় শ্রীবাস মাকে আমার প্রণাম জানাইয়া এই বস্ত্রখানিও মহাপ্রসাদ প্রদান করিবে। আমার আরো অনুরোধ যে তুমি তাঁহার নিকট মিনতি করিয়া বলিবে "আমার সন্ন্যাসী হওন জনিত পাপকে এবং গৃহে থাকিয়া তাঁহার সেবা না করণ জনিত অপরাধকে যেন ক্ষমা করেন। আমি নির্বোধের ন্যায় কার্য্য করিয়াছি মূর্খ সন্তানদিগের মাতার নিকট ক্ষমা পাইবার অধিকার আছে।"

এই সময়ে চৈতন্যদেবের খ্যাতি এত অধিক প্রচারিত হইয়াছিল যে নরপতিগণও তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আগমন করিতেন। কিন্তু তিনি স্বয়ং কাহারও সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইতেন না। একদিন পুরীর রাজা প্রতাপ-রুদ্রদেব সার্ব্বভৌমকে অনুরোধ করেন, যে যেন চৈতন্যদেব একবার তাঁহার বাটীতে গিয়া বাটী পবিত্র করেন। কিন্তু চৈতন্যদেব তাহাতে সম্মত না হইয়া কহিলেন, যে ব্যক্তি ভবসাগর পারে গমনেচ্ছু তাঁহার স্ত্রীলোক ও সংসার ভোগ-সুখরত ব্যক্তিকে বিষ অপেক্ষা অনিষ্ট কর জ্ঞান করা উচিত।

বঙ্গদেশে প্রত্যাবর্ত্তন—অনন্তর চৈতন্যদেব পুনরায়

বঙ্গদেশে যাত্রা করিলেন। তিনি প্রথমে পানিহাটী পরে কাচড়া পাড়ায় শিবানন্দের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া সার্ব্বভৌমের ভ্রাতা বাচস্পতির বাটীতে উপনীত হইলেন। এই বাচস্পতির বাটী কোথায় ছিল তাহা নির্দ্দেশ নাই। চৈতন্যদেব উক্ত বাচস্পতির বাটীতে আসিয়াছেন শুনিয়া নবদ্বীপ ও পার্শ্ববর্ত্তী নানাস্থান হইতে বহুতর লোক সমাগত হইল। তথায় বহু লোক সমাগত হওয়ায় চৈতন্যদেব তথা হইতে অজ্ঞাতসারে রাত্রিযোগে কুলিয়া গ্রামে গমন করেন। এই কুলিয়াগ্রাম তৎকালে নবদ্বীপের পূর্ব্ব পারে ছিল চৈতন্যভাগবতে লিখিত আছে——

"সবে গঙ্গা মধ্যে নদীয়ায় কুলিয়ায়।
শুনি মাত্র সর্ব্ব লোক মহানন্দে ধায়।" চ, ভা,

চৈতন্য এখানে আসিয়াছেন শুনিয়া বহুতর লোক, পণ্ডিত ছাত্রগণ তথায় উপস্থিত হইলেন। এইস্থানে কএকদিন থাকিয়া চৈতন্যদেব রামকেলী নামক গ্রামে গমন করিলেন। এই নগরবঙ্গদেশের প্রাচীন রাজধানী গৌড়নগরের নামান্তর মাত্র। তৎকালে পাঠান বংশীয় সায়দ হোসেন সা বাঙ্গালার সিংহাসনে অধিরূঢ় থাকিয়া স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিতেছিলেন। চৈতন্য তথায় উপস্থিত হইলে নানাদেশীয় লোকে ঐ নগর পরিপূর্ণ হইয়া গেল। লোকের এত অধিক সমাগম হইয়াছিল যে রাজ-সেনাপতিকেও ভীত হইতে হইয়াছিল, কিন্তু তাঁহারা যখন জানিলেন যে একজন সন্ন্যাসী দর্শনে এই লোক সমাগম হইয়াছে তখন তাঁহারা নিশ্চিন্ত হইলেন।

রূপ ও সনাতন—দবিরখাস ও সাকরমল্লিক নামে দুই ভ্রাতা রাজসংসারে উজীরিপদে অভিষিক্ত ছিলেন। তাঁহারা চৈতন্যদেবের বক্তৃতার মোহিণী শক্তিতে মোহিত হইয়া রাত্রি দুই প্রহরের সময়ে দন্তে কুটা করিয়া গললগ্নীকৃত বাসে, অশ্রুপূর্ণ লোচনে চৈতন্যের বাসায় উপস্থিত হইলেন; এবং চৈতন্যকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন "হে জগাই মাধাই ত্রাতা পতিত পাবন, আমাদের প্রতি দয়া করুন। জগাই মাধাই নবদ্বীপ নিবাসী ব্রাহ্মণ-কুমার ছিলেন, তাঁহাদিগের অতি সহজেই উদ্ধার করিয়াছেন কিন্তু আমরা অধম ম্লেচ্ছ জাতী ও ম্লেচ্ছসঙ্গী বলিয়া আমাদিগকে ঘৃণা করিবেন না। হে দয়াময়! আমাদিগকে ত্রাণকরুন।" তখন দয়াময় শ্রীচৈতন্য দেব তাঁহাদিগকে আলিঙ্গন করিয়া শিষ্যরূপে গ্রহণ করিলেন। এবং তাঁহাদিগের নাম রূপ ও সনাতন রাখিলেন।

চৈতন্য চরিতামৃতে এই দুই জনের যেরূপ পরিচয় আছে তাঁহাতে ইহাঁদিগকে আপাততঃ ম্লেচ্ছ বংশসম্ভূত বলিয়াই অনুভূত হয়। কিন্তু শ্রীজীবকৃত লঘুতোষিণী গ্রন্থে ইহারা ব্রাহ্মণ বলিয়া জানা যায়। যাহাহউক ইহারা ম্লেচ্ছসংসর্গে ম্লেচ্ছভাবাপন্ন হইয়াছিলেন সন্দেহ নাই। অতঃপর চৈতন্য দেব শান্তিপুরে আগমন করিলেন এবং তথায় কিছুদিন থাকিয়া মাতার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া পুনরায় শ্রীক্ষেত্রে গমন করেন।

বৃন্দাবনযাত্রা—চৈতন্যদেব এইস্থানে বর্ষা চারিমাস অতিবাহিত করিয়া একমাত্র বলভদ্র শিষ্য সমভিহারে অরণ্য-পথে বৃন্দাবন যাত্রা করিলেন। পথিমধ্যে উড়িষ্যার উত্তর-

পশ্চিমে ঝাড়িখণ্ডের কতকগুলি নীচ জাতীয় ম্লেচ্ছ ও ভীল জাতীকে বৈষ্ণবধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়াছিলেন।

কএকদিবস দিবারাত্রি চলিয়া তিনি কাশীধামে উপস্থিত হইলেন। এইস্থানে কএকদিন থাকিয়া, প্রয়াগে উপস্থিত হন ; তথায় কিছুদিন থাকিয়া বৃন্দাবনযাত্রা করেন। বৃন্দাবনে উপস্থিত হইয়া, তিনি সকলি কৃষ্ণময় দেখিতে লাগিলেন এবং কৃষ্ণপ্রেমে মত্ত হইয়া বৃন্দাবন প্রদক্ষিণ করিতে লাগিলেন। বৃন্দাবন চৌরাশী ক্রোশ বিস্তৃত। এখন যে স্থানকে বৃন্দাবন কহে তাহা চৈতন্যদেবের প্রকাশিত বলিয়া প্রসিদ্ধ। যে স্থানে এখন গোবিন্দজীর মন্দির দৃষ্ট হয় তাহা তাঁহারই আবিষ্কৃত। তিনি শ্রীকৃষ্ণের ভক্তির ধর্ম্মকে পুনর্জ্জীবিত করেন বলিয়া তাঁহার আগমন সময় হইতে বৃন্দাবন একটী তীর্থ হইয়াছে।

বৃন্দাবনে কিছুদিন থাকিয়া পুনরায় প্রয়াগে আগমন করিলেন। পথি মধ্যে কতকগুলি পাঠান-মুসলমানকে তিনি বৈষ্ণবধর্ম্মে দীক্ষিত করেন। পাঠানদিগকে বৈষ্ণব করা তাঁহার অতিশয় সাহসের কার্য্য হইয়াছিল। এই কার্য্য করাতে চৈতন্যদেব, কি হিন্দু, কি মুসলমান উভয়েরই নিকট অনাদৃত হইয়াছিলেন। এপর্য্যন্ত ভারতের ইতিহাসে এইরূপ ঘটনা আর একটীও দেখা যায় নাই। কবির ও নানক ইঁহারা উভয়েই ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক ছিলেন। সুতরাং মুসলমানধর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। কিন্তু মুসলমানকে হিন্দুধর্ম্মে দীক্ষিত করিতে আর দেখা যায় নাই। এই পাঠানসকল সর্ব্বত্র হরিসঙ্কীর্ত্তন করিয়া হরিনাম প্রচার

করিতে লাগিলেন। ইঁহারা পাঠান-গোঁসাই বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছিলেন।

চৈতন্যদেব প্রয়াগে আসিয়া উপস্থিত হইলে, তথায় রূপ আসিয়া তাঁহার সহিত মিলিত হইলেন। রূপ ও সনাতন বৈষ্ণবধর্ম্ম গ্রহণাবধি রাজসংসারের কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। রূপ চৈতন্যদেবের বৃন্দাবনযাত্রা শ্রবণ করিয়া সমস্ত সম্পদ স্বীয় বৈষ্ণবস্বজনদিগকে বিভাগ করিয়া দিয়া বৃন্দাবন যাত্রা করিয়াছিলেন। প্রয়োগে চৈতন্যদেবের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। এখান হইতে চৈতন্য কাশীধামে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

সনাতন প্রথমে নবাবের নিকট বিদায় লইতে পারেন নাই। তিনি বিদায় লইবার জন্য প্রথমত নানাবিধ উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন। কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। অবশেষে পীড়ার ভাণ করিয়া গৃহে বসিয়া রহিলেন। নবাবের মনে সন্দেহ উপস্থিত হওয়ায় তিনি সনাতনের চিকিৎসার জন্য রাজবৈদ্যকে প্রেরণ করেন। উক্ত বৈদ্য সনাতনের পীড়া সম্পূর্ণ মিথ্যা বলিয়া নবাবের গোচর করেন। তখন নবাব সনাতনকে ডাকিয়া কহিলেন, "তোমার এইরূপ প্রবঞ্চনা করিবার কারন কি?" তখন সনাতন তাঁহাকে সমস্ত বিবরণ জানাইলেন। শুনিয়া নবাব তাঁহাকে বন্দী করিলেন।

এই সময়ে উড়িষ্যায় যুদ্ধ চলিতেছিল। নবাব সনাতনকে ডাকিয়া কহিলেন "যদি তুমি আমার সহিত যুদ্ধ যাত্রা কর তাহাহইলে আমি তোমার কারামোচন করিয়া দিই।" তখন

সনাতন কহিলেন "উড়িষ্যায় বিষ্ণুর বিখ্যাত অবতার জগন্নাথদেবেরমন্দির আছে, আমি কথনই সেইপবিত্রস্থানের বিরুদ্ধেযুদ্ধ যাত্রাকরিতে পারিবনা। আমি আপনার এইরূপ অনুগ্রহপ্রার্থী নহী।" এই উত্তরে নবাব ক্রুদ্ধ হইয়া পুনরায় বন্দী করিলেন।

কিছুদিন পরে সনাতন কারারক্ষীকে সাত হাজার টাকা উৎকোচ দিয়া প্রচ্ছন্নবেশে বন্দীশালা হইতে পলায়ন করিলেন, এবং কাশীধামে গৌরাঙ্গের সহিত মিলিত হইলেন। চৈতন্যদেব সনাতনকে আলিঙ্গন করিয়া অপরিসীম হর্ষ প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

কাশীধাম ও প্রকাশানন্দস্বামী—কাশীধামে মায়াবাদী সন্ন্যাসী ও দণ্ডীগণের বিষম প্রাদুর্ভাব। চৈতন্যদেব কাশীতে উপস্থিত হইলে, তথাকার সমস্ত দণ্ডী ও সন্ন্যাসী এবং পণ্ডিতবর্গ একমত হইয়া তাঁহার সহিত বৈষ্ণবধর্ম্ম সম্বন্ধে বিচার করেন। প্রকাশানন্দস্বামী তাঁহাদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। তিনি চৈতন্যদেবকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন "দেখ বেদ পাঠ ইত্যাদি সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া উন্মাদের ন্যায় কাল যাপন করিতেছ কেন? তদুত্তরে চৈতন্যদেব কহিলেন—"আমার গুরু আমাকে মূর্খ জানিয়া এই উপদেশ দিয়াছেন যে, তোমার বেদান্তে অধিকার নাই, কলিতে নাম জপই সার, তুমি কেবল কৃষ্ণনাম জপ কর; কৃষ্ণনাম জপ ও কৃষ্ণভক্তি করাই শ্রেষ্ঠ সাধন"। এই বলিয়া তিনি বৃহন্নারদীয় পুরাণের——

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলং।
কলৌনাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥

এই বচন আমাকে উপদেশ দিলেন। আমি সেই গুরুদেবের আদেশ পালনে পাগল হইয়াছি। এই বলিয়া চৈতন্য দেব হরিনামের মহিমাসূচক এক অপূর্ব্ব মনোহর বক্তৃতা করিলেন। তাঁহার বক্তৃতার মোহিনীশক্তিতে প্রকাশানন্দস্বামী প্রভৃতি দণ্ডীগণ হরিধ্বনী করিয়া গৌরাঙ্গের সহিত প্রেমরসে মত্ত হইলেন। এইরূপে কাশীতে হরিনামের ধ্বজা তুলিয়া চৈতন্যদেব পুনবায় নীলাচলে যাত্রা করিলেন। এই প্রকাশানন্দ স্বামীই বৈষ্ণবধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া "প্রবোধানন্দ" নামে বিখ্যাত হইয়াছেন।

সন্ন্যাস গ্রহণের পর চৈতন্যদেব ছয় বৎসরকাল এইরূপে ভারতের নানা স্থান পর্য্যটন করিয়া বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচার করেন। এখন তাঁহার বয়স ত্রিশ বৎসর মাত্র। অবশিষ্ট আটার বৎসর তিনি কেবল শ্রীক্ষেত্রেই অবস্থান করেন। নিতাই ও অদ্বৈতকে পূর্ব্বেই বঙ্গদেশে ধর্ম্মপ্রচারে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। এক্ষণে রূপ ও সনাতনকে বৃন্দাবনে ধর্ম্মপ্রচারার্থ প্রেরণ করিলেন। এখানে তিনি কেবল ক্রন্দন ও হরিসংকীর্ত্তন করিতেন এবং অনুচরদিগকে ধর্ম্ম বিষয়ে উপদেশ দিতেন। চৈতন্যের সময় হইতে প্রতি বৎসর অনেক যাত্রী জগন্নাথদেব দর্শনার্থে তথায় সমাগত হইতেন। এবং বঙ্গদেশ হইতে দলে দলে বৈষ্ণবগণ এইস্থানে আসিয়া চারিমাসকাল তাঁহার সহিত অতিবাহিত করিতেন। অনেকানেক ভিন্নধর্ম্মাবলম্বী লোকও তাঁহাদের সহিত আগমন করিতেন। কিয়ৎ পরিমানে চৈতন্যদেব হইতে ও কিয়ৎ পরিমানে পূর্ব্বমন্দিরাধ্যক্ষ বৌদ্ধগণ হইতে ঐস্থানে জাতিভেদ উঠিয়া যায়।

এক দিবস চৈতন্যদেব প্রত্যুষে সার্ব্বভৌমকে জাগাইয়া কহিলেন, "এই মহাপ্রসাদ আনিয়াছি গ্রহণ করুন।" প্রভুর আজ্ঞায় সার্ব্বভৌম তৎক্ষণাৎ তাহা ভক্ষণ করিলেন। তদবধি এইস্থানে অবস্থানকালে কোন ধর্ম্মপরায়ণ পবিত্র ব্রাহ্মণ কোন অপবিত্র চণ্ডাল প্রদত্ত ভোজ্যদ্রব্য (অন্ন) গ্রহণ করিতে বা ভক্ষণ করিতে সঙ্কুচিত হয়েন না।

এইসময়ে সনাতন গৌরদর্শনে বৃন্দাবন হইতে আগমন করেন। পথিমধ্যে তিনি অতি ঘৃণিত কুষ্ঠরোগে আক্রান্ত হন। তিনি নীলাচলে উপস্থিত হইয়া এই ঘৃণিত অবস্থায় চৈতন্যের সম্মুখে গমন করা অপকর্ম্ম বিবেচনায় জগন্নাথ দেবের রথচক্রে প্রাণত্যাগ করিবেন বাসনা করিয়া হরিদাসের আশ্রমাভিমুখে যাইতেছিলেন। ইতিমধ্যে চৈতন্যের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। সনাতনকে দৃষ্টিমাত্রই চৈতন্যদেব ব্যগ্রতা সহকারে দ্রুতপদে অগ্রসর হইলেন। সনাতন সঙ্কুচিত হইয়া পশ্চাৎপদ হইয়া কহিলেন "প্রভু আমাকে স্পর্শ করিবেন না, আমি অতি নীচ তাহাতে আবার অতি ঘৃণিত কুষ্ঠরোগে আক্রান্ত হইয়াছি, আমাকে ক্ষমা করুন।" কিন্তু চৈতন্যদেব তাহা না শুনিয়া তাঁহাকে গাঢ় আলিঙ্গন করিলেন। এবং কহিলেন, তোমার দেহ আমার পক্ষে অতি পবিত্র, ঘৃণা করিলে আমার ধর্ম্ম নষ্ট হইবে। যদি তোমাকে ঘৃণা করিতাম তাহাহইলে নিশ্চয়ই ভগবানের নিকট অপরাধী হইতাম।" পরে চৈতন্য দিব্যজ্ঞান প্রভাবে সনাতনের মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া কহিলেন যে "যদি দেহত্যাগ করিলে কৃষ্ণ পাওয়া যায়, তবে নিমেষের মধ্যে

কোটী কোটী দেহত্যাগ করিতে পার' যায়। কিন্তু তাহাতে ভগবানকে পাওয়া যায় না। কৃষ্ণপ্রাপ্তির উপায় ভক্তি ও ভজন। এইরূপে সনাতনকে বুঝাইয়া দিয়া বৃন্দাবনে পাঠাইয়া দিলেন। চৈতন্যদেবের স্পর্শে সনাতন রোগ মুক্ত হইয়াছিলেন।

চৈতন্যদেব স্ত্রীলোকদিগের ছায়াও স্পর্শ করিতেন না একদিন নীলাচলে যমেশ্বর টোটায় যাইতেছিলেন; পথিমধ্যে স্ত্রীকণ্ঠ-নিঃসৃত মধুর হরিনাম শ্রবণে মুগ্ধ হইয়া যেদিক হইতে কণ্ঠস্বর শুনা যাইতেছিল সেই দিকে ধাবমান হইলেন। তিনি যেমন স্ত্রীলোকটীকে আলিঙ্গন করিতে উদ্যত হইয়াছেন, এমন সময়ে সহচর গোবিন্দ দাস বলিয়া উঠিলেন 'স্ত্রীলোক' চৈতন্য স্ত্রীলোকের নাম শুনিয়া একেবারে চমকিয়া উঠিলেন ও তৎক্ষণাৎ তথা হইতে চলিয়া গেলেন। এবং গোবিন্দকে আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন "আজ তুমি আমার ধর্ম্ম রক্ষা করিয়াছ আর একটু বিলম্ব করিলেই আমি ধর্ম্মচ্যুত হইতাম।"

একদিন ছোট হরিদাস মাধবীদেবী নাম্নী কোন প্রাচীনা স্ত্রীলোককে তণ্ডুল সংগ্রহের জন্য ভিক্ষায় পাঠাইয়া দেন। চৈতন্যদেব এই কথা শুনিয়া ছোট হরিদাসকে পরিত্যাগ করেন। কথিত আছে ছোট হরিদাস এই পাপের প্রায়শ্চিত্তের জন্য প্রয়াগে ত্রিবেণীর জলে প্রাণত্যাগ করেন। ছোট হরিদাস ব্রাহ্মণ কুলোৎপন্ন প্রসিদ্ধ গায়ক ছিলেন। চৈতন্য তাঁহার কীর্ত্তন শ্রবণে মোহিত হইতেন। কথিত আছে চৈতন্যদেবের আদেশ মতে ছোট হরিদাস বর্ত্তমান 'খোল' যন্ত্রের সৃষ্টি করেন।

শ্রীক্ষেত্রে হরিদাসই চৈতন্যদেবের প্রিয় সহচর ছিলেন। তাঁহার স্বভাব চৈতন্যদেবের দৃষ্টান্তস্থল ছিল। হরিদাস যবন বংশ সম্ভূত হইয়া সর্ব্বদা হরিনাম করিতেন। যৌবন কালে মনুষ্য মাত্রেই নানা রূপ ভোগবাসনায় অভিলাষী হয়। কিন্তু হরিদাস সমস্ত বাসনায় জলাঞ্জলি দিয়া সেই যৌবন সময়ে বেনাপোলের বনে তপস্যায় নিযুক্ত থাকিয়া প্রত্যহ তিন লক্ষ হরিনাম করিতেন। এইজন্য তাঁহাকে অনেকেই ভক্তি শ্রদ্ধা করিত। রামচন্দ্র খাঁ নামক নিকটস্থ কোন জমীদার তাঁহাকে পরীক্ষা করিবার জন্য, একদা এক পরম সুন্দরী বেশ্যাকে তাঁহার নিকট প্রেরণ করেন। এই স্ত্রীলোক তাঁহাকে নানা প্রকারে প্রলোভিত করিবার চেষ্টা করে। ঐ স্ত্রীলোক ক্রমাগত তিন দিবস বিশেষ চেষ্টা করিয়া কিছুই করিতে পারিল না; পরন্তু হরিদাসকে এইরূপ ধর্ম্মপরায়ণ দেখিয়া তাঁহার চরণে নিপতিত হইয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিল। তখন হরিদাস কহিলেন "যদি আপন পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে চাহ, তবে সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া পতিতপাবন হরির চরণ সাধন কর।" তদবধি ঐ বেশ্যা একটী পবিত্রা বৈষ্ণবী হইল।

এই সময় হইতে চৈতন্যদেবের প্রেম বিহ্বলতা অতিশয় বর্দ্ধিত হয়। একদা তিনি নিশিথ সময় পুর্ণিমা তিথিতে চন্দ্র-রশ্মী-বিভাষিত-সুনীল-জলধীবক্ষ দেখিয়া যমুনায় কৃষ্ণ-রাধার জলকেলী মনে করিয়া সমুদ্রে ঝম্প প্রদান করেন। কিন্তু তপঃকাষ্ঠাহেতু কৃশ ও লঘুকায় হওয়ায় ভাসিয়া উঠেন। এবং এক ধীবরের জালে পড়িয়া তীরে উত্তীর্ণ হন। এদিকে

সহচরগণ তাঁহাকে দেখিতে না পাইয়া চারিদিকে অনুসন্ধান করেন। এবং ধীবরের মুখে শুনিয়া, শিষ্যগণ গিয়া দেখেন যে গৌরাঙ্গদেব স্পন্দহীন হইয়া পড়িয়া আছেন। তখন সকলেই তাঁহার কর্ণমূলে হরিনাম শুনাইতে লাগিলেন। অমনি চৈতন্যদেবও হরিধ্বনী করিয়া উঠিলেন। ঐ দিবস ধীবরের জালে না পড়িলে প্রাণ রক্ষা হইত না।

কিন্তু এত যে মত্ততা তথাপি মাকে ভুলেন নাই। বৎসর বৎসর মাকে প্রসাদ বস্ত্র পাঠাইয়া দিতেন। ও মাতার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেন।

ক্রমেই তাঁহার প্রেম বিরহোন্মাদ বর্দ্ধিত হইল। ইদানিং আর বড় জ্ঞান থাকিত না। কাহার সহিত বড় কথা কহিতেন না। ১৪৫৫ শকের আষাঢ় মাসে তিনি এক দিবস ভক্তগণ বেষ্টিত হইয়া বৃন্দাবনের কথা কহিতে কহিতে নীরব হইলেন এবং উঠিয়া জগন্নাথ দেবের মন্দিরাভিমুখে চলিলেন; ভক্তগণ নীরবে পাছে পাছে চলিলেন। চৈতন্যদেব মন্দিরাভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইলেন। দ্বারোদ্ঘাটিত হইলে আর তাঁহাকে দেখা গেল না। এইরূপে বঙ্গজ কুলতিলক সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মহাপুরুষ ভক্তির অবতার চৈতন্যদেবের জীবন-লীলা ১৪৫৫ শকের আষাঢ় মাসে পর্য্যবসিত হইল। সেই নবদ্বীপের চন্দ্র ৪৮ বৎসর সুধাময় কিরণ বিকীর্ণ করিয়া অস্তমিত হইলেন।

চৈতন্যদেব শ্রীকৃষ্ণকেই পরমব্রহ্ম বলিতেন। 'কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং'। তিনি সর্ব্বকারণের কারণ পরমেশ্বর। তাঁহার হ্রাস নাই, বৃদ্ধি নাই, ধ্বংস নাই। তিনিই ব্রহ্মা,

বিষ্ণু, মহেশ্বররূপে, সৃজন, পালন, সংহার করেন। এবং সময়ে সময়ে পৃথিবীর ভার মোচন ও প্রজাপালনার্থে যুগে যুগে পুর্ণাবতার, অংশাবতার প্রভৃতি অনন্তরূপ ধারণ করিয়া অনন্তলীলা প্রকাশ করেন।

"পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাং।
ধর্ম্ম সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥"

তিনি শ্রীকৃষ্ণের প্রতি এরূপ অসাধারণ প্রীতি ও অনুরাগ দেখাইয়া গিয়াছেন যে অবনী মণ্ডলে এপর্য্যন্ত কোন ধর্ম্মসংস্কারক আপন উপাস্যদেবের প্রতি তাদৃশ প্রগাঢ় প্রীতি দেখাইতে পারেন নাই। তিনি নিরাকার-বাদী ছিলেন কিন্তু মূর্ত্তির ভিতর দিয়া পরমব্রহ্মের অনন্তগুণ ও মহিমা দর্শন করিতেন। ইহাতে তাঁহাকে সাকারবাদীও বলা যায়। বলিতে গেলে পৃথিবীতে এপর্য্যন্ত এখন কোন ধর্ম্ম প্রচলিত হয় নাই, যাহার ভিতর এইরূপ পৌত্তলিকতা নাই অথবা এইরূপ পৌত্তলিকতায় পরিণত হয় নাই।

তাঁহার মতে ঈশ্বর প্রেম-ভক্তিই শ্রেষ্ঠ সাধন। তাহার অনুষ্ঠানে যাবতীয় ধর্ম্মের ও কর্ত্তব্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান হয়। তিনি নীরস জ্ঞানকাণ্ড, ও কর্ম্মকাণ্ডকে ভক্তিরসে ডুবাইয়া ধর্ম্মশিক্ষা দিয়া গিয়াছেন। তিনি কোন গ্রন্থ বা ধর্ম্মশাস্ত্র প্রণয়ন দ্বারা ভক্তিপথ দেখান নাই। কেবল সমস্ত জীবনে ভক্তির লক্ষণ দেখাইয়া গিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—

"তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥"

অর্থাৎ তৃণের ন্যায় বিনম্র, তরুর ন্যায় সহিষ্ণু, ও আপনি অভিমান শূন্য হইয়া অপরকে মান দান করিয়া সর্ব্বদা হরি-সঙ্কীর্ত্তন করিবে আজীবন এই উপদেশ দিয়া গিয়াছেন তাঁহার ন্যায় বিনয়ী ও প্রমত্ত ভক্ত আর দেখা যায় না। তাঁহার এই অসাধারণ বিনয় ও দুর্জ্জয় ভক্তির প্রভাবে সকলেরই জ্ঞান গর্ব্ব চূর্ণ হইয়া যাইত ও তাঁহার মতাবলম্বী হইত। তিনি বাক্যে যাহা বলিতেন কার্য্যেও তাহাই করিতেন তিনি বলিয়াছিলেন——

"শুচিসদ্ভক্তি দীপ্তাগ্নি দগ্ধ দুর্জ্জাতি কল্মষঃ।
শ্বপাকোঽপি বুধৈঃ শ্লাঘ্যো ন বেদজ্ঞোঽপি নাস্তিকঃ॥"

সদ্ভক্তিরূপ পবিত্র দীপ্তাগ্নি দ্বারা যাহার দুর্জ্জাতি জন্য পাপ নষ্ট হইয়াছে এমন চণ্ডালও জ্ঞানী লোকের আদরণীয় আর ভক্তিশূন্য নাস্তিক যদি বেদজ্ঞ হয় তথাপি সে আদরের পাত্র নহে।

"নমে ভক্তশ্চতুর্ব্বেদী মদ্ভক্তঃ শ্বপচঃ প্রিয়ঃ।
তস্মৈ দেয়ং ততো গ্রাহ্যং স চ পূজ্যোযথাহ্যহং॥"

একজন অবিশ্বাসী চতুর্ব্বেদজ্ঞ পণ্ডিত হইলেই আমার ভক্ত হয় না, কিন্তু এক জন বিশ্বাসী চণ্ডালও আমার প্রিয়পাত্র। তাঁহাকে দান করিবে ও তাঁহার দান গ্রহণ করিবে। তিনি আমার পূজ্য। ইহা তিনি বাল্যকাল হইতে আপন জীবনে দেখাইয়া গিয়াছেন।

সর্ব্বজাতীয় লোকেই প্রেমভক্তির অধিকারী। কি হিন্দু, কি ম্লেচ্ছ, সকল লোকেই প্রেম-ভক্তির অনুষ্ঠানে সমর্থ। সেই পরাৎপর পরমেশ্বরকে একান্ত প্রেম, ভক্তি ও অনুরাগ

ভরে ভজনা না করিলে তিনি কথনই জীবসমূহের পক্ষে সুলভ নহেন। যিনি রস বা ভাববিশেষের বশীভূত। সেই রস বা ভাব পঞ্চ প্রকার। শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর বা কান্ত।

শান্ত—শান্তরসটী ব্রহ্ম সম্বন্ধে প্রথম রস। ইহা সর্ব্বাদৌ ভারতবর্ষে উদ্‌ভূত হয়। সনক সনাতনাদি এই রসের উপাসক ছিলেন। তাঁহারা যজ্ঞাদি কার্য্যে সন্তুষ্ট না হইয়া যখন পরব্রহ্মে অবস্থিতি করিতেন তখন শান্তরস উপভোগ করিতেন। ইহাতে পরব্রহ্মের সহিত সাধকের কোন সম্বন্ধ নাই।

দাস্য—দাস্যরসটী দ্বিতীয় রস। হনুমান এই রসের উপাসক। এই রসে ভগবান আমার প্রভু ও আমি তাঁহার দাস এইরূপ একটী সম্বন্ধ দৃষ্ট হয়। উহাতে শান্তরসের সমস্ত সম্পদ ও মমতারূপ আর একটী রস লক্ষিত হয়। অতএব শান্ত হইতে দাস্য প্রধান। মহাপুরুষ মোজেস্ ও যীশু-খৃষ্ট এই রসের উপাসক ছিলেন।

সখ্য—দাস্য হইতে সখ্য প্রধান। ভীমার্জ্জুন ও উদ্ধব এই রসের উপাসক। ইহাতে দাস্যরসের সমস্ত ঐশ্বর্য্য ব্যতীত বিশ্বাসরূপ আর একটী অতিরিক্ত গুণ দৃষ্ট হয়। পরে ঐ রস ভারত অতিক্রম করিয়া আরব দেশে মহম্মদের হৃদয়ে উদিত হয়।

বাৎসল্য—সখ্য হইতে বাৎসল্য প্রধান। সকল ভুলিয়া ঈশ্বরকে পুত্রের ন্যায় স্নেহ করিতে পারেন তাহাই সাধন শ্রেষ্ঠ। নন্দ যশোদা এই রসের উপাসক। ইহাতে পূর্ব্ববর্ত্তী সকল রস দৃষ্ট হয়।

মধুর বা কান্তভাব—এই রস সকল রস অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। সতী স্ত্রী যেমন প্রিয়পতিকে দেহ, মন প্রভৃতি আত্ম সমর্পণ করেন, তেমনি ভাবে ভগবানে আত্ম সমর্পণ করাই শ্রেষ্ঠ সাধন। ইহাতে শান্তরসের অচঞ্চলতা, দাস্যের সেবা, সখ্যের বিশ্বাস, বাৎসল্যের স্নেহ এবং কান্তের আত্মসমর্পন সকলি আছে। অতএব সূক্ষ্মরূপে দেখিতে গেলে এই কান্তভাব সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। এইরসে পূর্ব্ববর্ণিত সকল রস পূর্ণভাবে পরিণাম প্রাপ্ত হইয়াছে। চৈতন্যদেব এই রসের প্রকাশক ও উপাসক ছিলেন।

সমস্ত প্রধান ধর্ম্মপ্রচারকদিগের ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে পাঠকগণ সহজেই বুঝিতে পারিবেন যে পরমার্থ-তত্ত্ব আদিকাল হইতে ক্রমশ উন্নত হইয়া আসিয়াছে এবং ভাগী-রথী-তীরে নবদ্বীপ নগরে শ্রীচৈতন্যদেবে ঐ পরমধর্ম্ম চরম উন্নতি প্রাপ্ত হইয়াছে।

নবদ্বীপে যে চৈতন্যদেবের মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে তাহা তদীয় পত্নী বিষ্ণু-প্রিয়াদেবীর সংস্থাপিত। চৈতন্যদেবের গৃহত্যাগের পর বিষ্ণু-প্রিয়া সন্ন্যাসব্রতধারিণী হইয়া গৌরাঙ্গের পাদুকাপূজা ও বৃদ্ধাশ্বশ্রূ শচীমাতার সেবাশুশ্রূষা করিতেন। তাঁহার সেবায় শচীমাতার অপত্য-বিরহ অনেক প্রশমিত হইয়াছিল। চৈতন্যদেবের অন্তর্ধানের কএক বৎসর পূর্ব্বে শচীদেবী ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। চৈতন্যের অন্তর্ধানের কিছু পরেই বিষ্ণু-প্রিয়াদেবী চৈতন্যের মূর্ত্তি স্থাপিত করিয়া দেবতাজ্ঞানে পূজা করিতে লাগিলেন। বিষ্ণু-প্রিয়ার দেহত্যাগের পর তাঁহার ভ্রাতা মাধবাচার্য্য ঐ

সেবার অধিকারী হন। তদবধি তাঁহার বংশধরেরা ঐ মূর্ত্তির সেবা করিয়া আসিতেছেন। প্রথমে চৈতন্যদেবের কোন নির্দ্দিষ্ট বাসমন্দির ছিল না। পর্য্যায়ক্রমে সেবকগণের প্রতিগৃহে নীতও পূজিত হইতেন। বর্ত্তমান খৃষ্টীয়াব্দের প্রথমে তোতারাম দাস নামক জনৈক ভক্তবৈষ্ণব চৈতন্যদেবের বাসমন্দির প্রস্তুত করিয়া দেন।

চৈতন্যদেবের ভক্তগণ ও গ্রন্থাবলী।

চৈতন্যদেবের ভক্তগণের মধ্যে, অদ্বৈত, নিত্যানন্দ, এবং রূপ, সনাতন, জীব, রঘুনাথ ভট্ট, রঘুনাথ দাস ও গোপাল ভট্ট প্রধান। অদ্বৈত ও নিত্যানন্দ প্রভুপদ বাচ্য। অবশিষ্ট কএকজন গোস্বামী নামে অভিহিত। শান্তিপুরের গোস্বামীরা অদ্বৈতের বংশধর।

নিত্যানন্দ—১৪৩৮ শাকে চৈতন্যদেব, নিত্যানন্দকে বঙ্গদেশে ধর্ম্মপ্রচারে প্রেরণ করেন। নিত্যানন্দ গৌরাঙ্গের আদেশমতে প্রথমে পাণিহাটী পরে নবদ্বীপাদি নানাস্থান পরিভ্রমণ করিয়া সপ্তগ্রামে অবস্থিতি করেন। তিনি অবধূত সন্ন্যাসী ছিলেন সুতরাং তাঁহাকে সকলেই মান্য করিত। কিন্তু তাঁহার সন্ন্যাসোচিত ব্যবহার ছিল না। তিনি মাল্যচন্দন ধারণ, তাম্বুল ভক্ষণ, ও কৌপীন পরিত্যাগ করিয়া পট্টবস্ত্র পরিধান করিতেন। এই কারণে অনেকে তাঁহার চরিত্রে সন্দিহান হন। নবদ্বীপের কোন ব্রাহ্মণ শ্রীক্ষেত্রে নিত্যা-

নন্দের এই আচরণের বিষয় চৈতন্যদেবকে জ্ঞাত করায় চৈতন্য দেব উত্তর করেন——

"শুন বিপ্র যদি মহাঅধিকারী হয়।
তবে তার দোষ গুণ কিছু নাই লয়॥" চৈ, ভা,

নিত্যানন্দ ধর্ম্মপ্রচারে বড় সুবিধা করিতে পারিলেন না। তিনি উদাসীন বলিয়া অনেকে তাঁহার শিষ্যত্ব স্বীকার করিল না। তখন তিনি বিবাহ করিতে বাসনা করেন। কথিত আছে যে চৈতন্যদেবই তাঁহাকে বিবাহের অনুমতি দেন। তিনি বিবাহ করিতে বাসনা করিলেন বটে কিন্তু তিনি ভ্রষ্টাচার ও অজ্ঞাতকুলশীল ছিলেন বলিয়া কেহই তাঁহাকে কন্যাদান করিল না। এই সময়ে কাল্‌না নিবাসী সূর্য্যদাস পণ্ডিতের জ্যেষ্ঠা কন্যা বসুধাদেবীর সর্পদংশনে মৃত্যু হয়। নিত্যানন্দের কৃপায় উক্ত কন্যা পুনর্জ্জীবিত হইলেন। সূর্য্যদাস নিত্যানন্দের এই অলৌকিক কার্য্য দেখিয়া তাঁহার প্রতি অতিশয় ভক্তিমান হন। এবং স্বীয় জ্যেষ্ঠা কন্যা বসুধা ও কনিষ্ঠা জাহ্নবীদেবী উভয়কেই নিত্যানন্দকে সম্প্রদান করিলেন। নিত্যানন্দ বিবাহ করিয়া খড়দহে বাস করেন। খড়দহের গোস্বামীরা নিত্যানন্দের ও বলাগড়ীর গোস্বামীরা তাঁহার দৌহিত্রের বংশীয়।

নিত্যানন্দ ভেক দিবার প্রণালী প্রবর্ত্তিত করেন। যাঁহারা ভেকাশ্রম গ্রহণ করেন, তাঁহাদের মধ্যে জাতিবিচার থাকেনা। তাঁহারা পরস্পরের স্পৃষ্টঅন্ন গ্রহণ করেন, একত্র পান ভোজন করিয়া থাকেন। ইহাঁদের মধ্যে বিধবা বিবাহ প্রচলিত আছে। এই বিবাহের সময় গোস্বামীদিগকে ১।০

পাঁচসিকা দক্ষিণা দিতে হয়। ভেকধারী বৈষ্ণবগণ মস্তক মুণ্ডণ, ডোর কৌপীন, বহির্বাস ও তিলক ত্রিকণ্ঠি ধারণ করেন। ভিক্ষাই ইহাঁদিগের ব্যবসায়।

রূপ সনাতনাদি ছয় জন গোস্বামী এ সম্প্রদায়ের ভূষণ-স্বরূপ। চৈতন্যদেব ইহাদিগকে বৃন্দাবনে থাকিয়া লুপ্ততীর্থ উদ্ধার ও ধর্ম্মপ্রচারে নিযুক্ত করেন। ইহাঁরা প্রভুর আজ্ঞা সম্পূর্ণরূপে প্রতিপালন করিয়াছিলেন। রূপ সনাতন বহু পরিশ্রমী ও সুপণ্ডিত লোক ছিলেন। কথিত আছে, বৃন্দাবনের মদনগোপালের ও গোবিন্দজীর মন্দির ইহাঁদেরই প্রতিষ্ঠিত। এই সকল গোস্বামীদিগের দ্বারা বৈষ্ণবধর্ম্মের মত প্রতিপাদক বহুল গ্রন্থ প্রচারিত হইয়াছে। সনাতন গোস্বামী 'বৃহদ্ভাগবতামৃত', 'হরিভক্তি বিলাস', ও তাহার 'দিগ্‌দর্শনী' নামে টীকা, লীলাস্তব, এবং ভাগবতের দশম স্কন্দের 'বৈষ্ণবতোষিনী' নামে টীকা প্রণয়ন করেন। রূপ গোস্বামী, 'ভক্তিরসামৃত', 'ভক্তরসামৃত', 'মথুরামাহাত্ম্য পদ্মাবলী', হংসদূত, উদ্ধবসন্দেষ, অষ্টাদশকছন্দঃ, স্তবমালা, উৎকলিকাবলী, গোবিন্দবিরুদাবলী, প্রেমেন্দুসাগর, নাটক-চন্দ্রিকা, লঘুভাগবততোষিণী, বিদগ্ধ মাধব, ললিতমাধব এবং দানকেলী ভাণিকা, প্রভৃতি সুপ্রতিষ্ঠিত বহুতর গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। বিদগ্ধ মাধব ১৪৪৭ শকে ও দানকেলীভাণিকা, ১৪৬৩ শকে লিখিত হয়। এই সকল গ্রন্থে ভক্ত, ভক্তি, কৃষ্ণতত্ত্ব, ও হরিভক্তি প্রভৃতি বৈষ্ণবদিগের নিত্য কর্ত্তব্য অতি উত্তমরূপে বিবৃত হইয়াছে।

জীব গোস্বামী, রূপ ও সনাতনের ভ্রাতুষ্পুত্র ও অনুপমের

পুত্র। ইনিও একজন প্রধান গ্রন্থকার। ভগবৎ-ষট্-সন্দর্ভ, ও লঘুতোষিণী তাঁহার প্রধান গ্রন্থ। ইনি বৃন্দাবনের রাধা দামোদরের মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন।

গোপালভট্ট দাক্ষিণাত্যবাসী বেঙ্কট ভট্টের পুত্র। চৈতন্যদেব যৎকালে ইঁহাদের বাটীতে অবস্থান করেন। গোপাল তৎকালে চৈতন্যদেবের প্রতি ভক্তি সম্পন্ন হইয়া তাঁহার অনুগামী হন। গোপাল প্রচলিত 'হরিভক্তি বিলাস' নামক গ্রন্থের রচয়িতা বলিয়া প্রসিদ্ধ। এই গোপাল কর্তৃক বৃন্দাবনে রাধারমণের মন্দির স্থাপিত হয়। অদ্যাপি তাঁহার সন্তানেরা উহার উত্তরাধিকারী হইয়া রক্ষণাবেক্ষণ করিয়া আসিতেছেন।

নবদ্বীপ হইতে সংস্কৃত বিদ্যার যেমন উন্নতি হয়, বাঙ্গালা ভাষারও ততোধিক শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হয়। চৈতন্যদেব বাঙ্গালা ভাষার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া বিদ্যাপতি ও চণ্ডিদাসের মধুর পদাবলী সকল কীর্ত্তন করিয়া মোহিত হইতেন। বিদ্যাপতি ও চণ্ডিদাস উভয়েই চতুর্দ্দশ শকের শেষে বর্ত্তমান ছিলেন। ইহার পর আমরা আর একজন বৈষ্ণব কবি দেখিতে পাই। তাঁহার নাম গুণরাজ খাঁ। তিনি "শ্রীকৃষ্ণ বিজয়" নামে শ্রীকৃষ্ণের চরিত্র সম্বন্ধে একখানি কাব্য রচনা করেন। তাঁহার প্রকৃত নাম মালাধর বসু, নিবাস কুলীন গ্রাম। নবাব কর্ত্তৃক তিনি গুণরাজ খাঁ উপাধি প্রাপ্ত হন। উক্ত গ্রন্থ ১৪০২ শকে সমাপ্ত হয়। যথা—

"তের শত পচানই শকে গ্রন্থ আরম্ভণ।
চতুর্দ্দশ দুই শকে গ্রন্থ হইল সমাপন॥"

চৈতন্যদেব এইরূপে বাঙ্গালা ভাষার আদর করায় তাঁহার শিষ্যগণের মধ্যে অনেকেই বাঙ্গালা ভাষায় অনেক সুমধুর গীত ও পদাবলী এবং গ্রন্থ লিখিয়া বাঙ্গালা ভাষার যথেষ্ট শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিয়া গিয়াছেন। শ্রীখণ্ড নিবাসী বৈদ্যকুলতিলক নরহরি দাস এই সকলের আদি গুরু বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন। তিনিই প্রথমে চৈতন্য সম্বন্ধে অনেক পদাবলীরচনা করেন। ইহার পর গোবিন্দ, মাধব, বাসুদেব ঘোষ, মুরারী গুপ্ত, বৃন্দাবন দাস, লোচন দাস, জ্ঞান দাস প্রভৃতি বহুতর কবি কর্ত্তৃক বাঙ্গালা ভাষার অনেকানেক কবিতা ও গ্রন্থ রচিত হয়। গোবিন্দ বাসুদেব মাধব, মুরারী গুপ্ত ও বৃন্দাবনদাস ইহাঁরা সকলেই নবদ্বীপনিবাসী ছিলেন।

গোবিন্দ ঘোষ কর্ত্তৃক অগ্রদ্বীপের গোপীনাথ স্থাপিত হয়। গৌরাঙ্গ যখন গঙ্গাতীরের পথ দিয়া গৌড় যাত্রা করেন। তখন তাঁহার সঙ্গে গোবিন্দ ঘোষও যাইতেছিলেন। এক দিন গৌরাঙ্গ ভোজনের পর মুখ শুদ্ধি চাহিলে গোবিন্দ নিকটস্থ গ্রামে ভিক্ষা করিয়া একটী হরিতকীর একখণ্ড তাঁহাকে দিলেন। পর দিবস প্রভু অগ্রদ্বীপে ভিক্ষা করিলেন এবং মুখ শুদ্ধি চাহিলে, গোবিন্দ তৎক্ষণাৎ হরিতকী বাহির করিয়া দিলেন। তখন চৈতন্য কহিলেন "তোমার এখন সংসারবাসনা তৃপ্তি হয় নাই। অতএব আমার সহিত তোমার যাওয়া হইবে না।" তখন গোবিন্দ অতিশয় দুঃখিত হওয়ায় চৈতন্য কহিলেন। "তুমি এই স্থানে থাকিয়া শ্রীকৃষ্ণের মূর্ত্তি নির্ম্মাণ পূর্ব্বক তাঁহাকেই পুত্ররূপে প্রতিপালন কর" গোবিন্দ ঘোষ প্রভুর আদেশ মত গোপীনাথের বিগ্রহ স্থাপিত করিলেন।

সুপ্রসিদ্ধ "চৈতন্য ভাগবত" গ্রন্থ বৃন্দাবন দাস রচনা করেন। বৃন্দাবন শ্রীবাসের ভ্রাতুষ্কন্যা নারায়ণী দেবীর পুত্র। তিনি স্বীয় গুরু নিত্যানন্দের আদেশে "চৈতন্য ভাগবত" নামক চৈতন্য-চরিত্র বিষয়ক প্রসিদ্ধ গ্রন্থ ১৪৫৭ শকে রচনা করেন।

প্রথমে ঐ গ্রন্থের নাম চৈতন্য ভাগবত ছিল না। উহার নাম চৈতন্য মঙ্গল ছিল। ইহার দুই বৎসর পরে লোচন দাসকৃত চৈতন্যমঙ্গল প্রকাশিত হইলে বৃন্দাবনের গ্রন্থের নাম চৈতন্য-ভাগবত হইল। চৈতন্যভাগবত গ্রন্থের পূর্ব্বে যদিও বিদ্যাপতির ও চণ্ডীদাসের অনেক পদাবলী প্রকাশিত হইয়াছিল কিন্তু তাঁহারা পয়ার বা ত্রিপদী আদিচ্ছন্দে কোন গ্রন্থ প্রনয়ণ করেন নাই। গুণরাজ খাঁর গ্রন্থও রাগাদী চ্ছন্দে লিখিত, সুতরাং এই সম্বন্ধে বৃন্দাবনকে বাঙ্গালার আদি কবি বলা যাইতে পারে। চৈতন্য-ভাগবত ব্যতীত বৃন্দাবনের আরও পদ পদাবলী আছে। এই জন্য নবদ্বীপ বৈষ্ণব সাহিত্যের আকর বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে।

কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেন ও রায় গুণাকর ভারতচন্দ্র রায় উভয়েই নবদ্বীপাধিপতি কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের সভাসদ থাকিয়া বিদ্যাসুন্দর অন্নদামঙ্গল রচনা করেন। সুতরাং তাঁহাদের কাব্যও নবদ্বীপের নামে খ্যাত।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

উপসংহার।

নবদ্বীপের পূর্ব্ববিবরণ পাঠ করিয়া গর্ব্বে যেমন বক্ষঃস্থল স্ফূর্ত্ত হইয়া উঠে এক্ষণকার অবস্থা ভাবিলে আবার দুঃখে ততোধিক মুখ ম্লান হইয়া আইসে। পূর্ব্বাবস্থার সহিত তুলনা করিলে এক্ষণে নবদ্বীপের অতি শোচনীয় দশা প্রতীয়মান হয়। হায়! কালের কি কঠোর গতি! এখন আর সে নবদ্বীপ নাই। নবদ্বীপের সে মৃত্তিকাও নাই। নবদ্বীপের কেবল নাম আছে মাত্র। রত্নগর্ভা পণ্ডিত-জননী-মাতা যেন পুত্র শোকে কাতর হইয়া অন্তর্হিত হইয়াছেন। এখন যেখানে নবদ্বীপ আছে উহা প্রাচীন নবদ্বীপ নহে। প্রাচীন নবদ্বীপ উহার উত্তর দুই ক্রোশ স্থান ব্যাপীয়া ছিল। ভাগীরথীর কুলভঙ্গ হেতু এইরূপ অবস্থান্তর ঘটিয়াছে।

প্রাচীন নবদ্বীপের পশ্চিমে ভাগীরথী প্রবাহিত ছিল। এক্ষণে পূর্ব্বদিকে প্রবাহিত আছে। কথিত আছে ১২০৬ সালে ভাগীরথীদেবী উত্তর বাহিনী হইয়া উত্তরে বল্লালদীঘী ও দক্ষিণে নবদ্বীপ রাখিয়া পূর্ব্ববাহিনী হইয়া জলঙ্গী-নদীর সহিত মিলিত হয়, ও উভয় নদী একত্র দক্ষিণ বাহিনী হইয়াছে। পরে জাহ্নবীদেবী নবদ্বীপের উত্তরাংশ ক্রমশ গ্রাস করিতে লাগিলেন। পুরাতন নবদ্বীপ গঙ্গার ভাঙ্গনে

ভাঙ্গিয়া পরপারে চররূপে উৎপন্ন হইল। এক্ষণে নূতন নবদ্বীপে পুরাতন নবদ্বীপের চিহ্নমাত্র নাই।

বর্ত্তমান নবদ্বীপ দৈর্ঘ্যে ৩ মাইল ও প্রস্থে এক মাইল হইবে। এবং প্রায় ২৫০০ ঘর লোকের বসতি লোকসংখ্যা প্রায় দশ হাজার হইবে। নবদ্বীপে এক্ষণে ন্যায়ের ৪ খানি স্মৃতির ৫ খানি, ভাগবতের ২ খানি এবং সাহিত্যের ৩ খানি টোল আছে। ছাত্রসংখ্যা সর্ব্বসমেত ১৫০ জন। তন্মধ্যে ন্যায়ের ৬৪, স্মৃতির ৩৬, ভাগবতের ১৫, অবশিষ্ট সাহিত্য ও ব্যাকরণ পাঠ করিয়া থাকে। ঐসকল ছাত্রের মধ্যে মৈথিল ১৪, তৈলঙ্গী ৫, পঞ্জাবী ৬, উড়িষ্যাবাসী ৪, গৌড়ীয় ৬, ও পূর্ব্ববঙ্গবাসী ৫৩, অবশিষ্ট দেশীয়। গবর্ণমেণ্ট হইতে বিদেশীয় ছাত্রগণ মাসিক ২০০ টাকা করিয়া বৃত্তি পাইয়া থাকে।

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত ভুবনমোহন বিদ্যারত্ন, রাজকৃষ্ণ ন্যায়পঞ্চানন, যদুনাথ সার্ব্বভৌম, দুর্গাদাস বিদ্যারত্ন, প্রভৃতি নৈয়ায়িক এবং লালমোহন বিদ্যাবাগীশ, শিবনাথ বিদ্যাবাচস্পতি, মধুসূদন স্মৃতিরত্ন, প্রসন্নচন্দ্র বিদ্যারত্ন, মথুরানাথ পদরত্ন, লক্ষ্মীকান্ত ন্যায়ভূষণ, তারাপ্রসন্ন চূড়ামণি এবং উমেশচন্দ্র তর্কবাগীশ, প্রভৃতি স্মার্ত্ত এবং প্যারীলাল ভাগবতভূষণ ও শশিভূষণ ভাগবতরত্ন ও দীননাথ চূড়ামণি প্রভৃতি পৌরাণিক এবং অজিতনাথ ন্যায়রত্ন ও শিবনারায়ণ শিরোমণি, দ্বারকানাথ শিরোমণি, শিতিকণ্ঠ, কাব্যতীর্থ প্রভৃতি সাহিত্যের অধ্যাপক বর্ত্তমান আছেন।

শিবনাথ বিদ্যাবাচস্পতি ও অজিতনাথ ন্যায়রত্ন উভয়েই

কৃষ্ণনগরের রাজার টোলে অধ্যাপনা করিতেছেন। অজিতনাথ একজন সুকবি। ইনিই কাশীখণ্ড নামক পুরাণের বঙ্গানুবাদ করেন। ইঁহার রচিত অনেক সংস্কৃত শ্লোকাবলী আছে। সেই শ্লোকে তাঁহার বিশেষ পাণ্ডিত্য ও কবিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি কৃষ্ণনগরের রাজা শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র রায় বাহাদুরকে যে কএকটী শ্লোক উপহার দেন, তন্মধ্য হইতে একটী শ্লোক নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম। ঐ শ্লোকের অনেক প্রকার অর্থ সংঘটিত হয়। যথা—

"সন্তানোহি মমৈষ দেবি তব কিং স্বত্বং কলানাং নিধৌ,
কৌমারাকৃতিরত্র মামকতয়া বিজ্ঞাপয়ত্যেব যৎ;
গৌরীশ্রীরিতরাশ্চ যত্র কলহায়ন্তে মিথো মাতরঃ,
সর্ব্বাত্মোদয়তামসৌ নবনৃপ নির্লাঞ্ছনশ্চন্দ্রমাঃ"।

মধুসূদন স্মৃতিরত্ন ও শিবনারায়ণ শিরোমণি ইঁহারা উভয়েই এক্ষণে সংস্কৃতকালেজে অধ্যাপনা করিতেছেন। মধুসূদন, সুপ্রসিদ্ধ গদাধরের বংশধর শ্রীরাম শিরোমণির কনিষ্ঠ পুত্র। ইনি সংস্কৃত কলেজে স্মৃতি শাস্ত্রের অধ্যাপক। মধুসূদন, ব্রজনাথবিদ্যারত্ন কৃত, চৈতন্যচন্দ্রোদয় নামক পুস্তকের প্রতিবাদ করিয়া "চৈতন্য চন্দ্রোদয়াঙ্ক" নামে এক পুস্তক ও বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিধবা বিবাহের প্রতিবাদ করিয়া এক পুস্তক লিখিয়াছেন। উক্ত উভয় পুস্তকে তাঁহার বিলক্ষণ বিদ্যাবত্তার ও ভূয়োদর্শিতার এবং বিচার শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। শিবনারায়ণ সাহিত্যের অধ্যাপক তিনি বালকদিগের সংস্কৃত শিক্ষার্থ "সংস্কৃতকলিকা" নামে একখানি পুস্তক রচনা করিয়াছেন

ইংরেজদিগের অধিকার কাল হইতেই নবদ্বীপে সংস্কৃত চর্চ্চার অবনতি হইতে আরম্ভ হইয়াছে এবং ইংরেজী শিক্ষার উন্নতি হইতেছে। সুপ্রসিদ্ধ 'ভুগোল বিবরণ' ও 'ভারতবর্ষের ইতিহাস' প্রণেতা শ্রীযুক্ত তারিণীচরণ চট্টোপাধ্যায় ও সংস্কৃত কলেজের বিএ ক্লাসের গণিতের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক পেন্সন প্রাপ্ত সব জজ শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ ভট্টাচার্য্য এম, এ, বি, এল এবং পদার্থদর্শনকার শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ বিদ্যারণ্য ভট্টাচার্য্য এম এ, বি, এল ও তদীয় সহোদর ব্যবস্থাকল্পদ্রুম ও হিন্দুল প্রণেতা শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ স্মার্ত্তশিরোমণি ভট্টাচার্য্য এম, এ, ডি এল, ও জজ কোর্টের উকিল শ্রীযুক্ত নরহরি মুখোপাধ্যায়; শ্রীযুক্ত যদুনাথ ভট্টাচার্য্য বি, এল, ডাক্তার শ্রীযুক্ত নীলমণি চৌধুরী এল, এম, এস শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর চক্রবর্ত্তী বি, এ প্রভৃতি অনেকগুলি ইংরেজী ভাষায় কৃতবিদ্য ও লব্ধপ্রতিষ্ঠ ব্যক্তিগণ নবদ্বীপ অলঙ্কৃত করিতেছেন।

উক্ত মহেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্যের প্রযত্নে ও উৎসাহে এবং পাইকপাড়াধিপতি শ্রীযুক্ত কুমার ইন্দ্রচন্দ্র সিংহ বাহাদুরের অর্থ সাহায্যে নবদ্বীপে "সংস্কৃত-বিদ্যা-বিবর্দ্ধিনী বিদগ্ধ জননী" নামে এক সভা হইয়াছে। ঐ সভায় নবদ্বীপ ও তৎসন্নিহিত স্থান সকলের টোলের ছাত্রগণের বার্ষিক পরীক্ষা গৃহীত হয়। এবং ছাত্রগণের কৃতিত্ব অনুসারে তাঁহারা ও অধ্যাপকেরা পারিতোষিক পাইয়া থাকেন। সভার অধিবেশন সময়ে কাশী, মিথিলা ও উড়িষ্যা প্রভৃতি প্রদেশের অধ্যাপকগণ আমন্ত্রিত ও বিদায় প্রাপ্ত হন।

উক্ততারিণী বাবুর প্রযত্নে নবদ্বীপে বর্ত্তমান হিন্দুস্কুল স্থাপিত হইয়াছে। এই বিদ্যালয়ের উন্নতি কল্পে ইনি যথেষ্ট পরিশ্রম ও অর্থব্যয় করিয়াছেন। তাঁহার প্রযত্নে নবদ্বীপের হিন্দু স্কুল নদীয়া জেলার প্রধান স্কুল মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে। রত্নমণি কুণ্ডু নামক জনৈক ধনী উক্ত স্কুল গৃহ নির্ম্মাণে ৮৭৫০ টাকা দান করিয়া দেশহিতৈষিতার পরিচয় দিয়াছেন।

বঙ্গভূমি ইংরেজদিগের অধিকৃত হইলে তাঁহারা সমস্ত অধিকৃত প্রদেশকে কএকটী জেলায় বিভক্ত করেন। তন্মধ্যে নদীয়ায় প্রথমে জেলা স্থাপিত হয়। ১৭৭২ সালে নদীয়ায় এক জন কালেক্টার ও জজ নিযুক্ত হন। গোয়াড়ীতে (গোবিন্দ সড়ক) ঐ সকল কাছারী স্থাপিত হয়। এই নদীয়ার নামানুসারে সমস্ত জেলার নাম "নদীয়া জেলা" হইয়াছে।

১৭৮৪ সালে সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি সর উইলিয়ম জোন্স বায়ু পরিবর্ত্তন জন্য গোয়াড়ীতে আসিয়া অবস্থিতি করেন। তিনি নদীয়ার রাজা শিবচন্দ্রের নিকট সংস্কৃত শিক্ষা করিবার মানসে একজন পণ্ডিতের প্রার্থনা করেন। ম্লেচ্ছকে সংস্কৃত শিক্ষা দেওয়া নীতি বিরুদ্ধ বলিয়া কোন ব্রাহ্মণ পণ্ডিতই স্বীকৃত হইলেন না। অবশেষে মহারাজের ও নবদ্বীপস্থ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদিগের অনুরোধে নবদ্বীপনিবাসী বৈদ্য কুলোদ্ভব রামলোচন কবিভূষণ মাসিক ১০০৲ টাকা বেতনে সর উইলিয়ম জোন্সের শিক্ষকতা কার্য্যে নিযুক্ত হন। রামলোচন সংস্কৃত সাহিত্যে ও বৈদ্যশাস্ত্রে একজন

অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন। কথিত আছে কোন ব্রাহ্মণ কুমারের চিকিৎসাকালে রোগ নির্ণয়ে তাঁহার ভ্রান্তি হওয়ায় তিনি চিকিৎসা পরিত্যাগ করেন। ও সাহিত্যের টোল করিয়া শিক্ষকতা কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। এক্ষণে নবদ্বীপে রাম-লোচনের প্রপৌত্রের দৌহিত্র বর্ত্তমান আছেন।

নবদ্বীপ ইংরাজদিগের অধিকৃত হইলেও প্রথমতঃ ইংরেজদিগের আইনগুলি প্রচলিত হয় নাই। কি দেওয়ানী কি ফৌজদারী কি সমাজ সম্বন্ধীয় সকল বিষয়ের বিচার নবদ্বীপের রাজার কর্ত্তৃক হইত। অনুমান ১২২০ কি ২৫ সালে, নবদ্বীপে দশঠাকুরী প্রথা প্রচলিত হয়। গ্রামের প্রধান প্রধান দশ জন লোক একত্রিত হইয়া দেওয়ানী ও ফৌজদারী আদি সমস্ত মোকদ্দমার বিচার করিতেন। এই বিচার কতদূর নিরপেক্ষভাবে হইত তাহা নির্ণয় করা কঠিন। তন্তুবায় কুলোদ্ভব হরগোবিন্দ প্রামাণিক উক্ত দশ ঠাকুরের প্রধান ও নবদ্বীপের নায়েবী পদে নিযুক্ত ছিলেন। এই সময়ে কৃষ্ণনগরের রাজসিংহাসনে মহারাজ গিরিশচন্দ্র অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁহার আজ্ঞায় হরগোবিন্দের যত্নে ও উৎসাহে নবদ্বীপে ১২৩৪ সালে "হট হটিকা" নামে প্রসিদ্ধ বারইয়ারী পূজা হয়। উক্ত হর গোবিন্দের পর তদীয় সহোদর গৌরচন্দ্র প্রামাণিক নবদ্বীপের নায়েবী পদ প্রাপ্ত হন। উক্ত উভয়ের এখন আর বংশ নাই এই গ্রন্থকার উক্ত গৌরচন্দ্রের দৌহিত্র ও ৺ দীননাথ রাঢ়ীর আত্মজ।

সম্পূর্ণ।